বরণীয় মানুষের স্মরণীয় প্রেম

পরিবেশক

নাথ ব্রাদার্স ॥ ৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট ॥ কলকাতা ৭৩

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৩৫৮

প্রকাশক
সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং হাউস
২৬বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা ২৯

প্রচ্ছদপট
গৌতম রায়

মুদ্রাকর
পি. কে. পাল
শ্রীসারদা প্রেস
৬৫ কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলকাতা ৯

অনুবাদ স্বত্ব
সহেলী বন্দ্যোপাধ্যায়

পূর্বাভাষ

বেশ কয়েকবার বিচিত্র সমস্ত নিবন্ধ নিয়ে আপনাদের দরবারে উপস্থিত হয়েছি। এই দুঃসাহস ধৃষ্টতাপূর্ণ কিনা জানি না। তবে আপনাদের প্রশ্রয় রয়েছে অনুভব করেছি—সান্ত্বনা এটাই। মূলতঃ আমি একজন কাহিনীকার। এই সমস্ত জটিল নিবন্ধের কারবারী হওয়া আমার উচিত নয়। তবু আপনাদের প্রশ্রয়ের কথা স্মরণ রেখেই "বরণীয় মানুষের স্মরণীয় প্রেম" এর বিশাল রচনা সম্ভার নিয়ে আমি আবার উপস্থিত হচ্ছি। অতি সাহসী প্রকাশক শ্রীকানাইলাল দাশের এই বিপুল প্রচেষ্টা সার্থক হবে কিনা তা এখন ভবিষ্যতের অতলান্তে তলিয়ে রইল।

বইটির নামকরণ করেছেন শ্রীযুক্তা লেখা বন্দ্যোপাধ্যায়। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে আমার নয়। যদিও বইটির নাম "বরণীয় মানুষের স্মরণীয় প্রেম" তবু শুধু প্রেমের কথা নয়, প্রীতি ও ব্যভিচারের কথাও এতে আছে। নইলে রচনাগুলি সম্পূর্ণ করা সম্ভব হত না। কাজেই পাঠক সাধারণ সহজেই বুঝতে পারবেন তথ্য ও তত্ত্বের জন্য আমাকে অসংখ্য বিদেশি বই এর সাহায্য গ্রহণ করতে হয়েছে। সেই সমস্ত জীবনী, আত্মজীবনী ও মূল্যবান সূত্র সম্বলিত বইগুলির দীর্ঘ তালিকা উদ্ধৃত করে পাঠকদের মনকে ভারাক্রান্ত করতে চাই না। তবে বাংলা সাহিত্যের দুই প্রতিষ্ঠিত অগ্রজের কাছ থেকে যে ঋণ গ্রহণ করেছি, তা সকৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করে নিচ্ছি। শ্রীচিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীভবাণী মুখোপাধ্যায়ের কয়েকটি রচনা আমাকে বিশেষ ভাবে সাহায্য করেছে।

"বরণীয় মানুষের স্মরণীয় প্রেম"কে আরো বিশাল আকার দেবার বাসনাকে সঙ্গত কারণেই দমন করলাম। কারণ নিশ্চিত ভাবে আরো একটি খণ্ডের অবতারণা করতে হত। তবে যে সমস্ত চরিত্রকে উপস্থিত করতে চলেছি, খ্যাতির দিক থেকে কেউই উপেক্ষণীয় নয়। এমনকি অখ্যাতির

দিক থেকেও। তাঁদের প্রত্যেকের জীবনের ঘটনা প্রেমের গল্পের মতোই ট্র্যাজেডিতে বা কমেডিতে মিলে মিশে রয়েছে।

পরিশেষে জানাই, অনেক ভয়, অনেক সঙ্কোচ মনের মধ্যে বাসা বেঁধে রইল। এই ভয় আর সঙ্কোচ তখনই দূর হবে যখন জানতে পারব পাঠক-পাঠিকারা আবার আমার এই দুঃসাহসকে প্রশ্রয়ের দৃষ্টিতে দেখেছেন।

বিষয় সূচী

বহু প্রেমের নায়ক গ্যেটে	...	৯-২০
যাযাবর প্রেমিক শেলী	...	২১-৩৫
হতভাগ্য প্রেমিক কিটস্‌	...	৩৬-৪৫
প্রেমের পিয়াসী বালজাক	...	৪৬-৫৪
প্রেমের রাজা ডিকেন্স	...	৫৫-৬৬
অতৃপ্ত প্রেমিক ডষ্টয়ভস্কি	...	৬৭-৮১
বিশ্বস্ত প্রেমিক ব্রাউনিং	...	৮২-৯০
রসিক প্রেমিক শ	...	৯১-১০২
বহুবল্লভ ফ্রাঙ্ক হ্যারিস	...	১০৩-১১৪
সংগ্রামী প্রেমিক গোর্কী	...	১১৫-১২৭
নারীসঙ্গ সুখী নেপোলিয়ান	...	১২৮-১৩৭
হিটলারের প্রণয়লীলা	...	১৩৮-১৪৮
অষ্টম এডওয়ার্ডের রাজকীয় প্রেম	...	১৪৯-১৫৮
কলঙ্কিত নায়ক মোপাসাঁ	...	১৫৯-১৬৮
ক্যাসানোভা ইতিহাসের কলঙ্ক	...	১৬৯-১৭৬
রঙ্গনায়িকা গ্রেটা গার্বো	...	১৭৭-১৮৩
নারীবিলাসী বায়রণ	...	১৮৪-১৯০
নেলসনের প্রেমিকা লেডি হ্যামিলটন	...	১৯১-১৯৮
অস্কার ওয়াইল্ডের সমকামতত্ত্ব	...	১৯৯-২০৫
বিষণ্ণ প্রেমিক টলস্টয়	:..	২০৬-২১৪
নীলনদের নাগিনী ক্লিওপেট্রা	...	২১৫-২২৯
সাহসী প্রেমিক রাসবিহারী বসু	...	২৩০-২৩৬
রঙ্গনায়ক চ্যাপলিন	...	২৩৭-২৪৭
প্রেমের বলি অ্যানি বলেন	...	২৪৮-২৫৬

'স্বর্ণময়ীর ঠিকানা'র স্বার্থক

রচনাকার

শ্রীরঞ্জিত চট্টোপাধ্যায় কে

আন্তরিকতার সঙ্গে-

ঃ আমাদের প্রকাশিত লেখকের অন্যান্য বই

রহস্যভেদী বাসব (১-১৩ খণ্ড)
ভোর হল বিভাবরী
জানু ভানু কৃশানু
রক্তাক্ত খাইবার
মরণ দোলায় দোলা
গোধুলীর কুমকুম
হায়নার হাসি
অভ্র রোদ শুভ্র বিতান
এখানে শ্বাপদ
মোমের আলোয় দেখা

বহু প্রেমের নায়ক গ্যেটে

১৮৩২ সালের মার্চ মাস।

একটি সুসজ্জিত ঘরের মূল্যবান বিছানায় শুয়ে রয়েছেন গ্যেটে। বিরাশি বছরের কবিকে দেখলে মনে হয় না তাঁর এত বয়স হয়েছে। তাঁর সুন্দর চেহারাকে জরা গ্রাস করতে পারেনি। মনে হয় অল্পবয়স্ক কোন মানুষ বিছানায় শুয়ে গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন।

গ্যেটে অসুস্থ।

গতবছর দীর্ঘ বিরতির পর তাঁর বিখ্যাত ফাউস্টের দ্বিতীয় খণ্ড শেষ করেছেন। অত্যন্ত পরিশ্রম হওয়ায় তারপরই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ে। অসীম মনোবলের অধিকারী হওয়ায় তিনি নিজের এই অবস্থাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনেন নি। এইভাবে এক বছর কাটার পর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন।

ঘরে তিনি একা নেই। তাঁর ঘনিষ্ট বন্ধু ও পরিজনেরা অনেকেই রয়েছেন। নার্স আছে। সকলের মুখেই বিষাদের ছায়া। কবি সুদীর্ঘ সময় নীরব আছেন। জীবনের ফেলে আসা দিনগুলির কথাই হয়ত চিন্তা করছেন।

হঠাৎ জানলার দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, আজ কত তারিখ?

নার্স দ্রুত গলায় বলল, বাইশে মার্চ।

—বসন্ত শুরু হয়ে গেছে।

তিনি বিছানা থেকে উঠে আরাম চেয়ারে এসে বসলেন। এইটুকু পরিশ্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। চোখ বন্ধ করলেন। একটু ঘুমের মত এল যেন। এই আচ্ছন্ন অবস্থাতেই ধীরে ধীরে জ্ঞান হারালেন। সকলে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে, হঠাৎ তিনি জ্ঞানহীন অবস্থাতেই উঠলেন, খড়খড়িগুলো খুলে দাও, আলো—আরো আলো আসুক!

এই তাঁর শেষ কথা। তারপরই চিরনিদ্রায় নিদ্রিত হলেন চিরকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি য়োহান ভোল্ক গাঙ্ গ্যেটে। "পৃথিবী আরো জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে উঠুক" এই উক্তি করে এইমাত্র যিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন, সেই জ্ঞানী পুরুষটির মৃতদেহের দিকে তাকিয়ে অনুমান করা কষ্টকর, যে তিনি সমস্ত জীবনভোরই অসংখ্য নারীকে প্রেমের খেলায় মাতিয়েছেন।

য়োহান কাসপার গ্যেটে জার্মানির ফ্রাঙ্কফুর্ট শহরের একজন ধনাঢ্য ও পদস্থ ব্যক্তি ছিলেন। ১৭৪৯ সালের ২৮শে আগস্ট সেদিন। কাসপার গ্যেটে নিজের উপবেশন কক্ষে চিন্তিত মুখে পদচারণা করছেন। স্ত্রী আসন্ন প্রসবা, কয়েকদিন থেকে অত্যন্ত কষ্ট পাচ্ছেন তিনি, কাজেই স্বামী চিন্তিত। এইসময় ধাত্রী এসে সংবাদ দিল শ্রীমতী গ্যেটে পুত্রের জননী হয়েছেন। আনন্দে উৎফুল্ল কাসপার ছুটে গেলেন স্ত্রীর কাছে। সুন্দর শিশুটিকে দেখে তিনি মুগ্ধ হলেন। তিনি তখন কল্পনাও করতে পারেননি এই শিশু পরবর্তীকালে প্রখ্যাত কবি হবে ও তার সুন্দর মুখশ্রী অনেক নারীর হৃদয়ে হিল্লোল তুলবে।

গ্যেটে বড় হতে লাগলেন।

অল্প বয়সেই ইংরাজী, ল্যাটিন, ফরাসি, হিব্রু প্রভৃতি অনেকগুলি ভাষা শিখে ফেললেন। ষোল বছর বয়সে তাঁকে পাঠান হল লাইপৎসিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। এখানে এসে গ্যেটে যত না পড়াশুনা করতেন তার চেয়ে অনেক বেশি সময় খরচ করতেন কবিতা লেখা ও সাহিত্য চর্চায়। বলতে গেলে এই সূত্রেই তিনি প্রেমে পড়লেন আনা কাতারিণার সঙ্গে।

এর আগে অবশ্য আরেকবার প্রেমে পড়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স বছর চৌদ্দ। ফ্রাঙ্কফুর্টে তাঁদের প্রতিবেশী ছিল মেয়েটি। এর আসল নাম জানা যায় না। কবি নিজের আত্মজীবনীতে একে গ্রেটখেন বলে উল্লেখ করেছেন। মেয়েটি ছিল অসাধারণ সুন্দরী। তাঁরা গ্যেটেদের সমকক্ষ ছিলেন না—গ্রেটখেনের বাবা দরিদ্র ব্যক্তি ছিলেন। গ্যেটের চেয়ে গ্রেটখেন বয়সে বড় ছিল। দু'জনের প্রায়ই দেখা সাক্ষাৎ হত। সে মোটেই বুঝতে পারেনি ধনীপুত্রটি তার প্রেমে পড়ে গেছে। বলাবাহুল্য এই একতরফা প্রেম দীর্ঘদিন স্থায়ী হয়নি।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটিয়ে ফেলেছিলেন গ্যেটে। প্রায় প্রতিদিন বন্ধু-বান্ধবদের নিয়ে এক হোটেলে তিনি যেতেন গল্পগুজব করতে। আনা কাতারিণা এই হোটেলের মালিকের মেয়ে। সুরূপ গ্যেটেকে সে প্রত্যহ দেখত, গ্যেটেও দেখতেন তাকে। কিন্তু কথাবার্তা হত না দুজনের মধ্যে। কবি ছাত্রাবাসে ফিরে গিয়ে আনার কথা চিন্তা করতে করতে অন্যমনস্ক হয়ে পড়তেন। এইভাবে বেশীদিন চলল না। একদিন ছোট একটা ব্যাপার নিয়ে কথাবার্তার সূত্রপাত হল।

অল্পদিনের মধ্যেই আলাপ গভীর হল দু'জনের। কল্পনা-প্রবণ গ্যেটে প্রাণভরে ভালবাসলেন আনাকে। এবং নিজের মনের ভাব গোপন করবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা তিনি করলেন না। ক্রমে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, আনা কারুর সঙ্গে সাধারণভাবে কথা বললে পর্যন্ত ঈর্ষা বোধ করতেন।

এই সময়ে গ্যেটে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। তিনি আর হোটেলে যেতে পারেন না। বিছানার আশ্রয়ে থাকেন। আনা তাঁর কাছে আসে। কথায় বার্তায় তাঁকে প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করে। সেদিন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বিছানায় শুয়ে ছটফট করছেন কবি। বারবার তাকাচ্ছেন দরজার দিকে। বিকেল হবার মুখে আনা আসে, আজ এখনও আসেনি। তার অনুপস্থিতিতে কবি অত্যন্ত অস্থিরতা বোধ করছেন।

এই সময় তিনি সংবাদ পেলেন আনা তার মায়ের সঙ্গে থিয়েটার দেখতে গেছে। গ্যেটের মন ভেঙ্গে গেল। অসুস্থ শরীরে ব্যাকুল হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করবেন জেনেও সে থিয়েটার দেখতে গেল! এই তার ভালবাসার গভীরতা? তিনি দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে জানলার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হঠাৎ তাঁর মনে হল, এমনি হয়নি তো যে সে মায়ের সঙ্গে থিয়েটারে যাচ্ছে এই কথা প্রচার করে, অন্য কোন প্রেমাস্পদের সঙ্গে ওখানে গেছে। অসম্ভব নয়।

গ্যেটে নিজে অসুস্থতার কথা ভুলে গেলেন। বিছানা ছেড়ে উঠে পোশাক বদলে ছুটলেন থিয়েটারের উদ্দেশ্যে। ওখানে গিয়ে অনুসন্ধান করে দেখলেন ভুল সংবাদ পেয়েছেন। আনা থিয়েটারে আসেনি। যাহোক, এরপর দু'জনের আন্তরিকতার মধ্যে ছেদ পড়ল। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পুরুষদের মতন মেয়েরা পাগলের মত প্রেমে পড়ে না। সতর্কতার সঙ্গে অনেক কিছু বিবেচনা করে তারা। আনা বোধহয় চিন্তা করে দেখল, বছর আঠারোর ছাত্র গ্যেটের ভবিষ্যৎ এখন অনিশ্চিত। সুতরাং এরকম একজনের সঙ্গে নিজের জীবনকে বেঁধে ফেলা অর্থহীন। গ্যেটে শেষ পর্যন্ত কি করতেন বলা যায় না। কিন্তু অবসর তিনি পাননি। লাইপৎসিগে থাকার আয়ু তাঁর ফুরিয়েছিল। আইনের ডক্টরেট ডিগ্রি পেয়ে তিনি ফিরে গেলেন ফ্রাঙ্কফুর্টে।

ফ্রাঙ্কফুর্টে ফিরে এসে আরম্ভ করলেন আইন ব্যবসা।

আইন সংক্রান্ত কাজেই তাঁকে একবার যেতে হয়েছিল ভেৎসলার। যাঁর কাজ নিয়ে ওখানে গিয়েছিলেন, তিনি তাঁকে একদিন এক গ্রাম্য নাচের মজলিসে নিয়ে গেলেন। ওখানে আলাপ হল শার্লোটের সঙ্গে। এর সম্পর্কে নিজের আত্মজীবনীতে কবি লিখেছেন, ইনি হচ্ছেন সেই জাতীয় নারী যাঁরা পুরুষের মনে বাসনার আগুন জ্বালায় না।

তিনি নিজের আত্মজীবনীতে যাই লিখুন না কেন, তাঁর তখনকার চিঠিপত্র পড়লে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়, শার্লোট তাঁর মনে নিশ্চিতভাবে বাসনার আগুন জ্বালিয়েছিলেন। বুদ্ধিমতী শার্লোট কেষ্টনর নামে এক ভদ্রলোকের বাগদত্তা ছিলেন। ভাবী স্বামীকে উপেক্ষা করার প্রশ্ন তাঁর মনে বিন্দুমাত্র স্থান পায়নি। গ্যেটের সঙ্গে তিনি মিশলেন, তরুণ কবিকে তাঁর ভালই লাগল। তবে দু'জনের মধ্যকার ব্যবধান

যাতে কমে না আসে সেদিকে তিনি সজাগ দৃষ্টি রেখেছিলেন।

গ্যেটে চেষ্টা করেও শার্লোটের হৃদয় জয় করতে পারলেন না। ক্রমে তিনি বুঝতে পারলেন বছরের পর বছর চেষ্টা করলেও তিনি সফলকাম হবেন না। তাঁর মন ভেঙ্গে গেল। কবি অসহ্য হৃদয় যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। তারপর কাউকে কিছু না জানিয়েই চুপি চুপি ফিরে গেলেন ফ্রাঙ্কফুর্টে। এই সময় তাঁর আত্মহত্যা করবার দুর্নিবার ইচ্ছে জেগেছিল।

এইরকম যখন শোচনীয় মনের অবস্থা তখন কবির সঙ্গে আলাপ হয় এলিজাবেথের সঙ্গে। এলিজাবেথের বাবা ফ্রাঙ্কফুর্টের এক ব্যাঙ্কের মালিক ছিলেন। গ্যেটে পরিবারের চেয়ে শ্যোনেম্যান পরিবার অর্থ ও মর্যাদায় অনেক উঁচুতে ছিলেন। বলা বাহুল্য এলিজাবেথের সৌন্দর্য ছিল তুলনাহীন। দু'জনের আলাপ হয় নাটকীয় ভাবেই।

কাজকর্ম প্রায় ছেড়েই দিয়েছেন। গ্যেটে চুপচাপ বাড়িতে বসে থাকেন ও চিন্তা করেন নারী মনের বিচিত্র রহস্যের কথা। একদিন এক বন্ধু এলেন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। সদা প্রফুল্ল গ্যেটের মনমরা ভাব দেখে বিস্মিত হলেন। এর কারণ জানতে চাইলেন। প্রথমে কিছু বলতে চাননি কবি। পিড়াপিড়ি করায় সমস্ত কিছু বললেন।

বন্ধু বললেন, যা হবার হয়ে গেছে। অনর্থক চিন্তাকে প্রশ্রয় দিলে স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে যায়। তুমি সমস্ত ঝেড়ে ফেলে দাও!—চল, এক জায়গায় আমার সঙ্গে ঘুরে আসবে, ভালই লাগবে তোমার। বিমর্ষভাবে কবি বললেন, কোথায়?

—আমার এক পরিচিত ভদ্রলোকের বাড়ি।

—না ভাই, আমাকে আর কারুর বাড়ি যেতে অনুরোধ করো না।

—কিন্তু এইভাবে তোমার চুপচাপ বসে থাকা চলবে না। কি শোচনীয় ব্যাপার, আত্মহত্যা করার কথা পর্যন্ত চিন্তা করেছ!

তিনি জোর করে গ্যেটেকে শ্যোনেমানের বাড়িতে নিয়ে গেলেন।

বিরাট বাড়ি। একবার ভাল করে তাকালেই বুঝতে পারা যায় আভিজাত্য ও ঐশ্বর্য বাড়ির প্রতিটি খাঁজে আশ্রয় নিয়েছে। বাগান অতিক্রম করে দু'জনে বারান্দায় উঠলেন। তারপর ড্রইংরুমে—তখন ড্রইংরুমে বসে এলিজাবেথ পিয়ানো বাজাচ্ছিল। ঘরে অবশ্য সে একা ছিল না, অভ্যাগতরা ছিলেন।

গ্যেটে বসলেন একপাশে।

এলিজাবেথের সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতে হঠাৎ তাঁর মনে তীব্র শিহরণ জাগল। পিয়ানোর রিডের উপর তার সুদৃশ্য আঙ্গুলের আনাগোনা তাঁকে মাতাল করেছিল। শার্লোটের চিন্তায় এতদিন দগ্ধ হচ্ছিলেন কবি—কোথায় উবে গেল সেই

চিন্তা! বিচিত্র মনের অধিকারী গ্যেটে প্রথম দর্শনেই গভীরভাবে প্রেমে পড়ে গেলেন এলিজাবেথের।

এক সময় পিয়ানো বাজানো শেষ হল। সকলে হাততালি বাজিয়ে বাদিকাকে অভিনন্দন জানালেন। সকলের সঙ্গে যোগ দিলেন গ্যেটে। এলিজাবেথের সঙ্গে বন্ধু পরিচয় করিয়ে দিলেন। বছর সতেরোর বেশি বয়স হবে না তার। কবি মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন এলিজাবেথের দিকে। সেদিন দু'জনের মধ্যে বিশেষ কথা হল না। তবে এলিজাবেথের মনে এই যুবকের সুন্দর চেহারা ও মার্জিত কথাবার্তা যে সাড়া জাগাল না তা নয়।

দিন দুইয়ের মধ্যেই সঙ্কোচকে জয় করে কবি আবার এলেন এখানে।

সৌভাগ্যবশতঃ এলিজাবেথকে একলাই পাওয়া গেল। পিয়ানো বাজানোর সূত্র ধরেই কথা আরম্ভ হল প্রথমে। তারপর দু'জনে বাড়ি সংলগ্ন বাগানে গিয়ে বসলেন। অনেক অর্থহীন কথা হল, যা সাধারণতঃ এই রকম অবকাশে হয়ে থাকে। অনেক সময় হয়েছে লক্ষ্য করে গ্যেটে বিদায় নিতে প্রস্তুত হলেন।

এলিজাবেথ বলল, আবার আসছেন তো?

কবি যেন একটু দ্বিধা করলেন।

—আবার...

—আর আমাদের দেখা হবে না?

—নিশ্চয় হবে। তবে এখানে নয়।

—কেন, জায়গাটা তো বেশ? আমি এই সময় আগামীকাল আপনার জন্যে এই গাছের তলাতেই অপেক্ষা করব।

গ্যেটে বললেন, একথা স্বীকার করতেই হবে, বাড়ি সংলগ্ন এত সুন্দর বাগান আমি দেখিনি। তবু আমরা যদি আরো কোন নির্জন জায়গায় সাক্ষাৎ করি তোমার তাতে কোন আপত্তি আছে কি?

খিলখিলিয়ে হেসে উঠল এলিজাবেথ।

—আপনি এত সসঙ্কোচে কথা বলছেন কেন? আমার কোন আপত্তি নেই।

গ্যেটে সাক্ষাৎ করার জায়গাটার নাম করলেন। স্থির হল আগামীকাল এই সময়ে দু'জনে সেখানে গিয়ে মিলিত হবেন। পরিপূর্ণ মনে কবি বাড়ি ফিরে এলেন। অনেক রাত্রি পর্যন্ত চিন্তা করবার পর স্থির করলেন, কালই নিজের মনকে সম্পূর্ণ উন্মুক্ত করে দেবেন এলিজাবেথের কাছে। আজ তার মনোভাবের যে পরিচয় পেয়েছেন তাতে স্বচ্ছন্দে অনুমান করা চলে সে তাঁর হৃদয়াবেগকে উপেক্ষা করবে না। একরকম না ঘুমিয়েই রাত কেটে গেল।

পরিপূর্ণ উত্তেজনা নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ে যথাস্থানে গিয়ে গ্যেটে উপস্থিত হলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই এলিজাবেথ এল। সাজের গুণে আজ তার রূপ চতুর্গুণ বর্দ্ধিত হয়েছে বলে মনে হল কবির।

—আমি কি খুব দেরি করে ফেলেছি? এলিজাবেথ প্রশ্ন করল।

—না।

দু'জনে বসলেন এক জায়গায়।

—আজকের দিনটা কিন্তু চমৎকার।

—হ্যাঁ। আমি তোমাকে গোটা কয়েক কথা বলতে চাই।

মৃদু হেসে এলিজাবেথ বলল, আমরা তো কথাবার্তা বলতেই এখানে একত্র হয়েছি।

—তা ঠিক। আমি তোমাকে বিশেষ ধরনের একটা কথা বলতে চাই।

—বলুন।

বলতে কিন্তু পারলেন না গ্যেটে।

কি বলবেন তা রিহার্শাল দিয়ে রেখেছিলেন কয়েক ঘণ্টা ধরে। এমন কি তিনি বলবার পর এলিজাবেথের কাছ থেকে কয়েক ধরনের উত্তর পাওয়া যেতে পারে এই আঁচ করে, তার উত্তরও তিনি ঠিক করে রেখেছিলেন। অথচ এই বিশেষ মুহূর্তে কিছুই বলতে পারলেন না।

এক অজানা কারণেই রাজ্যের সঙ্কোচ তাঁর কণ্ঠরোধ করে দিয়েছে।

এলিজাবেথ গ্যেটের মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, চুপ করে রইলেন কেন? বলুন।

অন্য কথার আশ্রয় না নিয়ে উপায় ছিল না।

তিনি বললেন, শুনেছ বোধ হয় আমি কবিতা লিখতে পারি?

—শুনিনি আবার! আপনার কবিতার প্রশংসা আমি অনেকের মুখে শুনেছি।

—আমি তোমাকে একটা কবিতা শোনাতে চাই, এলিজাবেথ।

—এর জন্য এত সঙ্কোচ করছেন! আজ তো আমি ভেবেই রেখেছিলাম আপনাকে অনুরোধ করব। কবিতা শুনতে আমি খুব ভালবাসি।

সেদিন বিশেষ কোন কথা হল না। কবিতা শুনিয়েই সময় কাটিয়ে দিলেন গ্যেটে। মনকে এলিজাবেথের সামনে খুলে ধরলেন তৃতীয় সাক্ষাৎকারে।

বেশ পরিষ্কার গলায় বললেন, কোন ব্যাপারেই আমি নিয়ম মাফিক চলতে পারি না। তাছাড়া তাড়াহুড়ো করে অনেক কাজও আমায় করতে হয়েছে। সময় সময় তা শিষ্টাচার বহির্ভূত আমি জানি। তবু আমি না বলে থাকতে পারছি না, এই অল্প মেলামেশাতেই আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

এলিজাবেথ কিছু বলল না। মাথা নত করে বসে রইল।

—রাগ করলে লিজা?

—না।

—সকলেই অপেক্ষা করে। উভয় পক্ষের অন্তরঙ্গতা বিশ্বস্ততায় পরিণত হয়েছে জানবার পর ভালবাসার কথা বলে। কিন্তু আমার এত ধৈর্য কোথায়?

মাথা নত করেই এলিজাবেথ বলল, স্পষ্ট কথা যত তাড়াতাড়ি বলা যায় ততই ভাল।

এই কথায় উৎফুল্ল হলেন গ্যেটে।

নিজের মানুষকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে বললেন, তুমিও যে আমাকে ভালবাস একথা জেনে আনন্দিত হলাম। আমি আমাদের ভালবাসাকে পরিপূর্ণ রূপ দিতে চাই।

—কি বলতে চাইছ তুমি?

—আমি তোমায় বিয়ে করতে চাই লিজা। আমার এই পঁচিশ বছরের জীবনে অনেক কিছু দেখলাম। অতীতে কখনও মনে হয়নি, কেউ আমার প্রেরণার উৎস হয়ে উঠতে পারে।

আমি ভাগ্যবান, এতদিনে তোমার দেখা পেয়েছি।

নারী পুরুষকে নিবিড়ভাবে আকর্ষণ করে বিবাহের সম্মতি জানালে।

ব্যাপারটা জানাজানি হয়ে গেল।

গ্যেটের চেষ্টাতেই এটা হল। গুরুজনদের কানে কথাটা পৌঁছালে দু'জনের মিলনের পথে অনেক বাধা ছিল। অচিরেই দুই পরিবারের কর্তারা মিলিত হলেন। ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা হল। এবং শেষে দু'জনে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, ওদের বিবাহের ব্যবস্থা করাই বাঞ্ছনীয়।

ব্যাঙ্কার শ্যোনেম্যান একদিন নিজের সুরম্য গৃহে পার্টির আয়োজন করলেন। বাগদান পর্ব সেখানেই সমাধা হল। ভাবী জামাতার সঙ্গে অতিথিদের পরিচয় করিয়ে দিলেন গৃহকর্তা। সকলে এক বাক্যে স্বীকার করলেন দু'জনকে মানাবে অপূর্ব।

এরপর সময় কেটে চলল।

গ্যেটে ও এলিজাবেথ মহা খুশি। দু'জনে একসঙ্গে প্রায় প্রজাপতির মত উড়ে বেড়ায় এখানে ওখানে। ভবিষ্যৎ জীবন নিয়ে চলে নানা জল্পনা-কল্পনা। এখন গির্জায় যাবার দিনস্থির হয়ে গেলেই তাঁরা নিশ্চিন্ত হন।

কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। কি একটা সামান্য কারণ নিয়ে দুই পরিবারের মধ্যে মনোমালিন্য আরম্ভ হয়ে ক্রমে তা ঘোরাল হয়ে উঠল। বলাবাহুল্য, বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপনের বিষয়টি নস্যাৎ করলেন দু'জনে। স্তব্ধ হয়ে গ্যেটে নিজের ভবিষ্যৎকে

চুরমার হয়ে যেতে দেখলেন। তাঁর মনে হল প্রলয়ঙ্কর ঝড় উঠেছিল, সমস্ত কিছুকে তছনছ করে দিয়ে গেল।

এলিজাবেথ ভেঙে পড়ল। কান্নাকাটি করল প্রচুর। গ্যেটের সঙ্গে তাকে সাক্ষাৎ করতে নিষেধ করে দেওয়া হল। এমন কি একা বাড়ির বাইরে যাবার স্বাধীনতাটুকুও রইল না। দিন কয়েকের মধ্যে মনোস্থির করে ফেলল এলিজাবেথ। প্রথম অসতর্ক মুহূর্তেই বাড়ি থেকে বেরুল।

সাক্ষাৎ হল দু'জনের।

মুহ্যমান গ্যেটে বললেন, কাজটা তুমি ভাল করোনি।

—কোন্ কাজ?

—বাড়ি থেকে এইভাবে চলে আসা...

—আর তো কোন উপায় ছিল না। অন্যায় জুলুম আমি মুখ বুজে সইতে পারব না।

—কোন উপায় তো নেই। আমাদের এক হয়ে যাওয়া ওঁরা চাইছেন না।

ওঁরা না চাইলে কি আসে যায়। আমরা নিজেরাই তো পথ খুঁজে নিতে পারি।

এলিজাবেথের কথায় অবাক হলেন গ্যেটে।

—তুমি কি বলতে চাইছো লিজা?

—সকলের অলক্ষ্যে চল না আমরা এখান থেকে আমেরিকা চলে যাই। ওখানে বাকি জীবন সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে কাটিয়ে দিতে পারব।

গ্যেটে চমকে উঠলেন। পরিস্থিতিকে করায়ত্ত করবার জন্য এতটা নিচে নেমে যেতে তাঁর সংস্কারে বাধছিল। অন্য যে কেউ হলে এই সুযোগ গ্রহণ করতে দ্বিধা করত না। কিন্তু গ্যেটের কথা স্বতন্ত্র। তিনি যেমন প্রচণ্ড খেয়ালি ছিলেন, অন্যধারে তাঁর মন তেমনি সংস্কারাবদ্ধ ছিল।

তিনি বললেন, এ হয় না লিজা। অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সঙ্গে নিয়ে আমরা আমেরিকার পথে ভেসে পড়তে পারি না।

—আমেরিকা ধনীর দেশ। ওখানে মানুষ সহজেই নিজের আর্থিক সঙ্গতিকে গড়ে তুলতে পারে।

—পারে হয়ত। কিন্তু আমাদের সে সুযোগ গ্রহণ করা উচিত নয়। দু'টি অভিজাত বংশের সম্মানকে নষ্ট করার অধিকার আমাদের দুজনের নেই, লিজা।

কথা আর বেশি দূর এগুলো না। এলিজাবেথ বিদায় নিল। তার সঙ্গে আর গ্যেটের সাক্ষাৎ হয়নি। নিজের আত্মচরিতে কবি এলিজাবেথকে লিলি নামে উল্লেখ করেছেন। এবং বলেছেন, তাঁর প্রকৃত প্রেমের পাত্রী একমাত্র লিলি ছাড়া আর কেউ হতে পারেনি।

তবে এই উক্তি সম্পর্কে প্রচুর সংশয় আছে। কবি প্রথম দর্শনে এলিজাবেথকে ভালবেসে ফেলেছিলেন ঠিকই, তবে সেই ভালবাসায় উদ্দামতা থাকলেও, গভীরতা ছিল না।

গভীরতা থাকলে যে কোন মূল্যে তিনি তাকে নিশ্চিতভাবে বিবাহ করতেন। কারণ পরবর্তী জীবনে নারীঘটিত ব্যাপারে অসংখ্যবার তিনি সংস্কারকে পদদলিত করেছেন। সুতরাং একথা ভেবে নিলে অন্যায় হবে না যে, এলিজাবেথের উপর তাঁর সাময়িক মোহ ছিল, বিবাহের কথা ভেঙ্গে যাবার পর সেই মোহ কেটে যায়।

গ্যেটে আইন ব্যবসা ছেড়ে দিলেন।

বছরখানেক অন্যকোন কাজকর্ম না করে একাগ্র মনে লিখে যেতে লাগলেন। ১৭৭৫ সালে গুণগ্রাহী ডিউক কার্ল আউগুস্ট তাঁকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গেলেন ভাইমারে। এইখানেও বছরখানেক লেখা নিয়ে একাগ্র থাকার পর ভাইমার রাজদরবারে অন্যতম মন্ত্রীপদ গ্রহণ করলেন। কার্ল আউগুস্টের সঙ্গে গ্যেটের গভীর অন্তরঙ্গতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বাকি সুদীর্ঘ জীবন তিনি এই রাজপরিবারের সঙ্গেই ছিলেন।

ভাইমারে তাঁর চমৎকার ভাবে জীবন কাটতে লাগল। বাস করবার জন্য তাঁকে দেওয়া হয়েছিল একটি সুদীর্ঘ গৃহ। সেদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে অন্যমনস্ক মনে বাগানে পায়চারি করছেন গ্যেটে। এটি তাঁর নিত্যকর্ম। এইভাবে পায়চারি করবার সময় কত সুন্দর একটি কবিতার জন্ম হয়েছে।

হঠাৎ তিনি লক্ষ্য করলেন একটি তরুণী অদূরে এসে দাঁড়িয়েছে। মুখ তুলে তরুণীটিকে ভাল করে দেখলেন গ্যেটে। উচ্ছল-যৌবনা, অপরূপ দেহসৌষ্টবের অধিকারিণী সে। চমৎকার মুখশ্রী। কবি কয়েক পা এগিয়ে গেলেন তার দিকে।

—কিছু বলবে?

সে ইতঃস্তত করতে লাগল।

—কিছু বলবার থাকলে বলতে পার।

সে সসঙ্কোচে বলল, আবেদন নিয়ে এসেছিলাম আপনার কাছে।

বিস্মিত গ্যেটে বললেন, কিসের আবেদন?

—আমার বড় ভাই অনেকদিন থেকে বেকার বসে আছেন। তিনি সাহিত্যজীবী। আপনি যদি অনুগ্রহ করে রাজদরবারে তাঁর কোন চাকরি করে দেন।

গ্যেটে তার হাত থেকে আবেদন পত্রটি নিলেন। দ্রুত চোখ বুলিয়ে গেলেন। তারপর আবার তাকালেন তরুণীর দিকে। তার দু'চোখের তারায় আশা-নিরাশা দোল খাচ্ছে। আবার বছর দুয়েক পরে কবির মন মোচড় দিয়ে উঠল। তিনি অনুভব

করলেন তরুণীর অপরূপ সৌন্দর্য তাঁর মনে দুর্বার গতিতে রেখাপাত করে চলেছে।

—তোমার নাম কি?

—ক্রিসতিয়ানা ফুলপিউস।

—তুমি কি কোথাও কাজ করো?

হ্যাঁ। বেরটুশের ফুলের কারখানায়।

—আবেদন পত্রটি আমার কাছেই থাক। তুমি পরে এসে দেখা করো।

সে বিদায় নিল। ভগবানকে মনে মনে ধন্যবাদ দিলেন গ্যেটে। নিজের ভাগ্যের উপর ঈর্ষা হতে লাগল। সেই মুহূর্তে তিনি স্থির করে ফেললেন নিজের জীবনের সঙ্গে বেঁধে ফেলবেন ক্রিসতিয়ানা ফুলপিউসকে। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন বিনম্র, শান্ত স্বভাবের মেয়েটি তাঁর জীবনকে নিঃসন্দেহে ভরিয়ে তুলতে পারবে।

আবার দেখা হল দু'জনের।

তারপর ঘন ঘন কয়েকবার।

শেষে একদিন গ্যেটে বললেন, জীবনটা দারিদ্র্যের মধ্যেই কাটিয়ে দেবে স্থির করেছ?

শান্ত গলায় ক্রিসতিয়ানা বলল, দারিদ্র্যকে জয় করবার ক্ষমতা তো আমার নেই।

—তুমি কারুর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছ না কেন?

ক্রিসতিয়ানা ম্লান হাসল।

—আমায় তো কেউ সেরকম প্রস্তাব করেনি।

বিস্মিত গ্যেটে বললেন, তোমার মত সুন্দরী মেয়ের কাছেও কেউ এগিয়ে আসেনি। ভাইমারের দুর্ভাগ্য বলতে হবে।

ক্রিসতিয়ানা কিছু বলল না। গ্যেটের প্রতি তার শ্রদ্ধার সীমা নেই। ওঁর মত প্রখ্যাত অভিজাত ব্যক্তি কত সহানুভূতির সঙ্গে কথা বলেন। অথচ আবেদন পত্র নিয়ে এখানে আসতে সে সাহসী হচ্ছিল না। ভয়কে জয় করতেই তার লেগেছিল কয়েকদিন সময়।

দরিদ্র তরুণীটির কাছে ইতঃস্তত করার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

গ্যেটে আবার বললেন, আমি কিন্তু তোমাকে গ্রহণ করতে প্রস্তুত আছি।

এবার বিস্মিত হবার পালা ক্রিসতিয়ানার। নিজের কানকে বিশ্বাস করা তার পক্ষে কষ্টকর হয়ে উঠল। ভাইমারের রাজমন্ত্রী তার মত দরিদ্র ফুলের কারখানার কর্মীকে গ্রহণ করতে চান! তার জীবনে এরকম অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটবে সে কোন দিন কল্পনা করেছে!

—আমাকে.....আপনি.....

অসংলগ্ন ভাবে কয়েকটি শব্দ মাত্র গলা চিরে বেরিয়ে এল ক্রিসতিয়ানার।

—আমি তোমাকে ভালবাসি! আমার প্রস্তাবে কি তোমার সমর্থন আছে?

—নিজের কানকে আমি বিশ্বাস করতে পারছি না।

—অবিশ্বাস করারও কিছু নেই। বল ক্রিসতিয়ানা, রাজি আছো?

এত বড় সৌভাগ্যকে বরণ না করার কোন প্রশ্ন ওঠে না। ক্রিসতিয়ানা নিজেকে সঁপে দিল কবির হাতে। বিবাহ তাঁদের হল না, কিন্তু স্বামী-স্ত্রী রূপে বাস করতে লাগলেন দু'জনে। দু'জনের একত্র জীবন কেটেছিল দীর্ঘদিন। ক্রিসতিয়ানার মৃত্যুতেই ছাড়াছাড়ি হয়েছিল। অনেক পরে আইন-সম্মত ভাবে কবি তাকে বিবাহ করেছিলেন। দীর্ঘদিন স্বামী-স্ত্রী হিসেবে বসবাস করার পরও কেন যে কবি তাকে বিবাহ করতে এত বিলম্ব করেছিলেন তা অনুমান করা কঠিন। গ্যেটে ও ক্রিসতিয়ানার মিলিত জীবন অত্যন্ত সুখের ছিল। এই সুখাবেগের প্রেরণাতেই তাঁর অপূর্ব কাব্য "রোমান এলিজিস" প্রসূত হয়েছিল।

কিন্তু তা সত্ত্বেও কবির জীবনে আরো নারী এসেছে। সুযোগ-সুবিধা এবং সেরকম মনোরোচক পাত্রী পেলেই তিনি প্রেমে পড়ে গেছেন। উদাহরণ দিতে গেলে তাঁর জীবনের শেষের দিকের দুটি প্রেমের কথা বলতে হয়। কবির তখন সত্তর বছর বয়স অতিক্রম করে গেছে। ক্রিসতিয়ানা তখন মারা গেছে।

তিনি তখন প্রায়ই যেতেন লোফৎসোভদের বাড়ি। মারিনবাডে বেড়াতে এসেছিলেন। ওখানেই ওদের সঙ্গে আলাপ। লোফৎসোভদের বাড়িতেই উলরিকার সঙ্গে দেখা হল। উলরিকাকে সুন্দরী বলা যায় না। তবে প্রচণ্ড আকর্ষণীয় শক্তি ছিল তার। তাকে দেখেই কবি হৃদয় হারালেন। শেষ পর্যন্ত স্থির করলেন উলরিকাকে বিবাহ করবেন।

কিন্তু নিজের মুখে প্রস্তাবটা তুলতে সঙ্কোচ হতে লাগল। বয়সের জন্যই এই সঙ্কোচ বলা বাহুল্য। চুয়াত্তর বছরের গ্যেটের বিপরীতে উলরিকা মাত্র ঊনিশ বছরের। উপায়ান্তর না দেখে বন্ধু ও মনিব ডিউক কার্ল আউগুস্টকে নিজের মনের কথা বললেন। তাঁর ধারণা ছিল এই কথা শুনে কার্ল ক্ষুণ্ণ হবেন। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু দেখা গেল তিনি উৎসাহের সঙ্গে এই প্রস্তাব নিয়ে উলরিকার মার কাছে যেতে সম্মত।

কথাটা শুনে ভদ্রমহিলা তো অবাক। বৃদ্ধ রাজমন্ত্রী তাঁর মেয়েকে বিবাহ করতে চান, তাঁর বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল না। তিনি এও এক রাজসিক ঠাট্টা বলে মনে করলেন। ডিউক তাঁকে বোঝালেন, ঠাট্টা নয়। সত্যি কবির এই রকম ইচ্ছে আছে। অগত্যা বিমূঢ়া উলরিকা জননী প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখার জন্য কিছুদিন সময় চেয়ে নিলেন।

ডিউকের মুখে সময় চেয়ে নেওয়ার কথা শুনে গ্যেটে ক্ষুণ্ণ হলেন। তিনি বিলম্ব সহ্য করতে পারছিলেন না। শেষ পর্যন্ত এই বিবাহ কার্যকারি হল না। তাঁর ব্যক্তিগত চিকিৎসকের ঘোর আপত্তি দেখা গেল। এই আপত্তিকে অগ্রাহ্য করা কঠিন ছিল না। কিন্তু এর চেয়েও বড় বাঁধা তাঁর ও উলরিকার মধ্যে এসে দাঁড়াল। কবির পুত্র ও পুত্রবধূ সমস্ত ব্যাপারটাকে বানচাল করে দিলেন। দুঃসহ মনোকষ্টে অসুস্থ হয়ে পড়লেন গ্যেটে। জীবনের আশা সকলে ছেড়েই দিয়েছিল। যাহোক, কিছুদিন ভোগবার পর তিনি আবার সুস্থ হয়ে উঠলেন।

এরপর মাদাম সিমানোভস্কারের কথা বলতে হয়। গ্যেটের জীবনের শেষ প্রণয়িনী। অসাধারণ সুন্দরী মাদাম জাতে পলিস ছিলেন। তিনি পিয়ানো বাজাতেন আর কবি আত্মহারা হয়ে শুনতেন। উলরিকার প্রেমে ক্ষতবিক্ষত তাঁর হৃদয়ে মাদাম কিছুটা প্রলেপ লাগাতে পেরেছিলেন। এঁকে কেন্দ্র করে কবি একটি কবিতা লিখেছিলেন। প্রায়শ্চিত্ত নামে সেই কবিতা বিখ্যাত হয়ে আছে।

আশ্চর্যের বিষয় গ্যেটে জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যুবকদের মত সতেজ ছিলেন। মনকে রঙ্গীন করে রেখেছিলেন। ইতিহাসে এ রকম বৃদ্ধ যুবকের সংখ্যা খুব বেশি নেই।

যাযাবর প্রেমিক শেলী

বাইরে তখন প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। ঝির ঝির করে তুষার পড়ছে।

পথেঘাটে জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই। সমস্ত সাসেক্স যেন নিস্তব্ধ, নির্জীব। এই শোচনীয় জলহাওয়া ব্যারণ পুত্র শেলীকে কিন্তু স্পর্শ করছে না। তাঁর মনের মধ্যে ঝড় বইছে, আরেক ঝড়। বহুক্ষণ ধরে ঘরের মধ্যে অস্থির ভাবে পায়চারি করে বেড়াবার পর তিনি তুষারপাতকে গ্রাহ্য না করে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন।

এক অজানা আকর্ষণ তাঁকে টেনে নিয়ে চলল, গ্রামের প্রান্তের সেই কুঞ্জবনে—যেখানে তাঁর ও হ্যারিয়েটের প্রেম প্রথম অঙ্কুরিত হয়েছিল। ভেজা ঘাসের উপর বসে পড়লেন শেলী। অভিমানহত মনে হ্যারিয়েটের উপেক্ষা, অবজ্ঞার কথা চিন্তা করতে লাগলেন।

এই ঘটনার সূত্র ধরতে গেলে বেশ কিছুটা পেছিয়ে পড়তে হবে। জেনে নিতে হবে শেলীর পরিচয় ও তাঁর কার্যকলাপের কথা। ইংরাজী সাহিত্যের প্রখ্যাত কবি পার্থি বিশি শেলী সোনার চামচ মুখে নিয়ে পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেন। পিতামহ সাসেক্সের ধনী ব্যারণদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন। বাবা টেমথী শেলী পার্লামেণ্টের সদস্য। কিশোর বয়স থেকেই নির্জনতাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন শেলী। তাঁর সময় কাটত বাড়ির সংলগ্ন বিরাট অরণ্যোদ্যানে ফুল ও পাখিদের মধ্যে। তিনি গোলমাল, ঝামেলা ও ভিড় পছন্দ না করলেও তাঁর এমনই দুর্ভাগ্য যে, বাকি জীবন ওই তিনটি তাঁর নিত্যসঙ্গী হয়ে থেকেছে।

যথাসময়ে তাঁকে ভর্তি করে দেওয়া হল ইটেন স্কুলে। সেকালে ধনী ও অভিজাত সমাজ ইটেন ছাড়া ছেলেদের শিক্ষার ব্যাপারে আর কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কথা চিন্তাই করতে পারতেন না। ইটেনে আসবার পর নিদারুণ হতাশায় শেলীর মন ভরে উঠল। এখানকার পোশাক সর্বস্ব বাচাল ছেলের দল তাঁকে উত্যক্ত করে তুলল। তার সুন্দর মুখশ্রীতে মেয়েলি আদল থাকায় তাঁকে কম ঠাট্টা বিদ্রুপ সহ্য করতে হত না। শেলী বাড়ির কথা চিন্তা করতেন, ছুটির আশায় উন্মুখ হয়ে থাকতেন। বারংবার মনে পড়ে যেন হ্যারিয়েটের কথা। তার এই খুড়তুতো বোনকে কিশোর শেলী প্রাণ ভরে ভালবেসেছিলেন।

ছুটিতে বাড়ি এসে দু'জনে বনে বনে ঘুরে বেড়াতেন। একটা শাখা নদীর নির্জন

প্রান্তে গিয়ে বসতেন। মুখে মুখে কবিতা রচনা করে শোনাতেন হ্যারিয়েটকে। এইভাবে কৈশোর কেটে গেল। এল যৌবন। স্কুলের পালা শেষ করে শেলী এলেন অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তে। এখানে আলাপ হল উচ্ছল তরুণ হগের সঙ্গে। আলাপ গভীর বন্ধুত্বে পরিণত হল অল্প দিনের মধ্যে। দু'জনের মধ্যে অনেক বিষয়ে আলাপ হয়। তর্ক হয়, জার্মান সাহিত্য নিয়ে, ইতালিয়ান সাহিত্য নিয়ে, ভগবানের অস্তিত্ব নিয়ে। এই সমস্ত আলোচনার ফাঁকে ফাঁকে অবশ্য বন্ধু হগকে হ্যারিয়েটের কথা বলতে ভোলেন না শেলী।

একবার ছুটিতে বাড়ি ফিরেছেন। দুপুরে হ্যারিয়েটের সঙ্গে দেখা। দু'জনে চলে এলেন ছায়া ঘেরা এক কুঞ্জের মধ্যে। অনেক সুখ দুঃখের কথা হল। শেষে শেলী বললেন, পরীক্ষায় এবার ভাল ভাবে বোধহয় পাশ করতে পারব না।

—কেন?

—তোমার জন্যে।

হ্যারিয়েট শেলীর সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে সবিস্ময়ে বলল, আমার জন্যে কেন?

—আমার বন্ধু হগতো বলে, সব সময় হ্যারিয়েটের কথা যদি চিন্তা করো তবে পড়বে কখন?

—আমার কথা নাইবা ভাবলে এত।

—তাকি সম্ভব?

হ্যারিয়েট অন্যমনস্ক ভাবে বলল, এত দৃঢ় আমাদের সমাজের বাঁধন যদি না হত?

মৃদু হেসে শেলী বললেন, তাহলে তো বাঁধনের প্রয়োজনই ছিল না। আমরা এ সমস্ত নিয়ে নাইবা চিন্তা করলাম।

—কিন্তু লোকাচার—

—এই গতিশীল দিনে সেকালের আচার-অনুষ্ঠানের মূল্য কতটুকু?

সেই মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল, এ জীবনে দু'জনের ছাড়াছাড়ি হবে না। কোন প্রতিবন্ধককে গ্রাহ্য করেন না শেলী। খুড়তুতো বোন হওয়া সত্ত্বেও হ্যারিয়েটকে বিয়ে করবেন। দু-একদিনের মধ্যেই তাদের হাবে-ভাবে ব্যাপারটা অনেকেই আঁচ করে নিলেন। একান-ওকান হতে হতে কর্তাদের কানে কথাটা শেষে পৌঁছাল। আশ্চর্যের বিষয় কোন আপত্তি দেখা গেল না। বরং দু'পক্ষই উৎসাহ প্রকাশ করলেন।

হ্যারিয়েটকে লাভ করা সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হয়ে শেলী অক্সফোর্ডে ফিরে গেলেন। পড়াশুনায় মন দিলেন এবং অবসর সময় "সমাজতত্ত্ব বিপ্লবের" উপর একখানা

বই লিখতে আরম্ভ করলেন। ইদানিং তিনি গডউইনের দর্শন পড়ছিলেন। গডউইনের প্রদর্শিত পথ তাঁকে মুগ্ধ করেছিল। তার বই সেই পথকে অনুসরণ করে লেখা হচ্ছিল। বই শেষ হবার পর শেলী লিখলেন হ্যারিয়েটকে, এমন একখানা বই লেখা শেষ করেছি যাতে সমাজের সমস্ত নোংরামীকে ধুয়ে ফেলবার আপ্রাণ চেষ্টা করা হয়েছে।

শেলী পাণ্ডুলিপি নিয়ে এক প্রকাশকের কাছে উপস্থিত হলেন। নতুন লেখকদের সঙ্গে কথাবার্তা বলতে প্রকাশকরা সাধারণতঃ তেমন উৎসাহ বোধ করেন না। এই প্রকাশকটিও তেমন গা করতেন না, যদি না তিনি শুনতেন, নবাগত লেখকটি ব্যারণ পুত্র। পাণ্ডুলিপির দু'চার পাতা উল্টে প্রকাশক বললেন, পড়ে দেখতে হবে। না পড়ে আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয় ছাপব কিনা।

পাণ্ডুলিপি রেখে শেলী বিদায় নেবার পর প্রকাশক সমস্তটা পড়ে দেখলেন। প্রবন্ধের বিষয়বস্তুতে তাঁর স্তম্ভিত না হয়ে উপায় ছিল না। অভিজাত ঘরের একটি তরুণ, এই ধরনের সমাজ-বিরোধী রচনা কিভাবে কলমের ডগায় আনতে পারল তা তিনি ভেবে পেলেন না। তিনি কাল বিলম্ব না করে স্যার টেমথীকে চিঠি লিখলেন। যার বক্তব্য হল, তাঁর ছেলের লেখা একখানা ভয়ানক পাণ্ডুলিপি তিনি পেয়েছেন। তাতে যা লেখা আছে প্রচলিত সামাজিক নীতির তা সম্পূর্ণ বিপরীত। তাঁর মত মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির সন্তান এই ধরনের ভয়াবহ মতবাদ মনে স্থান দেন লক্ষ্য করে স্তম্ভিত হয়েছেন। সুতরাং এই বই প্রকাশের পূর্বে তিনি ন্যায়ত এই সংবাদ তাঁকে জানাতে বাধ্য।

চিঠি পড়ে রাগে ফেটে পড়লেন স্যার টেমথী। আত্মীয়-স্বজনরা শুনলেন শেলীর কাণ্ড-কারখানা। হ্যারিয়েটের কানেও কথাটা পৌঁছাল। এই সময় শেলী বাড়ি এলেন। স্যার টেমথী ছেলেকে বকাঝকা করলেন প্রচুর। শেলী নীরবে সমস্ত সহ্য করলেন। এবং এ ধরনের রচনা আর লিখবেন না এ নিশ্চয়তা তিনি দিতে পারলেন না। বাড়ির লোকেরা তাঁকে এড়িয়ে চলতে লাগল। এমনকি ছোট বোনেরাও। হ্যারিয়েটেরও দেখা পাওয়া যায় না।

অগত্যা একদিন বোন এলিজাবেথকে জেরা করলেন, হ্যারিয়েটের কি হয়েছে, সে আমার সঙ্গে দেখা করে না কেন?

—কাকীমা তোমার সম্পর্কে আর ভাল মত পোষণ করেন না। তোমার লেখার কথাটা জানবার পর খুব রাগারাগি করেছেন।

—আমি হ্যারিয়েটের কথা জানতে চাইছি, কাকীমার নয়।

কাঁপা গলায় এলিজাবেথ বলল, কাকীমা তোমার সঙ্গে হ্যারিয়েটকে মিশতে নিষেধ করেছেন। তাছাড়া সে একদিন বলছিল তোমার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা করে কি

লাভ? একদিন তো তুমি জানতেই পারবে সে কত সামান্য। তোমার মতবাদকে সমর্থন করবার মত শক্তি তার নেই।

আর কোন কথা শুনতে চাইলেন না শেলী। হ্যারিয়েটের কাছে ছুটে গেলেন সমস্ত বাধা অতিক্রম করে। ভূমিকা না করেই প্রশ্ন করলেন, আমার মতবাদের জন্য কি আমি প্রেম থেকে বঞ্চিত হব?

সচকিতা হ্যারিয়েট চুপ করে রইল।

—বল, এই যুক্তির কি কোন অর্থ হয়?

নিরুত্তাপ গলায় হ্যারিয়েট বলল, তুমি যা ইচ্ছে ভেবে নিতে পার, আমার তাতে কোন ক্ষতিবৃদ্ধি নেই। শুধু এইটুকু জেনে রাখ, তোমার সঙ্গে আমার জীবনকে জড়াতে পারব না। হ্যারিয়েট এই ধরনের কথা বলবে কল্পনা করতে পারেন নি শেলী। কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর তীব্র অভিমান তাঁর মনকে ঘিরে ধরল। আর কোন কথা বললেন না। বলে লাভ কি? মাথা নিচু করেই চলে এলেন হ্যারিয়েটের কাছ থেকে।

......ভাবতে ভাবতে ভোর হয়ে গেল। তুষারপাত তখনও বন্ধ হয়নি। অনেক স্মৃতি জড়িত কুঞ্জ থেকে বাড়িতে ফিরে এলেন শেলী। কয়েকদিনের মধ্যেই হ্যারিয়েটের বিয়ে হয়ে গেল অন্যত্র। আর এখানে থেকে কি হবে? বাড়ি ছেড়ে আবার শেলী অক্সফোর্ড চলে গেলেন। ওখানে পৌঁছে কয়েকদিন ধরে মনকে বারংবার বিশ্লেষণ করছেন। পরিচিত সমস্ত সামাজিক ব্যবস্থার উপর তাঁর ঘৃণা আরো তীব্র হয়ে উঠল। দৃঢ়বদ্ধ মন নিয়ে লিখতে বসলেন, "নাস্তিকতার প্রয়োজনীয়তা"। লেখা শেষ হবার পর প্রকাশকের কাছে আর গেলেন না। কারণ একথা অবধারিত যে, কোন প্রকাশক এ বই ছাপতে চাইবে না।

নিজের পয়সায় ছদ্মনামে বই প্রকাশ করলেন। তারপর বিক্রি করার জন্য জমা দিয়ে এলেন এক পুস্তক বিক্রেতার কাছে। শেলীর দুর্ভাগ্য বলতে হবে, প্রথম যিনি বইখানা দেখতে চাইলেন তিনি আর কেউ নন, অক্সফোর্ডের বিখ্যাত ধর্মযাজক রেভারেণ্ড জন ওয়াকার। বইয়ের দু'চার পাতা উল্টে দেখে নিয়ে ক্রুদ্ধ রেভারেণ্ড পুস্তক বিক্রেতার কাছ থেকে লেখকের আসল পরিচয় জেনে নিলেন এবং নিজের কর্মসূচী বাতিল করে দিয়ে সাক্ষাৎ করতে গেলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডীনের সঙ্গে। বলা বাহুল্য, এরপর শেলীকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার করা হল।

শেলী রাগে, দুঃখে দিশেহারা অবস্থায় লণ্ডন চলে এলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর পোলাণ্ড স্ট্রীটে সস্তায় ঘর পাওয়া গেল। বাড়িতে লিখলেন, কিছু টাকা পাঠাবার জন্য। টাকা এল না, তার পরিবর্তে এল বাবার একখানা চিঠি। স্যার টেমথী অনেক কিছু লেখবার পর ছেলেকে লিখেছেন, তোমার কাণ্ড-কারখানায় আমি হতবাক

হয়ে গেছি। তবে তোমায় জানিয়ে রাখতে চাই, আমার নিজের ধর্মবিশ্বাসের উপর আমার প্রগাঢ় কর্তব্য আছে। সুতরাং ভবিষ্যতে তুমি যদি আমার আশ্রয়ে থেকে নিজের জীবনকে গড়তে চাও তাহলে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পালন করে চলতে হবে—(১) সত্বর বাড়ি ফিরে আসতে হবে। (২) হগের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করতে হবে। (৩) আমি তোমাকে যাঁর তত্ত্বাবধানে রাখব তাঁর কথা মত চলতে হবে।

সর্তগুলি বিশেষ কঠিন নয়। মেনে চলতে না পারলে তোমার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক থাকবে না।

পরের ডাকেই শেলী চিঠির উত্তর দিলেন। লিখলেন, আমার ভবিষ্যৎ কর্ম-পন্থার বিষয়ে যখন আপনি আমার মতামতের উপর নির্ভর করছেন তখন আপনার মনে আঘাত লাগলেও আমি জানিয়ে রাখতে বাধ্য হচ্ছি যে, আমার পক্ষে কোন সর্ত মেনে চলা সম্ভব নয়।

অগত্যা টেমথী শেলীকে লণ্ডন আসতে হল। কিন্তু কোন ফল হল না। পিতা পুত্রকে বুঝিয়ে বাড়ি নিয়ে যেতে পারলেন না। পুত্রও পিতাকে স্বমতে আনতে পারলেন না। টেমথী এক কপর্দকও ছেলেকে দেবেন না এই প্রতিজ্ঞা করে সাসেক্সে ফিরে গেলেন।

নিজের প্রতিজ্ঞায় অটল থাকলেও শোচনীয় অর্থকষ্টের মধ্যে পড়তে হল শেলীকে। কবিতা লেখেন কিন্তু তা থেকে রোজগার হয় না। তাঁর মত সমাজ বিদ্রোহীকে যে কেউ চাকরি দেবে সে সম্ভাবনাও কম। এই রকম যখন অবস্থা তখন একরকম হঠাৎই কিছু কিছু অর্থ সাহায্য তিনি পেতে লাগলেন। তাঁর ছোট বোনেরা মিসেস কেনিংয়ের একাডেমীতে থেকে পড়াশুনা করত। তারা বড় ভাইকে হাত খরচের টাকা পাঠিয়ে দিতে লাগল।

ক্রমে শেলী স্কুলে গিয়ে তাদের সঙ্গে দেখা করতে লাগলেন। কথাটা চাপা রইল না, টেমথী জানতে পারলেন। তিনি মিসেস কেনিংকে চিঠি লিখে জানিয়ে দিলেন, শেলীকে যেন তাঁর মেয়েদের সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া না হয়। অগত্যা বোনদের শরণাপন্ন হতে হল বান্ধবীদের। হ্যারিয়েট ওয়েষ্টব্রুক রাজি হয়ে গেল তাদের কাছ থেকে টাকা নিয়ে শেলীকে পৌঁছে দেবার জন্যে।

এখন হ্যারিয়েট ওয়েষ্টব্রুকের পরিচয় দেওয়া দরকার। মিষ্টার ওয়েষ্টব্রুক অবসর-প্রাপ্ত সরকারি চাকুরে—সমস্ত জীবন সংযত হাতে খরচ করার দরুণ শেষ জীবনে কিছু অর্থের সংস্থান করতে পেরেছেন এইমাত্র বলা চলে। বহুদিন হল পত্নী বিয়োগ হয়েছে। বড় মেয়ে এলিজা সংসারের সমস্ত কাজকর্ম দেখাশুনা করে। বিয়ে থা করবার তার তেমন ইচ্ছে নেই। ছোট মেয়ে হ্যারিয়েটকে বড় ঘরে বিয়ে দেবার আশা রাখেন ওয়েষ্টব্রুক। তাই তাকে ভাল স্কুলে পড়াচ্ছেন। শেলীর সুন্দর

চেহারা প্রথম দর্শনেই হ্যারিয়েটকে মুগ্ধ করে। কয়েকবার ঘন ঘন সাক্ষাতের পর সে তাঁর প্রেমে পড়ে গেল।

আর্থিক দুশ্চিন্তায় মন ভারাক্রান্ত থাকায় প্রথমে শেলী হ্যারিয়েটকে লক্ষ্য করেননি।—বোনদের সঙ্গে সাক্ষাতের পথ রুদ্ধ হয়ে যাবার পর সে যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এল তখন তিনি সচেতন হলেন। তাঁর প্রেমিকার নামের সঙ্গে এই সুন্দর মেয়েটির নামের মিল থাকায় কেমন আকর্ষণ বোধ করতে লাগলেন।

বেশ কয়েকবার দেখা-সাক্ষাৎ হবার পর নিজের জড়তা কাটিয়ে উঠলেন শেলী। বলি বলি করেও এতদিন বলতে পারেননি, আজ নিজের মনের কথা বলবেন হ্যারিয়েটকে। শেলী সাগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। হ্যারিয়েট এল বিকালে। বোনেদের কুশল সংবাদ দিল সে। ইতঃস্তত ভাবে দু'চার কথা আরো হল।

গলা ঝেড়ে নিয়ে শেষে শেলী বললেন, আমাদের দু'জনের উচিত কথাবার্তা পরিষ্কার ভাবে বলে নেওয়া।

—কোন্ বিষয়ে?

—আমার বোনেদের আরো বান্ধবী আছে। তারা আজ পর্যন্ত কেউ আমার কাছে আসেনি, অথচ তুমি—! আমার বিশ্বাস, আমার সম্পর্কে তোমার আগ্রহ না থাকলে তুমি—

কথাটা শেলী শেষ করল না।

—হ্যারিয়েট কিছু বলল না। মাথা নত করে রইল।

কবি আবার বললেন, আমার বলতে বাঁধা নেই আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

চকিতে মুখ তুলে হ্যারিয়েট আবার মাথা নত করল।

—হ্যারিয়েট—

—বলুন?

—মুখ তুলে আমায় তোমার মনের কথাটা বল।

মনে হল নিজের সঙ্কোচকে কাটাবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে হ্যারিয়েট। ধীরে ধীরে মুখ তুলে কাঁপাগলায় বলল, আমি....আমিও....

বিজয়ী শেলী তাকে কাছে টেনে নিলেন।

তারপর দিন এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনের ভালবাসা গভীর থেকে গভীরতর হতে লাগল। ইতিমধ্যে হ্যারিয়েট শেলীর কথা দিদি এলিজাকে বলেছে। স্কুলেও কানাকানি আরম্ভ হয়ে গেছে। চরম হল যেদিন তার বইয়ের মধ্যে থেকে মেয়েরা শেলীর একটা চিঠি আবিষ্কার করল। সমস্ত স্কুলে তোলপাড়—। মিসেস কেনিং নিজের ঘরে ডেকে পাঠালেন হ্যারিয়েটকে। অনেক লাঞ্ছনা-গঞ্জনা তাকে

সহ্য করতে হল। তিনি শেষে বললেন, একজন ঘোর নাস্তিক ও সমাজদ্রোহীর সঙ্গে প্রেম করার চেয়ে বড় অপরাধ আর নেই।

শেলী শুনলেন সমস্ত কথা। বিশ্বসংসার কেন তাঁকে এত ঘৃণা করে তা তাঁর পক্ষে বুঝে ওঠা কষ্টকর। হ্যারিয়েটের মুখের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকার পর বললেন, ভয় পেয়ে গেছ?

—না।

—তোমার বাবা ও দিদি কোন বিরুদ্ধ মত প্রকাশ করেছেন?

—কই-না।

—শোন হ্যারিয়েট, সমস্ত আলাপ-আলোচনার মুখ বন্ধ করার একটি মাত্র পথ আছে। আমাদের বিয়ে হয়ে যাওয়া। কিন্তু—

আয়ত চোখ দুটি শেলীর মুখের উপর স্থাপন করে হ্যারিয়েট বলল, থামলে কেন?

—আমার অবস্থা তো দেখছ। আমি—

—তুমি কি আমি জানি।

—ভাবাবেগে বিভ্রান্ত হয়োনা, হ্যারিয়েট। আমার মত কপর্দকশূন্য লোকের সঙ্গে জীবন বেঁধে ফেলার আগে ভেবে দেখ, তোমার কি করা উচিত।

—ভেবে দেখার কিছু নেই। তোমাকে বাদ দিয়ে আমার জীবন অর্থহীন। সমস্ত অসুবিধাকে আমি মানিয়ে নিতে পারব, তুমি দেখে নিও।

বিয়ের কথা পাকা করে ফেলবার পর শেলী অর্থ সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। আর একা যখন থাকবেন না তখন কিছু অর্থ অন্তত চাই। কিন্তু কে দেবে তাঁকে? কোথা তেকে সংগৃহীত হবে? এই রকম যখন অবস্থা তখন মামার কাছ থেকে চিঠি পেলেন শেলী। মামা পিলফোর্ড একজন প্রাক্তন সেনানায়ক। ভাগনের দুরাবস্থার কথা শুনে তাকে ডেকে পাঠালেন নিজের কাছে।

হাতে চাঁদ পেলেন শেলী। সময় নষ্ট না করে তিনি কার্কফিল্ডে মামার বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সহানুভূতির সঙ্গে ভাগনেকে গ্রহণ করলেন পিলফোর্ড। তারপর গিয়ে ধরলেন ডিউক অব নরফোককে। ডিউকের জোরালো চিঠিতে শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন টেমথী ছেলেকে বার্ষিক সাহায্য করতে।

আপাতত অর্থচিন্তা মিটল।

এদিকে—

মিসেস কেনিং বোঝালেন ওয়েষ্টব্রুককে, আলেয়ার পিছনে ছুটে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ব্যারণের ছেলে শেলী কখনই সাধারণ ঘরে বিয়ে করবে না।

হ্যারিয়েটকে কিছুদিন নাচিয়ে সে সরে পড়বে। চিন্তা করে ওয়েষ্টব্রুক দেখলেন কথাটা মিসেস কেনিং মিথ্যা বলেননি। নজিরের তো অভাব নেই। সুতরাং হ্যারিয়েটের স্কুল যাওয়া বন্ধ হল। মেয়েকে একজন ধর্মযাজকের তত্ত্বাবধানে রাখবার ব্যবস্থা করলেন ওয়েষ্টব্রুক।

দীর্ঘদিন অনুপস্থিত থাকার পর লণ্ডনে ফিরলেন শেলী। হ্যারিয়েটের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন, কিন্তু তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হল না। হ্যারিয়েট চিঠি লিখে জানাল সমস্ত কথা। অগত্যা চরমপন্থা গ্রহণ করতে হল। এক সন্ধ্যায় গোপনে হ্যারিয়েট চলে এল শেলীর বাসায়। তারপর তাকে নিয়ে শেলী লণ্ডন ছাড়লেন। চলে আসতে হল এডিনবরায়। ওখানে পাওয়া গেল সহৃদয় বাড়িওয়ালাকে। সে অল্প ভাড়ায় দু'খানা ঘর ছেড়ে দিল।

আগামীকালের প্রখ্যাত কবির বিয়ে হল অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে এখানে। তারপর হ্যারিয়েটের প্রাণ ঢালা ভালবাসায় বুঁদ হয়ে রইলেন শেলী। সময় কেটে চলল। কিছু কবিতাও লিখলেন। সময় সময় স্ত্রীর কাছে তাঁর মানব-ত্রাণ পরিকল্পনার বিষয়গুলি ব্যাখ্যা করেন। ওই সমস্ত গুরুগম্ভীর বিষয়ের কিছুই বুঝতে পারে না হ্যারিয়েট। সে নিরাসক্তভাবে শোনে আর স্বামীকে সমর্থন করে যায়।

ওয়েষ্টব্রুক মেয়ের কাণ্ড-কারখানায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন। তাকে হাতের কাছে না পেয়ে বড় মেয়ে এলিজাকে দশ কথা শুনিয়ে দিলেন। রাগ অবশ্য তাঁর শেষ পর্যন্ত পড়ে গেল হ্যারিয়েটের চিঠিতে তিনি জানতে পারলেন তাদের বিয়ে হয়ে গেছে এবং দু'জনে সুখে আছে। কি খেয়াল হল এলিজাকে পাঠিয়ে দিলেন তাদের কাছে। দিদিকে পেয়ে খুশি হল হ্যারিয়েট। শেলীরা তিনজনে পরামর্শ করে স্থির করলেন বিখ্যাত লেক প্রদেশে গিয়ে কিছুদিন কাটিয়ে আসবেন। ওখানকার নৈসর্গিক শোভার খ্যাতির কথা প্রবাদে পরিণত হয়েছে। অবশ্য লেক প্রদেশে যাবার আরো একটি উদ্দেশ্য ছিল। মিষ্টার টেমথী কথামত টাকা পাঠাচ্ছিলেন না। ডিউক অব নরফোক তখন লেক প্রদেশে। তাঁকে গিয়ে কথাটা জানালে সুরাহা হবার সম্ভাবনা প্রবল।

লেক প্রদেশে পৌঁছে শেলী আত্মহারা হয়ে উঠলেন। বন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ান। লেকের ধারে আনমনে বসে থাকেন। ভাবের আবেগ এলে ছুটে যান—

ছত্রে ছত্রে উজাড় করে দেন মনের কথা। সঙ্গে যে আরো দুটি নারী আছে সে কথা মনেই থাকে না সব সময়। অনুযোগ করে হ্যারিয়েট। স্বামীর মন ঘোরাবার জন্যে আদরে-আদরে ভরিয়ে তোলে। শেলী হাসেন!

খরচের মাত্রা ঠিক না থাকার দরুণ অর্থকষ্ট দেখা দিল এই সময়। নরফোকের সঙ্গে দেখা করার কথা মনে পড়ে গেল শেলীর। তিনি সাক্ষাতের প্রার্থনা জানিয়ে

চিঠি লিখলেন ডিউককে। চিঠি পাওয়ামাত্র তিনি সপরিবার শেলীকে সমাদরে গ্রহণ করলেন প্রাসাদে। ডিউক মৃদু ভর্ৎসনা করে মিস্টার টেমথীকে লিখলেন টাকা যেন নিয়মিত পাঠান হয় ছেলেকে।

নরফোক প্রাসাদে কয়েকদিন থাকার পর তিনজনে লণ্ডনে ফিরে এলেন। রাজধানীতে ফিরে শেলী আবার গডউইন তত্ত্ব নিয়ে পড়লেন। দীর্ঘ এক চিঠি লিখলেন গডউইনকে এবং নিজের গুরু হিসেবে মেনে নিলেন। গডউইন রচিত "পলিটিক্যাল জাস্টিশ" তখন ইংলণ্ডে প্রবল আন্দোলন এনেছিল। প্রধানমন্ত্রী পিটের যুক্তিতে জেলের বাইরে ছিলেন তিনি। নইলে মন্ত্রীসভার অন্যান্য সদস্যবর্গ ওই ধরনের সমাজ-বিরোধী বই লেখার জন্য গডউইনকে চার দেওয়ালের মধ্যে বন্ধ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। পিট যুক্তি দেখালেন, ওঁকে জেলে পাঠালে বা বইটির প্রচার বন্ধ করে দিলে গডউইনের আদর্শকেই তুলে ধরা হবে। তার চেয়ে কিছু না করাই ভাল। ছ' গিনি খরচ করে বই কিনে পড়বার সামর্থ সাধারণ মানুষের নেই।

বিবাহকে কুসংস্কার হিসেবে প্রচারিত করলেও গডউইন দু'বার দার পরিগ্রহ করেছিলেন। অনেকগুলি সন্তানের জনক হওয়ায় আর্থিক অনটনের সীমা ছিল না। তবু তিন কন্যা মেরী, জেন ও ফ্যানীকে উচ্চশিক্ষা দেবার আপ্রাণ চেষ্টা করে যাচ্ছিলেন। এই সময় এক ব্যারণ পুত্র তাঁকে গুরু হিসেবে বরণ করায় তিনি বিশেষ আনন্দিত হলেন।

এদিকে শেলী জগতের কল্যাণ করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠেছেন। তিনি স্থির করে ফেললেন আয়ারল্যাণ্ডে গিয়ে প্রচারকার্য চালাবেন। তখন আইরিশরা ইংল্যাণ্ডের হাত থেকে মুক্তি পাবার জন্য সবে আন্দোলন আরম্ভ করেছে। হ্যারিয়েট ও এলিজাকে নিয়ে তিনি ডাবলিন পৌছালেন। চতুর্দিকের পরিস্থিতি বিচার করে তিনি দেখলেন, যদি আইরিশরা মদ ছেড়ে দেয় তাহলে সকলের মনেই স্বাধীনতার মন্ত্র অঙ্কুরিত হবে।

শেলী পার্কে পার্কে বক্তৃতা আরম্ভ করলেন। লোকে তাঁর বক্তৃতা কি শুনবে, তাঁকে বিদ্রূপ করতে লাগল। পচা ডিম ও টমাটো ছুঁড়ে মারতে লাগল। ডাবলিনের পুলিশের বড়কর্তা শুনলেন, ইংল্যাণ্ডের এক ব্যারণের ছেলে আইরিশদের বোঝাবার চেষ্টা করছে মদ ছেড়ে দিলেই স্বাধীনতা পাবে—তিনি ঘর ফাটিয়ে হাসলেন কিছুক্ষণ।

শেলী শ্রান্ত হয়ে পড়লেন। তিনি বুঝতে পারলেন যাদের জন্য তিনি চুরি করতে এসেছেন তারাই তাঁকে চোর বলছে। আইরিশরা নিজেদের ভাল চায় না। হ্যারিয়েট তাঁর কাণ্ড-কারখানায় বিলক্ষণ বিরক্ত হচ্ছিল। সে আশা করেছিল আয়ারল্যাণ্ডে

এসে প্রাণ ভরে বেড়াবে, শেলীকে নিজের খুব কাছে পাবে—তা নয়, একি—! সে প্রস্তাব করল, আর এখানে একদিনও থাকা চলতে পারে না। ইংল্যাণ্ডে ফিরে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

শেলী সঙ্গে সঙ্গে সমর্থন করলেন এই প্রস্তাব। তিনজনে ফিরে এলেন লণ্ডনে। গডউইন আমন্ত্রণ জানালেন শেলীকে। গুরুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন তিনি। গডউইন পরিবারের সকলে উৎসুক ছিলেন শেলীকে দেখবার জন্য। গডউইন তাঁর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শেলীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে বললেন, আমার বড় মেয়ে মেরীর সঙ্গে দেখা হল না। সে এখন স্কটল্যাণ্ডে আছে। আমার স্বর্গীয়া স্ত্রীর ছবির দিকে তাকিয়ে দেখ তাহলে তার চেহারা সম্বন্ধে কিছুটা আন্দাজ করতে পারবে।

কবি মিসেস গডউইনের ছবির দিকে তাকালেন, এরকম সৌন্দর্য সচরাচর চোখে পড়ে না। সেদিন ওখান থেকে ফিরে আসবার পর তিনি স্থির করলেন, দুঃস্থ গুরুকে কিছু কিছু অর্থ সাহায্য করবেন। এরপর ঘন ঘন যান গডউইনের বাড়ি। নানারকম আলাপ-আলোচনা হয়। কবিতাও লেখেন প্রচুর। কিন্তু রাত্রে যখন স্ত্রীকে কাছে টেনে নিতে যান তখন বাধা পান কবি। নানারকম অজুহাতে স্বামীকে এড়িয়ে যায় হ্যারিয়েট। ভাবপ্রবণ শেলী অবাক হন—মনে আঘাত পান।

ক্রমে ক্রমে বাড়িতে অশান্তি বাড়তে থাকে। এলিজা বোনকে বুঝিয়ে দেয় এই অভাব-অভিযোগের মধ্যে নিজের জীবনকে ব্যর্থ করে দেবার কোন অর্থ হয় না। সে ইচ্ছা করলেই তো বাড়ি-গাড়ি সমস্ত কিছু হাতের মুঠোর মধ্যে পেতে পারে। স্ত্রীর হাবভাব দেখে শেলী ভয় পেয়ে যান। স্ত্রীকে কাছে টেনে নিয়ে করুণ গলায় প্রশ্ন করেন, তুমি কেন এরকম হয়ে যাচ্ছ?

ছিটকে সরে এসে তীক্ষ্ণগলায় হ্যারিয়েট বলে, তুমি কি এমন আমার জন্যে করছ যাতে সব সময় হাসি ফুটিয়ে রাখব। যে কোন মধ্যবিত্ত ঘরের চাকরানি আমার চেয়ে সুখে থাকে।

—আমার অবস্থাতো দেখছ। অর্থ না থাকলে আমি কি করব বল?

—অথচ গডউইন পরিবারকে অর্থ সাহায্য দিতে তোমার কার্পণ্য নেই!

—তাঁদের প্রয়োজন আমাদের চেয়ে অনেক বেশি।

—পরের দুঃখ দূর করবার জন্যই যখন তুমি ব্যস্ত তখন আমার মুখে হাসি দেখবার জন্য এত উতলা হচ্ছ কেন?

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে শেলী বললেন, বিয়ের আগে আমি বলেছিলাম অনেক কষ্টে তোমার দিন কাটতে পারে, তুমি বলেছিলে—মানিয়ে চলতে পারবে। অথচ—

ভ্রূভঙ্গী করে হ্যারিয়েট বলল, তখন আমার কিছু ভেবে দেখবার ক্ষমতা ছিল নাকি? তা ছাড়া কবে কি বলেছি ভাল করে আমার মনেও নেই।

শেলী কিছু আর বলেন না। দিন কালের সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে—অনেক পরিবর্তন হয়েছে হ্যারিয়েটের। এরপর অশান্তির রাজত্ব হয়ে উঠল সংসার। দারিদ্র্যের জন্য স্ত্রী ও এলিজার বিদ্রূপ তিনি পদে পদে সহ্য করতে লাগলেন। যেখান থেকে পারেন টাকা ধার করে এনে ওদের হাতে দেন তবু মন পাওয়া যায় না। ইতিমধ্যে শেলী কন্যার জনক হয়েছেন। ছোট্ট শিশুকে নিয়ে মনের অশান্তি ভোলবার চেষ্টা করেন। তাকে কোলে নিয়ে দোল দেন। মুখে মুখে ছড়া রচনা করেন। এ সমস্ত ভাল লাগে না হ্যারিয়েট ও এলিজার। তারা ঝঙ্কার দিয়ে বলে, মেয়ে নিয়ে এত বাড়াবাড়ি অসহ্য।

শেলী অনেক ভেবেও কুল পান না। দারিদ্র প্রেমের পথে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে কেন? ব্যক্তিগতভাবে তিনি ধনী ছিলেন না একথা জেনেও হ্যারিয়েট তাঁর জীবনে এসেছিল। তিনিও তাকে সাগ্রহে গ্রহণ করেছিলেন আত্মার সহচরী হিসেবে। কিন্তু একি! তাঁর প্রেমের এ কি পরিণতি!

এই সময় মেজর রিয়ান নামে একজন প্রাক্তন সামরিক কর্মচারি বাড়িতে যাওয়া-আসা আরম্ভ করেছিল। এলিজার সে পরিচিত। সেই সূত্রে হ্যারিয়েটের সঙ্গে তার পরিচয় হয়েছে। শেলী স্তম্ভিত বিস্ময়ে দেখেন, হ্যারিয়েট যখন-তখন মেজর রিয়ানের সঙ্গে বেরিয়ে যাচ্ছেন। তাঁর কাছ থেকে অনুমতি চাওয়া দূরের কথা, উপেক্ষার হাসি ফুটিয়ে তাঁর সামনে দিয়ে দু'জনে হাত ধরাধরি করে চলে যায়।

ব্যথা পান শেলী। তাঁর হৃদয় ক্ষত-বিক্ষত হতে থাকে। এই সময় আবার হ্যারিয়েটকে নিয়ে এলিজা এক আত্মীয়ের বাড়ি চলে গেল। সেখানে মেজর রিয়ানের নিয়মিত যাতায়াত চলতে লাগল। অগত্যা শেলী গেলেন স্ত্রীকে ফিরিয়ে আনতে। স্বামী অনুনয় করলেন স্ত্রীকে। কোন ফল হল না। হ্যারিয়েট কোন কথাই মন দিয়ে শুনল না। শেষে পরিষ্কার জানিয়ে দিল সে আর ফিরে যেতে পারবে না।

ক্ষত-বিক্ষত মনে ফিরে এলেন শেলী। কয়েকদিন ধরে অবিরত চিন্তা করতে লাগলেন মানুষ মানুষকে এমনভাবে আঘাত করে কেন? প্রেমপিয়াসী কবি শূন্য গৃহে উদভ্রান্তের মত কাটাতে লাগলেন। এই সময় তাঁকে গডউইন আহ্বান করলেন। তিনি সবই শুনেছিলেন। বললেন, যা হবার হয়ে গেছে। তোমার মত প্রতিভাবানের মুষড়ে পড়া ঠিক নয়। তুমি নিয়মিত আমার কাছে আসবে, নানারকম আলাপ-আলোচনায় সময় কাটাতে পারব আমরা। শেলী নিয়মিত গডউইনের বাড়িতে যাওয়া-আসা করতে লাগলেন। ফ্যানি ও জেনকে তিনি এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করতেন। তাঁর মনে সন্দেহ জাগত, এরা দু'জনেই তাঁর সঙ্গে ঘনিষ্ট হবার চেষ্টা করতে পারে। তারপর আবার বঞ্চনা।

মেরীর কথা প্রায়ই শুনতেন শেলী। তাঁর রূপ বর্ণনা করতে-করতে বাড়ির

সকলেই গদ গদ হয়ে পড়তেন। জেনের চিঠিতে মেরীও শেলীর অনেক সংবাদ পেত। ছুটিতে মেরী স্কটল্যাণ্ড থেকে বাড়ি ফিরল। দু'জনের সাক্ষাৎ হল। প্রথম দর্শনেই মুগ্ধ হলেন শেলী। আর মেরী—তার দু'চোখের তারায় হাজার বাতির ঔজ্জ্বল্য। তার মনে হল, এমন সুদর্শন যুবক সে আর দেখেনি।

ছুটিতে বাড়ি এলেই প্রতিদিন মায়ের কবরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালতে যায় মেরী। শেলী একদিন তার সঙ্গদানের জন্য প্রার্থনা জানালেন। মেরী আপত্তি করল না। দু'জনে চললেন পাশাপাশি কবরখানার দিকে। আবার সেই শেলী, প্রেম বেপথু—।

প্রদীপ জ্বালিয়ে ফিরে আসবার পর দু'জনে বসলেন গিয়ে পার্কে।

কোন ভূমিকা না করেই শেলী কাঁপা গলায় বললেন, তুমি কি বুঝতে পেরেছো মেরী, আমি তোমায় ভালবেসে ফেলেছি!

মেরী নীরবে মাথা নাড়ল।

—আমাকে কি তুমি গ্রহণ করবে?

—আপনি আমায় লজ্জা দেবেন না।

—ঠিক কথাই বলছি। আমি বড় শ্রান্ত মেরী। একটা নিভৃত আশ্রয়ের জন্য গুমরে-গুমরে মরছি। সেই আশ্রয় তুমি দিতে পার। বল, আমায় বিমুখ করবে না? তবে—

—তবে কি?

—আমি বিবাহিত। তোমাকে—

বাধা দিল মেরী। কোমল গলায় বলল, আমি সমস্ত জানি। আপনার স্ত্রীর হৃদয়হীনতার কথা জেন যখন বলছিল, আমি চোখের জল রোধ করতে পারিনি। ওর দু'হাত চেপে ধরে শেলী বললেন, হ্যারিয়েটকে আমি ভালবেসেছিলাম। কিন্তু আমার ভালবাসাকে সে অর্থের নিক্তিতে পরিমাপ করে দেখল। তাই তোমাকেও প্রথমে আমি জানিয়ে রাখতে চাই, এক হৃদয় ছাড়া আমার কাছে কিছুই নেই।

মেরী কবির আলিঙ্গনে ধরা দিল।

ভেঙ্গে পড়া গলায় বলল, আমি তোমাকে, তোমার প্রতিভাকে ভালবেসেছি, আমার আর কিছুই চাই না।

হ্যারিয়েটের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করবার জন্য প্রস্তুত হলেন শেলী। তার সঙ্গে বিবাহ-বন্ধন ছিন্ন না হওয়া পর্যন্ত আইন মেরীকে বিয়ে করবার অধিকার দেবে না। তিনি মেরীর উপস্থিতিতেই তাকে ডেকে পাঠালেন। হ্যারিয়েট এল। তার দিকে তাকাতেই শেলীর মন ঘৃণায় রি-রি করে উঠল। সে তখন গর্ভবতী। কার পাপকে সে বয়ে বেড়াচ্ছে ঈশ্বর জানেন।

হ্যারিয়েটকে সমস্ত কথা শেলী বললেন। হৃদয়ের সম্পর্ক যখন আর নেই তখন অনর্থক আইনের বোঝাকে ঘাড়ে চাপিয়ে লাভ কি? দু'জনের বিয়েকে অসিদ্ধ করে দেওয়াই মঙ্গলজনক। মেরীর সাক্ষাৎ পাবার পর থেকেই হ্যারিয়েটের মন জ্বলছিল। সে ডাইভোর্স দিতে অস্বীকার করল। অনেক অনুনয় করলেন শেলী। কথা কাটাকাটিও হল। শেষে ডাইভোর্সের পরিবর্তে একটা বিষয়ে সম্মত হল হ্যারিয়েট। নিয়মিত তাকে অর্থ সাহায্য করলে শেলীকে আর কোনদিন সে বিরক্ত করতে আসবে না।

অগত্যা কবি রাজী হলেন।

গডউইন্ .কিন্তু শেলীর সম্পর্কে সম্পূর্ণ হতাশ হয়েছিলেন। তাঁর প্রচুর টাকার দরকার। তাঁর ধারণা হয়েছিল, শেলী তাঁর ধনী ব্যারণ বাপের কাছ থেকে প্রচুর টাকা এনে দেবে। বলতে গেলে এই লোভেই তিনি মেরীর সঙ্গে তাঁর মেলামেশায় বাধা দেননি। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল, অর্থ সংগ্রহের কোন চেষ্টা নেই শেলীর। তিনি নিজেকে নিয়েই বিভোর থাকেন।

কাজেই গডউইন আর মেরীর সঙ্গে তাঁর মেলামেশাটা ভাল চোখে দেখলেন না। এবং একদিন তাঁকে এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করে দেওয়া হল। হ্যারিয়েটকে যেভাবে শেলী নিজের করে পেয়েছিলেন, অগত্যা সেই পথই অবলম্বন করতে হল। সকলের অলক্ষ্যে একদিন কবির সঙ্গে গৃহত্যাগ করল মেরী। অবশ্য জেন তার পিছু ছাড়ল না। তাকেও সঙ্গে নিতে হল।

১৮১৪ সালের মাঝামাঝি মেরী ও জেনকে নিয়ে শেলী প্যারী পৌঁছালেন। রইলেন কিছুদিন ওখানের হোটেলে। যাবার ইচ্ছে আছে সুইজারল্যাণ্ড। দুই উদ্দাম প্রেমিকের মাঝে জেন তখন সম্পূর্ণ বেমানান। সে দু'জনের কাছ থেকে দূরে দূরে থাকবার চেষ্টা করে। প্রেমিকদ্বয়ও যে তার উপস্থিতিকে বিরক্তিকর মনে না করে তা নয়।

অল্প দিনের মধ্যে বেহিসেবীপনার দরুণ হাতের অর্থ অসম্ভব কমে গেল। অগত্যা স্থির হল হেঁটেই সুইজারল্যাণ্ডের পথে রওয়ানা হতে হবে। না গেলেও স্বচ্ছন্দে চলে। তবু শেলী যাবেন। কারণ তাঁর রক্তের প্রতিটি কণিকায় যাযাবর মনোবৃত্তি মিশে রয়েছে। সে সময় ফ্রান্সের পথঘাট নিরাপদ ছিল না। একদল পুরুষ সময় বিশেষে সীমান্ত অতিক্রম করতে ভয় পেত। শেলী ওসমস্ত বিষয় নিয়ে মাথা ঘামালেন না। মেরী ও জেনকে নিয়ে যাত্রা করলেন। ভেবেছিলেন বাকি জীবন সুইজারল্যাণ্ডেই কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু তা হল না। প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে ঘুরপাক খেয়ে আবার ইংল্যাণ্ডে ফিরে গেলেন। একেবারে কপর্দকশূন্য অবস্থা। লণ্ডনের

এক জঘন্য পল্লীতে অর্দ্ধাহারে দিন কাটতে লাগল। তবু সান্ত্বনা ছিল—মেরীর প্রাণ ঢালা ভালবাসা শেলী পাচ্ছিলেন। সে পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল, জেনের তীব্র দুর্বলতা রয়েছে শেলীর উপর। অথচ মুখ ফুটে মেরী কিছু বলতেও পারছিল না বোনকে। শেলীও ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিলেন।

এইভাবে বছর খানেক কাটবার পর নিদারুণ অর্থ সমস্যার একটা সমাধান হয়ে গেল। শেলী সংবাদ পেলেন, তাঁর এক আত্মীয় তাঁকে আঠারো হাজার পাউণ্ডের সম্পত্তি দান করেছেন। এ ছাড়া তাঁর বৃদ্ধ পিতামহ মৃত্যুর সময় টেমথীকে যে দু'লক্ষ পাউণ্ডের সম্পত্তি দিয়ে গেছেন, তাতে শেলীর অংশ আছে আশি হাজার পাউণ্ড। শেলী কাল বিলম্ব না করে সাসেক্স গেলেন। কিন্তু তাঁকে বাড়িতে ঢুকতে দেওয়া হল না। মিষ্টার টেমথীও সাক্ষাৎ করলেন না পুত্রের সঙ্গে। এক উকিলের মাধ্যমে স্থির হল, আঠারো হাজার পাউণ্ডের সম্পত্তি শেলী মিষ্টার টেমথীকে বিক্রি করবেন এবং বাকি সম্পত্তি থেকে বার্ষিক এক হাজার পাউণ্ড করে পাবেন।

কবি নিশ্চিন্ত হলেন। আর অর্দ্ধাহারে থাকতে হবে না। পাওনাদাররা পথে-বিপথে অপমান করবে না। পরম নিশ্চিন্ততায় জীবন কাটাতে পারবেন।

লণ্ডনে আর শেলীর মন টিকল না। তিনি মেরী ও জেনকে সঙ্গে নিয়ে ইতালি চলে গেলেন। জেনকে অবশ্য কিছুদিন তার এক আত্মীয়ার বাড়িতে রাখা হয়েছিল। আবার সে এঁদের সঙ্গ নিল। প্যারীতে শেলীর আলাপ হল বায়রণের সঙ্গে। নারী লোলুপ বায়রণ ইংল্যাণ্ড থেকে এক রকম নির্বাসিত হয়ে এখানে এসেছিলেন। এখানে এসেও তাঁর স্বভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। ইতালিয়ান রূপসীদের নিয়ে ছিনিমিনি খেলে চলেছেন। বলা বাহুল্য, বায়রণের হাত থেকে জেন নিস্তার পেল না। সে গর্ভবতী হল।

পরে নিজের দায়িত্ব অস্বীকার করায় শেলীর সঙ্গে বায়রণের মনোমালিন্য হয়ে গেল। শেলী জেনিভা হয়ে ইংল্যাণ্ড ফিরলেন। লণ্ডনে না গিয়ে বার্থ শহরে বাড়ি ভাড়া নিলেন। দিন পনেরো মেরী ও শেলীর অত্যন্ত আনন্দে কাটল। ইতিমধ্যে তাঁদের একটি ছেলে হয়েছে। হঠাৎ এখানেই সংবাদ পেলেন হ্যারিয়েট বেঁচে নেই। সার্পেণ্টাইন নদীতে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেছে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার কথা, তবু শেলীর মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। পুরানো দিনের অনেক কথা মনে পড়ে যেতে লাগল বারংবার। মুহ্যমানের মত দিন দু'য়েক থাকার পর তিনি বাস্তবে ফিরে এলেন এবার মেরীকে বিয়ে করায় কোন বাধা রইল না। সেণ্টমিলড্রেড গির্জায় অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে বিবাহপর্ব সমাধা হল।

ইংল্যাণ্ডে মন তাঁর টিকল না। ইতালি তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডাকতে আরম্ভ

করল। এই ডাককে মৃত্যুর হাতছানি বলা যেতে পারে। কারণ ইংল্যাণ্ডে আর তিনি ফিরে আসতে পারেননি। সপরিবারে ইতালি যাত্রা করলেন। ভেনিসে সাক্ষাৎ হল বায়রণের সঙ্গে। পুরানো মনোমালিন্য মিটিয়ে নিলেন দু'জনে—আবার গাঢ় বন্ধুত্বের বাঁধনে বাঁধা পড়লেন। ভেনিসে চমৎকার ভাবে শেলীর দিন কাটতে লাগল। মেরীর প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে তিনি অবিরাম লিখে চললেন।

শেলী সুখী। মেরীও সুখী।

এই ভাবেই দিন কেটে যেতে পারত। কিন্তু কাটল না। ঈশ্বরের বিচার অন্য রকম ছিল। বিশেষ প্রয়োজনে শেলী নৌকায় জল অতিক্রম করছিলেন। শেষ আদেশ এসে উপস্থিত হল এই সময়। পাড়ে দাঁড়িয়ে মেরী মনের হাহাকার নিয়ে স্বামীকে জলে ডুবে যেতে দেখল। তরুণ কল্পনাবিলাসী, প্রেমিক কবি এইভাবে শোচনীয় মৃত্যুবরণ করলেন। অকালে তিনি চলে না গেলে ইংরাজী সাহিত্যকে তিনি আরও পুষ্ট করে দিয়ে যেতে পারতেন। কবি বায়রণ তাঁর অন্ত্যেষ্টিপর্ব সমাধা করেছিলেন।

হতভাগ্য প্রেমিক কিটস্

প্রাণ শক্তি ক্ষীণ হয়ে আসছে। হাত কাঁপছে। তবু কিটস্ চিঠি লিখতে বসলেন।

নেপলস থেকে কবি ব্রাউনকে লিখলেন, "শরীর সুস্থ থাকাকালীন যদি ফ্যানিকে পেতাম, আজ আমার অবস্থা এত শোচনীয় হত না। মৃত্যুকে সহ্য করতে পারি, কিন্তু পারি না সহ্য করতে ওর বিচ্ছেদ। হা ঈশ্বর! হা ঈশ্বর! বাক্সে রাখা ফ্যানির উপহারগুলি আমাকে প্রতিনিয়ত আঘাত করছে। ফ্যানি যে টুপিতে লাইনিং লাগিয়ে দিয়েছে তা পরলে মাথা পুড়িয়ে দেয়। ওর সম্পর্কে সমস্ত কল্পনা আমাকে সজাগ করে রেখেছে। ফ্যানিকে চোখের সামনে দেখতে পাই, তার গলা শুনতে পাই। পৃথিবীতে এমন কোন আকর্ষণীয় বস্তু নেই যা আমার কাছে ফ্যানির চেয়ে বড়। ওর অবস্থানের কাছাকাছি যদি আমাকে কবর দেওয়া সম্ভব হত! আমি ওর কাছ থেকে চিঠি পেতে ভয় পাই। চিঠি লিখতেও। ফ্যানির হাতের লেখা দেখলে আমি দারুণ আঘাত পাব। ওর নাম উচ্চারণ পর্যন্ত কারুর মুখ থেকে আমি সইতে পারব না। আমি কোথায় সান্ত্বনা পাব, ব্রাউন? শান্তি পাব কোথায়? আমার ভাল হবার আশা থাকলেও এই প্রেম আমাকে মেরে ফেলবে।

আমাকে ওর সংবাদ দিও। যদি ও ভাল থাকে, শান্তিতে থাকে তবে + চিহ্ন দিও শুধু, আমার কথা ভেবে চিরদিন ওর পক্ষ সমর্থন কর। আমি চাই, আমি চিঠি লিখতে না পারলেও, ও বুঝুক আমি ওকে ভুলিনি, আমার বুকে আগুন জ্বলছে। আমি অবাক হয়ে ভাবি, মানুষ এত দুঃখও সইতে পারে! আমার জন্ম হয়েছিল কি শুধু দুঃখ সয়ে যাবার জন্য? ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।"

এই মর্মস্পর্শী চিঠির লেখক হলেন ইংরাজী সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জন কিটস্। পাশ্চাত্যের কবি, ঔপন্যাসিক, প্রবন্ধকারদের জীবন সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলে দেখা যায়, অধিকাংশরাই একের পর এক নারীর ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছেন। কাউকে তাঁরা প্রেম করেছেন, আবার কারুর সঙ্গে করেছেন প্রেম-প্রেম খেলা। কিন্তু জন কিটস্ এঁদের সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। তিনি একাধিক নারীর সঙ্গ লাভ করেননি বা সঙ্গ লাভ করবার জন্য লালায়িত হননি। একজনের ভালবাসায় নিজের জীবন উৎসর্গ করে প্রেমের ইতিহাসেও অমর হয়ে আছেন।

ভাললাগা ও ভালবাসা এক নয়। একাধিক নারীকে যে কিটসের ভাল লাগেনি,

একথা বলে সত্যের অপলাপ করতে চাই না। তবে ভাল তিনি বেসেছিলেন ওই একটিকেই। সেই ফ্যানি ব্রন যে কিটসের যোগ্য প্রণয়পাত্রী ছিলেন না একথা গবেষকরা এক বাক্যে স্বীকার করেছেন।

"সোয়ান অ্যাণ্ড হুপ" কোম্পানির ঘোড়ার গাড়ির তখন বেশ নাম ডাক। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংল্যাণ্ডে দূর-দূরান্তে যাতায়াতের প্রধান সহায় ছিল ঘোড়ার গাড়ি। এমন কি দূর-দূরান্তরে যেতে গেলে বা সরকারি ডাক এ শহর থেকে ও শহরে নিয়ে যেতে গেলেও ঘোড়ার গাড়ি ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। "সোয়ান অ্যাণ্ড হুপ" কোম্পানির ব্যবস্থাপনা ছিল প্রথম শ্রেণীর। যাত্রীদের প্রতি ব্যবহার ছিল মধুর।

টমাস কিটস্ ছিলেন এই কোম্পানির তত্ত্বাবধায়ক।

বিরাট আস্তাবল। অসংখ্য ঘোড়া সেখানে বিশ্রাম নেয়। টমাস থাকেন আস্তাবলের উপরে। টমাস একদিক থেকে ভাগ্যবান ছিলেন। কোম্পানির কর্তার মেয়ে তার প্রেমে পড়ে গেল। প্রেমের বিচিত্র গতি। নইলে ধনীর দুলালী সামান্য ঘোড়ার তত্ত্বাবধায়কের প্রেমে পড়বে কেন?

প্রেম যখন গভীর পর্যায়ে এসে পৌঁছাল তখন জানাজানি হয়ে গেল ব্যাপারটা। ভালই হল, আর দ্বিধা রইল না। দু'জনে নিজেদের বিয়ের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেন। মেয়ের পরিবারস্থ সকলে প্রবল আপত্তি তুললেন। কিন্তু কোন ফল হল না। বিয়ে হয়ে গেল দু'জনের। টমাস স্ত্রীকে এনে তুললেন আস্তাবলের উপরকার নিজের সঙ্কীর্ণ আবাসস্থলে। সেখানে পূর্বে মুহূর্তের জন্য আসবার কথা কল্পনাও করেননি মিসেস কিটস্। সেই নোংরা পরিবেশে চমৎকার ভাবে নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্য পদার্পণ করলেন।

দু'টি প্রেমবিভোর নরনারীর জীবনযাত্রা আরম্ভ হল।

দিন গড়িয়ে চলল, তারপর মাস—বছরও অতিক্রান্ত হল ক্রমে। সেদিন অক্টোবর মাসের এক কুয়াশামলিন দিন। কনকনে ও ভেজাভেজা জল-হাওয়া। বিশ্বসাহিত্য-ইতিহাসের সেই স্মরণীয় সালটি হল, ১৭৯৫। আস্তাবলকে সচকিত করে একটি নবজাতক কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। জন্ম হল আগামী দিনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জন কিটসের।

ছোটবেলায় কিটসের কবি প্রতিভার কোন পরিচয় পাওয়া যায় নি।

লণ্ডন থেকে দশ মাইল দূরের একটি স্কুলে সাত বছর বয়সে তাঁর পড়াশুনা আরম্ভ হল। লেখাপড়ায় তিনি মোটেই ভাল ছিলেন না। বইএর পাতা উল্টানোর চেয়ে দুষ্টুমি করে বেড়াতে তাঁর বেশি ভাল লাগত। ছোটখাট ছুতোয় যার তার

সঙ্গে মারামারি আরম্ভ করে দিতেন। এমন কি তাঁর চেয়ে বহু বয়সে বড় এবং বহুগুণ বলবান স্কুল কর্মচারির সঙ্গেও কিটস্ মারামারি করেছেন।

তাঁর স্বাস্থ্য অবশ্য সমবয়সী কারুর চেয়েও ভাল ছিল না। একটু বেঁটে—যৌবনে তাঁর উচ্চতা ছিল মাত্র পাঁচ ফুট। নিজের উচ্চতার জন্য সমস্ত জীবন কিটসের মনের কোণে ক্ষোভ সঞ্চারিত ছিল। অবশ্য তাঁর মুখশ্রী ছিল আকর্ষণীয়। গ্রীক দেবতাদের মত অপূর্ব সুন্দর মুখের অধিকারী ছিলেন তিনি। মাথায় গুচ্ছ গুচ্ছ সোনালী চুল, বাদামী চোখ দুটিতে স্বপ্নের মাখামাখি।

১৮০৪ সালে কিটস্ পরিবার এক বিপর্যয়ের মুখোমুখি হল। ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে টমাস মারা গেলেন। জন পিতৃহীন হলেন মাত্র ন'বছর বয়সে। এই শোক মিলিয়ে যেতে না যেতেই তাঁর মা রলিংস নামে এক ভদ্রলোককে বিয়ে করলেন। কিন্তু এই বিয়ে সুখের হল না। প্রেমহীন বন্ধনের জেরও দু'জনে টানতে চাইলেন না। অল্প দিনের মধ্যেই বিবাহ বিচ্ছেদ হয়ে গেল। মিসেস কিটস্ ছেলেমেয়েদের নিয়ে পিতৃগৃহে এসে উঠলেন।

কিটস্ মাকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তাঁকে ঘিরে ছিল তাঁর অনেক পরিকল্পনা, তাঁর নিবিড় ছায়ায় তিনি তৃপ্ত। কিন্তু এই তৃপ্তি দীর্ঘস্থায়ী হল না। কিটসের তখন পনেরো বছর বয়স। তখনকার দিনের দুরারোগ্য টি.বি-তে মারা গেলেন মা। এই আঘাতে কিটস্ ভেঙ্গে পড়েছিলেন। দিদিমার আশ্রয়ে কোনরকমে দিন অতিবাহিত হতে লাগল। কিন্তু লেখাপড়া আর অগ্রসর হল না, ১৮১১ সালে তিনি স্কুল ত্যাগ করলেন।

অভিভাবকরা এবার তাঁকে পাঠালেন টমাস হ্যামণ্ড নামে একজন সার্জেনের কাছে। ইনি একজন বিখ্যাত ওযুধ প্রস্তুতকারকও। টমাসের কাছে কিটস্ রইলেন শিক্ষাধীন। কবিতা লেখার আগ্রহ তাঁকে এই সময় থেকে পেয়ে বসে। স্কুল জীবনে এই আগ্রহের জমি প্রস্তুত হয়েছিল। তাঁকে চরমভাবে উৎসাহিত করেছিলেন স্কুলের জনৈক তরুণ শিক্ষক চার্লস কাউডেন ক্লার্ক। উত্তর জীবনে ক্লার্ক কিটসের ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের একজন হয়ে পড়েন।

১৮১৫ সালে টমাস হ্যামণ্ডের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেট নিয়ে তিনি উচ্চতর শিক্ষার জন্য ভর্তি হলেন "গাইজ হাসপাতালে"। এখান থেকে পাশ করে বেরুলেন এক বছর পরে। এবং তাঁকে স্বাধীন ভাবে ওযুধ প্রস্তুত করার ব্যবসার অনুমতি দেওয়া হল। কিন্তু কিটস্ ব্যবসায় নামলেন না। তাঁর মনে প্রভূত পরিবর্তন এসেছে। তিনি চিন্তা করে দেখেছেন গত কয়েক বছর এই ভাবে নষ্ট না করলেই ভাল করতেন।

তখনকার অভিভাবক রিচার্ড অ্যাবেকে কিটস্ পরিষ্কার ভাবে জানিয়ে দিলেন,

ব্যবসা তাঁর দ্বারা হবে না। তিনি কবিতা লেখার উপর নির্ভরশীল থাকতে চান। এই সিদ্ধান্ত শুনে স্বাভাবিকভাবে মিষ্টার অ্যাবে অবাক হয়ে গেলেন এবং ছেলেমানুষী না করার জন্য পিড়াপিড়ি করতে লাগলেন। কিন্তু কিটস্‌কে নিজের সিদ্ধান্ত থেকে সরিয়ে আনা সম্ভব হল না। কবিতা লেখায় মনোনিবেশ করলেন তিনি।

"এগজামিনার" পত্রিকার সম্পাদক লী হাণ্টের জনপ্রিয়তা ছিল অপরিসীম। বিশেষ করে তরুণ সাহিত্যিক মহলে। তরুণ সাহিত্যিকদের জন্য তাঁর দরজা অষ্টপ্রহর খোলা থাকত। ক্লার্ক হাণ্টের বাড়িতে নিয়ে গেলেন কিটস্‌কে। সম্পাদক খুশি হলেন তরুণ লেখককে দেখে। প্রচুর উৎসাহ দিলেন। ফাঁকা উৎসাহ দিয়ে অনেকে নিরস্ত হন, কিন্তু হাণ্ট সে প্রকৃতির লোক ছিলেন না। কিটসের কবিতা ছাপলেন। এমনকি কবিতা প্রকাশিত হবার দিন কয়েক পরে "তরুণ কবি" নাম দিয়ে প্রবন্ধ লিখলেন। এই প্রবন্ধে অনেক কিছু লেখবার পর হাণ্ট ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন, আজকের শেলী, কিটস্ ও রেণল্ড একদিন বিশ্ববিখ্যাত কবি হবে। তাঁর এই প্রবন্ধ পড়ে সেদিন অনেকে হেসেছিল, কিন্তু হাণ্টের প্রমাণ যে মিথ্যা হবার নয় তার প্রমাণ শেলী ও কিটস্ দিয়ে গেছেন।

বয়সের বহু পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও হাণ্ট ও কিটসের মধ্যে অচিরেই গভীর বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। শেলীর সঙ্গে কিটসের আলাপ হয়েছিল হাণ্টের বাড়িতেই। ইতিমধ্যে তিনি অনেকগুলি কবিতা লিখে ফেলেছেন। সুতরাং বই প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। হাণ্টের চেষ্টাতেই প্রকাশক পাওয়া গেল এবং প্রকাশিত হল বই। কিটস্ এবং তাঁর বন্ধু-বান্ধবেরা আশা করেছিলেন এই কাব্যগ্রন্থ প্রচুর বিক্রি হবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তার বিপরীত দৃশ্যের অবতারণা হল।

মাস খানেক পরে প্রকাশকের কাছ থেকে যা জানা গেল, একজন কবির পক্ষে তার চেয়ে হতাশার বিষয় আর কিছু হতে পারে না। আক্ষেপের সঙ্গে প্রকাশক জানালেন, এই কবিতার বই প্রকাশ করে তিনি চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছেন। যে দু'চারখানা বিক্রি হয়েছিল তাও ফিরিয়ে দিয়ে যাচ্ছে ক্রেতারা। টাকা ফেরত নেবার সময় গালাগালির ছড়া কাটছে। কিটসের মনের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। তবে তিনি দমলেন না। এবার হাত দিলেন দীর্ঘকাব্য "এনডাইমিয়নে"।

যথাসময় প্রকাশিত হল "এনডাইমিয়ন"। এই কাব্য গ্রন্থটির উপর প্রচুর আস্থা ছিল কিটসের। তিনি নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে বসেছিলেন। এই গ্রন্থের অজস্র বিক্রয়লব্ধ অর্থ নিয়ে তিনি ইউরোপ ভ্রমণে যাবেন। আজকের কবিরা এই ধরনের কল্পনাকে মনে স্থান দিতে পারেন না। সে দিন দেওয়া যেত। তখন ডন জুয়ানের এক এক ক্যাণ্টের জন্য বায়রণ এক হাজার পাউণ্ড করে পেয়েছেন। "এনডাইমিয়ন"

অসাধারণ রচনা--তবু অর্থ বা ভাল সমালোচনা লাভ করল না। তার কারণ আবার লী হাণ্ট।

নিজের উদারনীতির দরুণ হ্যাণ্ট সুখ্যাত ও কুখ্যাত ছিলেন। রক্ষণশীল দল তাঁকে একেবারেই সুনজরে দেখতেন না। কিটস্‌কে হাণ্ট সমর্থন করতেন বলে তাঁর উপরও গিয়ে রাগ পড়ল। "এনডাইমিয়ন" প্রকাশিত হবার পর রক্ষণশীল দলের প্রখ্যাত দুই পত্রিকা "কোয়ার্টারলি রিভিউ" এবং "ব্ল্যাকউডস ম্যাগাজিনে" কুৎসিত সমালোচনা প্রকাশিত হল। এমনকি অভদ্র ভাষায় কবিকে ব্যক্তিগত ভাবে আক্রমণ করা হল। কিটস্ ব্যথিত হলেও এই সময় সমালোচনার উত্তরে কিছুই বলেন নি।

"এনডাইমিয়ন" একেবারেই বিক্রি হল না। প্রকাশকের কাছে পড়ে রইল কিছুদিন। তারপর তিনি ওজন দরে বিক্রি করে দিলেন। এই প্রকাশক তখন বুঝতে পারলে এই মূল্যবান সম্পদ হাতছাড়া করতেন না। পরবর্তীকালে "এনডাইমিয়নের" এক একটি প্রেজেণ্টেশন কপি দু'হাজার চারশো পাউণ্ড দিয়ে লোকে কিনেছে। তখন কিটস্ নেই। অকালেই তিনি ঝরে পড়েছেন। একেই বলে ভাগ্যের নির্মম পরিহাস।

এবার জন কিটসের ভাললাগার পাত্রীদের নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। ১৮১৮ সালে তাঁর ছোটভাই জর্জ বিয়ে করেন জর্জিয়ানাকে। ১৬ বছরের জর্জিয়ানা দেখতে অপূর্ব সুন্দরী ছিল না। তবে তার যৌবনে ছিল মাদকতা। অশোভন হলেও ছোট-ভাইয়ের স্ত্রীকে কিটসের ভাল লাগল। এই ভাললাগার পূর্বে আরেকজনকে তাঁর ভাল লেগেছিল, সে মেরী ফ্রিগলে। মেরী তাঁর বন্ধু রিচার্ড উডহাউসের বোন। সুন্দরী ও রুচিশীলা। কিটসের অনেকগুলি কবিতা তাঁকে উদ্দেশ্য করেই লেখা। জর্জিয়ানা তাঁকে মেরীর প্রভাব থেকে মুক্ত করলেও তাকে বেশিদিন কাছে পাননি। কারণ জর্জ স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে আমেরিকা যাত্রা করেছিল।

কিটস্ আগে দাম্পত্য জীবনের উপর বীতস্পৃহ ছিলেন। জর্জিয়ানার সঙ্গলাভ করবার পর বিয়ের উপকারিতা সম্বন্ধে তিনি সচেতন হলেন। এবং নিজের বিয়ের প্রয়োজনীয়তা বোধ করতে লাগলেন। জর্জিয়ানার পর ভাললাগার পাত্রী হিসেবে আরো দু'টি তরুণী কিটসের কাছাকাছি এসেছিলেন। এঁরা হলেন জেন কক্স ও মিসেস ইজাবেলা জোন্স। ইজাবেলার অনুরোধেই বোধহয় তিনি "ইভ অফ সেণ্ট অ্যাগনিস" লিখেছিলেন।

এরপর আসে ফ্যানি ব্রনের কথা।

এই একমাত্র তরুণী যাকে কিটস্ উন্মত্তের মত ভালবেসেছিলেন।

কিটসের মনের অবস্থা তখন অত্যন্ত শোচনীয়। সমালোচকদের খড়্গাঘাতে তিনি

দিশেহারা। ঘুরে ফিরেই সমালোচনাগুলি পড়েন। "ব্ল্যাকউড ম্যাগাজিন" রসিয়ে লিখেছে, ছোকরা কিটস্ ছিল ওষুধের দোকানের কর্মী। একদিন জোলাপের ওষুধ রুগীর বাড়ি পৌঁছে দেওয়ার সময় লোভে পড়ে খেয়ে ফেলে। এর পর থেকেই গুরুতর সমস্ত লক্ষণ দেখা দিল—কবিতা লেখা তার মধ্যে একটি।..."বাপুহে, ফিরে যাও ওষুধের দোকানের বড়ি, মলম ও প্লাস্টারের মধ্যে।"...

এই সমস্ত পড়ে কবিতা লেখা ছেড়ে দিতে চাইছেন কিটস্। তাছাড়া টমের জন্য তার নিদারুণ দুশ্চিন্তা। তাঁর ছোটভাই টমের টি. বি. হয়েছে। কিটস্ ভাইকে সেবা করেন। তবে একটা দুশ্চিন্তা তার মনে পাক খেতে থাকে—এই রোগ তাঁকে ধরবে। তিনিও হয়ত বেশিদিন নেই পৃথিবীতে।

১৮১৮ সালের ১লা ডিসেম্বর শীতের সকাল কিটসের জীবনের করুণতম দিন হিসেবে দেখা দিল। টম ছেড়ে চলে গেল তাঁকে। কিটসের মনের মধ্যে হাহাকার করে উঠল। বন্ধু ব্রাউন তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। তাঁকে একা থাকতে দিলেন না, নিয়ে এলেন নিজের বাড়িতে। মন হতাশায় ভরে গেছে কিটসের। আর কিছু ভাল লাগে না। কাউকে ভালবাসবার বা বিয়ে করবার যে চিন্তা মনের মধ্যে লালন করছিলেন তা ঝেড়ে ফেললেন। নিজের তেইশতম জন্মদিনে লিখলেন, "আমি কখনো বিয়ে করব না। উদ্দাম গতিতে বয়ে চলেছে বাতাস, সে আমার স্ত্রী। আর আকাশের তারার মালা আমার সন্তান।"

কিন্তু এমনই ঘটনা পরিবেশ যে, মাত্র কয়েকদিন পরে ফ্যানি ব্রনের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ। এবং এই সাক্ষাতের পরমুহূর্ত থেকেই তিনি এই মেয়েটির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। ফ্যানিও তার প্রতি আকৃষ্ট হল। কাহিনীকার ও কবিদের প্রতি মেয়েদের আকর্ষণ আবহমানের। তাছাড়া মিসেস ডিল্কের কাছে ফ্যানি শুনেছিল, কিটস্ একজন হৃদয়বান, প্রাণোচ্ছল তরুণ।

ফ্যানির বয়স আঠারো। দেখতে যে সে অপূর্ব সুন্দরী ছিল তা নয়, তবে আকর্ষণীয় শক্তি ছিল। নীল চোখ দুটি ছিল অপরূপ। একমাথা লালচে চুল তাকে আরো মনোরম করে তুলেছিল। সাজপোশাকে ও প্রসাধনে নিজেকে সাজিয়ে তুলতে ভালোবাসতো। এই সমস্তর পিছনে তার অনেকটা সময় প্রতিদিন ব্যয় হয়ে যেত।

কিটস্‌কে প্রথমে ফ্যানির রূপ আকর্ষণ করেনি। আকর্ষণ করেছিল তার অনুচ্চতা। সে তার চেয়ে লম্বা নয়। কিটস্ নিজের খর্বকায়ত্বে অত্যন্ত ক্ষুন্ন ছিলেন। সময় সময় বন্ধুবান্ধবদের কাছে আক্ষেপ করতেন, আমি যদি লম্বা হতাম। তার ধারণা ছিল, তিনি উচ্চতায় অল্প বলে অনেকেই তাঁকে অবজ্ঞা করে। ফ্যানিকে দেখে খুশি হলেন, এই মেয়েটি অন্ততঃ তাঁকে বেঁটে বলতে পারবে না। অন্যান্য

গুণাবলি ছাড়াও, আরো একটি বিষয়ে ফ্যানি কিটসের প্রতি আকর্ষণ বোধ করেছিল তা হল তাঁর গ্রীক ভাস্কর্যে অপরূপ অ্যাপোলোর মত মুখশ্রী।

টম তখন মারা গেছে। ক্ষয় রোগে ভুগছে। কিটস্ প্রাণ ঢেলে তার সেবা করছেন, ফ্যানি এ সমস্ত কথা শুনছে। সে আসে তাঁর কাছে। অর্থাভাবে ক্লিষ্ট ও ছোটভাইদের জন্য শোকাতুর কিটসের প্রতি তার মন মমতায় ভরে যায়। অল্পদিনের মধ্যেই এই মমতা রূপান্তরিত হল প্রেমে। মিসেস ব্রন সহানুভূতির সঙ্গে কিটস্‌কে গ্রহণ করেছিলেন। মা বাপ হারা দুস্থ ছেলেটিকে তিনি স্নেহ থেকে বঞ্চিত করবেন কি ভাবে? নিজেদের "এলম কটেজে" মাঝে মাঝে আমন্ত্রণ জানাতেন কবিকে।

১৮১৮ সালের ২৫শে ডিসেম্বর সে দিন।

কিটসের জীবনের স্মরণীয় দিন। ক্রীসমাস উপলক্ষ্যে মিসেস ব্রন তাঁকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। কিটস্ আজ একটি সঙ্কল্প নিয়ে রওয়ানা হলেন সেখানে। নিভৃতে সাক্ষাৎ হবার পরই নিজের সঙ্কল্প ব্যক্ত করলেন কিটস্। কবি আজ সাহসী হয়েছেন, নইলে বিয়ের প্রস্তাব করতে পারতেন না।

ফ্যানি সচকিত হল। লাজুক কিটসের কাছ থেকে এত তাড়াতাড়ি এই প্রস্তাব সে আশা করেনি। বেশ কিছুদিন সময় লাগবে বিয়ের প্রস্তাব মুখে আনতে এই তার ধারণা ছিল। কিটস্ দ্বিতীয়বার নিজের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলেন। এবার সলজ্জ হাসল ফ্যানি। তারপর রাজি হয়ে গেল প্রস্তাবে। কিটস্ হাসিমুখে বিদায় নিলেন। বহুদিন এত আনন্দকে তিনি হাতের মুঠোর মধ্যে পাননি। রাত্রে শুতে যাবার পূর্বে ফ্যানি নিজের ডায়রিতে লিখল, আজকের দিন আমার জীবনের স্মরণীয় দিন।

এই অনাড়ম্বর বাকদান পর্বের কথা প্রচারিত হল না। দু'জনের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ কয়েকজন মাত্র জানলেন। কিন্তু বাকদানটাই শেষ কথা নয়। আসল ব্যাপার হল বিয়েটা সেরে নেওয়া। এর জন্য মিসেস ব্রনের অনুমতির প্রয়োজন হবে। কারণ ফ্যানি এখনও সাবালিকা হয়নি। নিজেদের মধ্যে আলাপ-আলোচনার পর অনেক সংশয় নিয়ে ফ্যানি কথাটা পাড়ল মা'র কাছে। একটু চিন্তার পর মিসেস ব্রন অনুমতি দিলেন। তবে ওই সঙ্গে তিনি জানালেন বিয়ে এখন হবে না। কিটসের ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল অর্থাৎ অবস্থা সচ্ছল হলে তবে তিনি মেয়ের বিয়েকে পূর্ণভাবে সমর্থন করবেন।

কিটস্ নিরাশ হলেন।

তবে তাঁদের মেলামেশায় বাধা পড়ল না। ফ্যানির কাছাকাছিই থাকেন তিনি। দু'জনে বেড়াতে যান এখানে ওখানে বা নাচের আসরে। মাঝে মাঝে প্রেমিকাকে শোনান নিজের লেখা কবিতা আবৃত্তি করে। নিজের জীবনে কবিতা লেখার এই

ছিল তাঁর শ্রেষ্ঠ সময়। অজস্র কবিতা এই সময় তিনি লিখেছেন যার প্রতিটি লাইনে ফ্যানির উপস্থিতি বুঝতে পারা যায়। চিঠিপত্রের আদান-প্রদানও চলতে লাগল। যদিও দু'জনে পাশাপাশি থাকেন তবু চিঠি লেখার বিরাম নেই। ইংরাজী সাহিত্যের সম্পদ এই সমস্ত চিঠিতে কিটসের বিচিত্র মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

মাস ছ'য়েক পরে তাঁর গলার অসুখ দেখা দিল। আর্থিক অবস্থাও এই সময় হয়ে উঠল শোচনীয়। ওষুধের দোকানে চাকরি নেবার জন্য ব্যগ্র হলেন কিটস্। অর্থ আসার কোন পথ না থাকলে খাবেন কি? ব্রাউন আপত্তি করলেন।

—চাকরি নয়। তোমাকে আরও লিখতে হবে।

—কিন্তু—

—এই তোমার উন্নতির পথ।

আর কথা চলে না। অসুখে ভুগতে থাকেন—লেখেন কোন রকমে। মন কিন্তু হাহাকার করতে থাকে ফ্যানির জন্য। অসুস্থতার দরুণ ঘরেই বন্ধ আছেন। ফ্যানিকেও নিয়ে যেতে পারেন না বেড়াতে, নাচের আসরেও না। সেও আসে না আজকাল আগের মত নিয়মিত। এদিকে মিসেস ব্রন বাড়িতে অনেক তরুণকে আমন্ত্রণ করে আনছেন। ফ্যানিকে সঙ্গে নিয়ে সোসাইটিতে যাওয়া-আসা নিয়মিত হয়েছে। অস্বাভাবিক নয়, তিনি হয়ত আরো ভাল জামাইয়ের সন্ধান করছেন।

অসুস্থতার দরুণ তাঁর সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই কথা ভেবে কিটস্ শোচনীয় মানসিক অবস্থায় ছিলেন। এবার মিসেস ব্রনের কাণ্ড-কারখানায় ও ফ্যানির তাঁকে এড়িয়ে যাবার মনোভাব লক্ষ্য করে ঈর্ষায় পুড়তে লাগলেন। তাঁর ঘোরতর সন্দেহ হতে লাগল সে আর কাউকে ভালবেসে ফেলেছে। কাউকে ভালবাসুক আর না বাসুক, একথা অনস্বীকার্য যে ফ্যানির মত লঘুচিত্ত মেয়ে কিটসের ভালবাসার গভীরতা উপলব্ধি করতে পারেনি। নইলে অসুস্থ ভাবী স্বামীকে ফেলে সেজে-গুজে মিলিটারি অফিসারদের সঙ্গে পার্টি বা থিয়েটারে যেতে পারত না।

এক এক সময় কিটস্ ভেবেছেন, ফ্যানিকে মুক্তি দেবেন। জোর করে কি ভালবাসা আদায় করা যায়? আবার মন এই চিন্তার অনুকূলে মত দেয়নি। ফ্যানিকে ছেড়ে থাকবেন কি ভাবে? এই রকম মনের অবস্থাতেও কিটস্ তাঁর বিখ্যাত, "ওড টু এ নাইটেঙ্গল", "ওড অন এ গ্রীসীয়ান আর্ণ" লেখা শেষ করলেন। জুন মাসের শেষে তিনি "ওয়েন্ট ওয়ার্থ" প্লেস ত্যাগ করলেন। ফ্যানিকে বলে গেলেন, ভাগ্যের পরিবর্তন না হলে আর ফিরবেন না। এই অনিশ্চয়তার মধ্যে তাঁকে জড়িয়ে রাখাটা অন্যায়।

চিঠির আদান-প্রদান চলতে লাগল। ফ্যানির কাছ থেকে নিয়মিত চিঠি পাওয়ায় কিটস্ কিছুটা আশ্বস্ত হলেন। তাঁর ধারণা হয়ত অমূলক। ফ্যানি সত্যিই তাঁকে ভালবাসে, তিনি মিথ্যা সন্দেহ করেছিলেন। কিটস্ একটি চিঠিতে লিখলেন, আমি

দুটি বিষয় নিয়ে চিন্তা করছি। তোমার অপরূপ যৌবন আর আমার মৃত্যুর মুহূর্ত—এখন দু'টিকে যদি একই সঙ্গে পেতাম।

কয়েক মাস পরে কিটস্ আবার ফিরে এলেন। আর্থিক স্বচ্ছলতার কোন ব্যবস্থাই করতে পারেননি। উপরন্তু ঠাণ্ডা লাগিয়ে শরীরকে আরো শোচনীয় করে তুলেছেন।

তাঁর চেহারা দেখে ব্রাউন স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। উদ্বিগ্নভাবে প্রশ্ন করলেন, তোমার কি শরীর খারাপ? জ্বর হয়েছে?

কিটস্ পাশের ঘরে চলে গেলেন। প্রবল ভাবে কাশছেন তিনি। কাশি একটু কমলে উত্তেজিত গলায় বললেন, আলো নিয়ে এস। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠেছে। আমি রক্তটা দেখতে চাই।

ব্রাউন আলো নিয়ে ছুটে এলেন। নির্নিমেশ দৃষ্টিতে নিজের রক্ত দেখলেন কিটস্। আর সন্দেহ নেই ক্ষয় রোগ ধরেছে তাঁকে। এই রোগ হয়েছিল মায়ের। ছোটভাই টমের। বিছানার উপর এলিয়ে পড়লেন তিনি।

—এ রক্তের রঙ আমার চেনা। উত্তেজনা দমন করে তিনি বললেন, রক্ত এসেছে আর্টারি থেকে। আমার মৃত্যুর পরোয়ানা। আমাকে মরতেই হবে।

এরপর গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন কিটস্। ফ্যানি যাওয়া-আসা আরম্ভ করল তাঁর কাছে। কথা দিল, তিনি ভাল না হয়ে উঠা পর্যন্ত অপেক্ষা করবে। কিটস্ ফ্যানিকে ভালবেসেছিলেন উন্মাদের মত। তাই তাকে দেখলেই উত্তেজিত হয়ে পড়তেন। ব্রাউন কবির কাছে ফ্যানির আসা পছন্দ করলেন না। তাঁর ধারণা হল, এই উত্তেজনা শরীরকে আরও নষ্ট করে দেবে। অগত্যা কিটস্ লিখলেন ফ্যানিকে, যে সময় ব্রাউন থাকবে না সেই সময় তুমি আমার কাছে এস।

দিন গড়িয়ে চলল। অধিকাংশ সময়ই কিটস্ অসুস্থ থাকেন। মনের অবস্থাও ভাল নয়। ফ্যানির সম্পর্কে নানা চিন্তা তাঁর মনে আনাগোনা করতে থাকে। ১৮২০ সাল এসে গেল এই ভাবে। ফ্যানি সেবা-যত্ন করে তাঁকে। কবি শান্তি পান না। তাঁর মনে হয় এ সমস্তই লোক দেখান। ফ্যানি অন্য কোথাও বাঁধা পড়েছে। শুভ চিন্তা করা স্থির করলেন। ইংল্যাণ্ডের প্রচণ্ড শীতে কিটস্ সুস্থ হতে পারেন না। তাঁকে ইতালিতে পাঠান দরকার। সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে যাওয়া স্থির হল। সঙ্গে যাবেন কিটসের বাল্যবন্ধু শিল্পী সেভার্ণ। শিল্পীর পরিবারস্থ সকলে এটা অনুমোদন করেননি। কিন্তু সেভার্ণ তাঁদের আপত্তিকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না।

যাঁকে নিয়ে এত কাণ্ড সেই কিটসের কিন্তু যাওয়ার ইচ্ছে নেই। ফ্যানিকে ছেড়ে তিনি কিভাবে থাকবেন সেই চিন্তাই তাঁকে বিচলিত করে তুলেছে। সকলের অনুরোধে শেষ পর্যন্ত তাঁকে যাত্রা করতে হল। অক্টোবরের শেষে ইতালির বন্দরে পৌঁছালেন দু'জনে। বিদায় নেবার সময় তিনি ফ্যানিকে দিয়েছেন কয়েকটি বই, প্রয়োজনীয়

কিছু জিনিষপত্র ও নিজের একখানা ছবি। ফ্যানি তাঁকে দিয়েছিল, একটি পকেট বই, কাগজকাটা ছুরি, আলোর কিছু জিনিষ ও একটি ডিমের মত দেখতে সাদা ধপধপে কোর্ণেলিয়ান। সমস্ত বিপদ-আপদ থেকে কোর্ণেলিয়ান তাঁকে রক্ষা করবে এই ছিল তার বিশ্বাস। এ ছাড়া কিটস্ একগোছা ফ্যানির চুল কেটে নিয়েছিলেন।

নেপলস থেকে ব্রাউনকে কিটস্ লিখলেন, "মৃত্যুর চিন্তা আমার কাছে অসহ্য নয়। তবে ওকে ছেড়ে যাওয়ার চিন্তা আমার কাছে বেদনাদায়ক।.....ওকে চিঠি লিখতে ভয় হয়। ওর কাছ থেকে চিঠি পেতে ভয় হয়, ওর হাতের লেখা দেখলেও হয়ত আমি ভেঙ্গে পড়ব।....আমার বুকের মধ্যে আগুন জ্বলছে। আমি অবাক হচ্ছি ভেবে মানুষ কত দুঃখ সহ্য করতে পারে। আমি কি এইভাবে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার জন্য এসেছিলাম।......"

রোমে এসে ঘর ভাড়া নিলেন দু'জনে। চিকিৎসা করতে এলেন ডাক্তার ক্লার্ক। রোগীকে পরীক্ষা করে তিনি মত প্রকাশ করলেন, ক্ষয় রোগ নয়। পাকস্থলী থেকে এই রোগের উৎপত্তি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কিটসের ক্ষয় রোগই হয়েছিল। চিকিৎসা বিভ্রাট হল। তিনি দ্রুত এগিয়ে যেতে লাগলেন মৃত্যুর দিকে।

এই সময় চিঠি এল ফ্যানির। খামের উপরকার হাতের লেখা চিনতে পেরে অসম্ভব উত্তেজিত হয়ে উঠলেন কিটস্। এই উত্তেজনা কমতে সাতদিন সময় লেগেছিল। তারপর করুণ কণ্ঠে সেভার্ণকে বললেন, এ চিঠি আমার পক্ষে পড়া সম্ভব নয়। আমার কবরে চিঠিখানা দিয়ে দিও।

খাম থেকে চিঠিখানা আর বার করা হল না। কিটসের মৃত্যুর পর মুখবন্ধ এই খাম মৃতদেহের সঙ্গে কবরস্থ করা হয়েছিল। ফ্যানি এই চিঠিতে কবিকে কি লিখেছিল, সহস্র গবেষণার পরও আজ আর তা বোঝবার উপায় নেই। ৩০শে নভেম্বর কিটসের কাছ থেকে চিঠি পেলেন ব্রাউন। তাঁর যে প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু হয়েছে এই কথাই লিখেছিলেন তিনি। এরপরের দশটা সপ্তাহ কিটস্ মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়েই কাটালেন।

শেষে এল ২৩শে ফেব্রুয়ারির সেই বিকেল। ১৮২১ সাল।

কিটস্ কোনরকমে বললেন, সেভার্ণ, আমাকে তুলে ধর, আমি মারা যাচ্ছি—ভয় পেয় না। ভগবানকে ধন্যবাদ! এতদিনে মৃত্যু এল।

সেভার্ণ তুলে ধরলেন কিটস্‌কে। মৃত্যু ঘনিয়ে এসেছে বুঝতে পারা যাচ্ছে। তবু সাত ঘণ্টা সংগ্রাম করলেন কবি। রাত এগারটার সময় সব শেষ হয়ে গেল।

মাত্র ছাব্বিশ বছরের হতভাগ্য প্রেমিক, কবি জন কিটস্ সেভার্ণের কোলেই ঢলে পড়লেন কাল ঘুমে।

প্রেমের পিয়াসী বালজাক

অনরেদের বাড়ির পাশেই থাকেন মাদাম দ্য বার্ণি। নয়টি সন্তানের জননী মাদাম মর্যাদা সম্পন্ন বংশের বধূ। প্যারিসে উঁচু মহলে তাঁদের খ্যাতি অপরিসীম। তাঁর বয়স বর্তমানে পঁয়তাল্লিশ বছর। তরুণ অনরে তাঁদের বাড়ি যাওয়া-আসা করেন। মাদাম তাঁকে স্নেহ করেন।

অনরের মা খুশি হলেন। ধনী প্রতিবেশির বাড়িতে সেজেগুজে তাঁর নিয়মিত যাওয়ার প্রকৃত অর্থ তিনি ধরতে পারলেন। মাদাম দ্য বর্ণির জ্যেষ্ঠা কন্যার প্রেমে পড়ে গেছে অনরে। মেয়েটিকে যদি সে বিয়ে করতে পারে তবে তাঁদের সামাজিক অবস্থার উন্নতি হবে। কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই তিনি সবিস্ময়ে জানতে পারলেন, তিনি ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে রয়েছেন। মাদামের জ্যেষ্ঠা কন্যা নয়, বয়সে প্রায় দ্বিগুণ মাদামের প্রেমেই তাঁর ছেলে হাবুডুবু খাচ্ছে।

মাদাম দ্য বার্ণিও প্রথমে বুঝতে পারেননি। এরকম অবিশ্বাস্য ব্যাপার ঘটতে পারে অনুমান করাটাও কষ্টকর। একদিন সমস্ত বুঝতে পেরে হতবাক হয়ে গেলেন। যাকে ছেলের মত স্নেহ করেন, কোন দৃষ্টিকোণ দিয়েই যে তাঁর প্রেমাস্পদ হতে পারে না, সেই অনরে তাঁর প্রেমে পড়েছে। পৃথিবীতে এর চেয়ে বিস্ময়কর ব্যাপার বোধহয় আর ঘটতে পারে না।

সেদিন অনরে আসতেই মাদাম দ্রুত গলায় বললেন, এ হতে পারে না—এ হবার নয়—অনরে বুঝতে পারল গতকাল সন্ধ্যায় তার ব্যবহার সমস্ত কিছুকে পরিষ্কার করে দিয়েছে। এখন উগ্রভাবে প্রকট হওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মাদামের মধ্যে সে খুঁজে পেয়েছে মায়ের স্নেহ আর প্রিয়ার প্রেম। বয়সের পার্থক্য ও সামাজিক কড়াকড়ি, এদু'টোই দু'জনের মধ্যে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে না।

—নয় কেন? আপনি বাস্তবকে উপেক্ষা করবেন না।

—কিন্তু—

কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজেকে দৃঢ় রাখতে পারেননি মাদাম দ্য বার্ণি। অনরের অনুনয় ও আন্তরিকতা স্থির থাকতে দিল না তাঁকে। শেষে তার আদিম আকর্ষণে সম্পূর্ণ জড়িয়ে পড়লেন ন'টি সন্তানের জননী বার্ণি। এমন অবস্থা দাঁড়াল যে তরুণ প্রেমিককে তিনি ক্ষণে ক্ষণে চক্ষে হারাতে লাগলেন। এই অবৈধ প্রণয়লীলা চলল

কিছুকাল, তারপর অনরে যেন ক্লান্ত হয়েই সরে এল তাঁর কাছ থেকে। অবশ্য জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মাদাম দ্য বার্ণি অনরের শুভচিন্তক ছিলেন।

বালজাকের এই হল উল্লেখযোগ্য প্রেম। এবং অবৈধ প্রেমের হাতে খড়ি। প্রতিভার হিমালয় নিয়ে অনরে দ্য বালজাক ফরাসি সাহিত্যে উদয় হয়েছিলেন। তাঁর মত বিরাট সৃজনী প্রতিভা বিশ্ব সাহিত্যের প্রশস্ত ক্ষেত্রেও বিরল। তাঁর "লা কমেদি য়্যুমান" এর কথা চিন্তা করলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। "লা কমেদি য়্যুমান" হল একই সূত্রে গাঁথা শ' খানেক উপন্যাসের গুচ্ছ। এই উপন্যাস মালায় আড়াই হাজার চরিত্রকে তিনি নিপুণ হাতে এঁকেছেন। এ ছাড়াও আরো বহু উপন্যাস তিনি লিখে রেখে গেছেন।

"সেণ্ট অনরের" উৎসবময় দিনে, ১৭৯৯ সালের ১৬ই মে ফ্রান্সের তুর শহরে তাঁর জন্ম হয়। অনরের তিথিতে জন্ম বলে বালজাকের নাম রাখা হয় অনরে। ছাত্র হিসেবে তিনি বিশেষ সুবিধার ছিলেন না। কোনরকমে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে যেতেন।

তুর্গিনিভের মা ভার্ভরা চেয়েছিলেন তাঁর ছেলে একজন পদস্থ কর্মচারি হবে। কিন্তু তুর্গিনিভ মা'র ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে লেখক হয়েছিলেন। বালজাককেও এই রকম এক প্রতিকূল পারিবারিক পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হল। অভিভাবকরা চাইলেন তিনি আইনের পাঠ শেষ করে আইন ব্যবসা করুন। দিনের পর দিন মিথ্যার জ্বাল বুনতে মন চাইল না তাঁর। তিনি অন্য কিছু হতে চান। শেষ পর্যন্ত নিজের মনের কথা বললেন—তিনি লেখক হবেন।

তাঁর সঙ্কল্প শুনে বাড়ির লোকে স্তম্ভিত। লেখক হতে চাইলেই লেখক হওয়া যায় নাকি? লেখক হতে গেলে যে প্রতিভার প্রয়োজন তা কোথায় অনরের মধ্যে? তা ছাড়া লেখক হওয়াটা কোন চাকরিতে যোগ দেওয়া নয়, প্রচুর নাম হলে তবে স্বচ্ছলতার মুখ দেখা যায়, নইলে—? অনেক বলেকয়েও অটল বালজাককে নিরস্ত করা গেল না। অগত্যা বাবা একটা প্রস্তাব দিলেন। তিনি মাসোহারা সমেত ছেলেকে দু'বছর সময় দিলেন। এই সময়ের মধ্যে বালজাককে লেখক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করতে হবে। না পারলে আইন পড়তে যেতে হবে কলেজে।

বালজাক রাজি হলেন। এবং সময় নষ্ট না করে রওয়ানা হয়ে গেলেন প্যারিসে। ওখানে নিচু তলার পল্লীর এক বাড়ির ঘুপসি চিলে কোঠায় আশ্রয় নিলেন। বিশ্বের কোন বিখ্যাত লেখক লেখা আরম্ভ করার পূর্ব মুহূর্তে এরকম কদর্য ঘরে বসবাস করেননি। প্রথমে নাটকে হাত দিলেন। লেখা শেষ হল একদিন। পড়ে শোনালেন পরিচিতদের, কেউ ভদ্রতার খাতিরেও প্রশংসাসূচক কিছু বললেন না। একজন

প্রখ্যাত অধ্যাপক মত প্রকাশ করলেন, এই পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে দেওয়া উচিত। তবে চেষ্টা করলে পরে ভাল লিখতে পারবেন।

বালজাক নিরাশ হলেন কিন্তু উদ্যম হারালেন না। সৌভাগ্যক্রমে এই সময় এক প্রকাশকের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। তিনি নতুন লেখকদের রোমাণ্টিক উপন্যাস ছেপে থাকেন। এখান থেকেই তাঁর প্রথম উপন্যাস বেরুল। অবশ্য ছদ্মনামে লিখলেন—টাকাও পেলেন। এরপর ছদ্মনামে একের পর এক উপন্যাস লিখে চললেন বালজাক। এগুলিতে তিনি বোমান্সের চূড়ান্ত করেছেন। নিজের নামে প্রথম বই প্রকাশিত হয় ১৮৩১ সালে। নিজের নামেরও কিছু পরিবর্তন করলেন। অনরে বালজাক থেকে হলেন অনরে দ্য বালজাক। আভিজাত্যের কাঙ্গাল ছিলেন তিনি। যে কোন প্রকারে নিজেকে সম্ভ্রান্ত প্রতিপন্ন করবার আপ্রাণ চেষ্টা সমস্ত জীবন ধরে করে গেছেন। নামের মাঝে 'দ্য' জুড়ে দিয়ে তিনি যে উঁচু বংশ থেকে উদ্ভুত এই কথাই সকলকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। বলতে গেলে ওই ১৮৩১ থেকেই তাঁর জয়যাত্রা আরম্ভ হয়।

মাদাম দ্য বার্ণির সঙ্গে বালজাকের অবৈধ প্রণয়লীলা সমাজের চোখে যতই হেয় প্রতিপন্ন হোক না কেন, তাঁর জীবনে এসেছিল আশীর্বাদস্বরূপ। মাদামকে জয় করতে না পারলে, তাঁর ভালবাসা না পেলে সাহিত্যে বালজাকের কোনোদিন প্রতিষ্ঠা হত কিনা সন্দেহ। মাদামকে জয় করে তিনি দুরন্ত আত্মবিশ্বাস লাভ করেছিলেন। এই আত্মবিশ্বাসই সাহিত্যে তাঁকে প্রেরণা জুগিয়েছিল।

আরেক বিষয়ে তাঁর মন বিচিত্র রূপে প্রকট হয়েছিল। মাদাম দ্য বার্ণির মত বর্ষীয়ান মহিলাকে প্রথম ভালবেসেছিলেন বলেই বোধহয় অল্প বয়স্কা মেয়েদের প্রতি তাঁর আগ্রহ বিশেষ ছিল না। বালজাক পরবর্তী জীবনে বলেছেন, "নারীর শেষ ভালবাসা যদি পুরুষের প্রথম ভালবাসাকে জাগাতে পারে, তার চেয়ে মধুর আর কিছু নেই।" তিনি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতেন পঁয়ত্রিশ বছরের আগে কোন নারী কখনই পূর্ণতা লাভ করতে পারে না।

বালজাক দেখতে ভাল ছিলেন না। বিরাট বদখট চেহারা। তারপর ছিল চরিত্রে নিদারুণ শৈথিল্য। নিজের উচ্ছৃঙ্খল স্বভাবের জন্য তিনি নিজেই মাঝে মাঝে বিপদে পড়ে যেতেন। তবু প্যারিসে তাঁর বান্ধবীর সংখ্যা অল্প ছিল না। তবে এই সমস্ত তরুণী তাঁর রচনা পড়ে মুগ্ধ হত। তাঁকে বন্ধু হিসেবে পাবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠত। কিন্তু বালজাকের কুৎসিত চেহারার জন্য তাঁকে হৃদয়ে স্থান দিত না।

বালজাক সমস্ত বুঝতেন। কিন্তু নিজের বিশ্রী চেহারাকে পাল্টাবেন কি ভাবে? তবু তাঁর মেয়েদের প্রতি অসীম মমতা ছিল। যে তাঁকে নিষ্ঠুরভাবে ফিরিয়ে দিয়েছে তাকেও তিনি বিপদের সময় সাধ্যমত সাহায্য করেছেন। একবার তো বেশ বেকায়দায়

পড়ে গেলেন। অভিজাত বংশীয়া এক বিবাহিতা মহিলা পাওনাদারের অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলেন। উপযাচক হয়ে তাঁকে পাওনাদারের হাত থেকে রক্ষা করলেন বালজাক। এমন কি মহিলাটিকে নিজের বাড়িতে স্থান দিতে হল। সেদিন তাঁর উদারতা কেউ দেখেনি। প্রচুর অপবাদ মাথায় নিতে হয়েছিল বালজাককে।

মাদাম দ্য বার্ণির পর যে উল্লেখযোগ্য নারী বালজাকের জীবনে এলেন, তিনি হলেন মার্কু ইস দ্য কাস্ত্রিয়। বালজাকের বয়স তখন বেশি নয়, তবে তিনি তখন সুখ্যাত। বহু ধনীর গৃহে যাতায়াত করেন। যে সমস্ত অভিজাত মহিলার সঙ্গে সেই সময় তাঁর আলাপ-পরিচয় হয়েছিল কাস্ত্রিয় তাঁদের মধ্যে অন্যতমা। বাড়িতে কিন্তু লেখকের যাতায়াত ছিল না। আলাপ হয় অন্যসূত্রে।

কাস্ত্রিয় সুন্দরী মহিলা ছিলেন। বই সময় কাটাবার উপযুক্ত মাধ্যম একথা তিনি জানতেন। পড়তেনও প্রচুর। বালজাকের সাহিত্যের সঙ্গে এইভাবে পরিচিতা হয়ে পড়লেন এবং লেখকের সঙ্গে আলাপ করবার জন্য ঔৎসুক্য বোধ করতে লাগলেন। শেষে রচনার প্রচুর সুখ্যাতি করে চিঠি দিলেন লেখককে। উত্তর দিলেন বালজাক।

আবার চিঠি এল আবার তার উত্তর গেল।

তারপর দু'জনের দেখা হল।

প্রথম দর্শনেই কাস্ত্রিয়র প্রেমে পড়ে গেলেন বালজাক। নিয়মিত যাওয়া-আসা আরম্ভ করলেন তাঁর বাড়ি। কাস্ত্রিয় তাঁর মনের ভাব যে বুঝতে না পেরেছিলেন তা নয়। কিন্তু নবাগত প্রেমিককে বিন্দু-মাত্র প্রশ্রয় দিলেন না।

মাদাম দ্য কাস্ত্রিয়র মত সুন্দরী, অভিজাত মহিলা সুখ্যাত হলেও চাষাড়ে চেহারার বালজাককে ভালবাসতে পারেননি। তিনি শুধু চেয়েছিলেন, এই বিখ্যাত তরুণ লেখক তাঁর আজ্ঞাবহ হয়ে থাকবে, আর কিছু নয়। বালজাক বোধহয় মাদামের মনের ভাব বুঝতে পারেননি। দিন দিন প্রেম এত দুর্নিবার হয়ে উঠছিল যে পিছিয়ে পড়বার উপায় ছিল না। তাছাড়া তাঁর ধারণা ছিল, বোধহয় মাদাম দ্য বার্ণির মত এঁকেও শেষ পর্যন্ত নিশ্চিতভাবে স্বমতে আনতে পারবেন।

কিন্তু প্রকৃত ঘটনা অন্যরকম ঘটল।

বালজাক চরম অপমানিত হলেন মাদাম দ্য কাস্ত্রিয়র কাছে।

ঘটনাটা প্যারিসে ঘটেনি। বিয়োগান্ত নাটকের শেষ দৃশ্য অভিনীত হল জেনিভায়। মাদাম বায়ু পরিবর্তন করতে ওখানে গিয়ে ছিলেন কাকার বাড়িতে। বালজাক যাচ্ছিলেন ইতালি। মাঝপথে যাত্রা স্থগিত রেখে জেনিভায় এলেন। মাদামকে একা পাওয়া যাবে। প্যারিসের ভিড়ে বলতে পারেননি, এখানকার নিজনতায় নিজেকে উন্মুক্ত করবেন বালজাক। তাঁকে দেখে মাদাম অন্তর থেকে খুশি হলেন কিনা বুঝতে পারা গেল না।

তবে আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হল না।

সেদিন বেড়াতে বেরিয়েছেন দু'জনে। এই রকম সুযোগের অপেক্ষায় বালজাক ছিলেন। বললেন নিজের মনের কথা। হৃদয়গ্রাহী ভাষায় জানালেন তিনি মাদামকে কত ভালবাসেন।

পুরুষের কথায় মৃদু প্রতিবাদ করলেন নারী।

এই প্রতিবাদকে গ্রাহ্য করলেন না বালজাক। বারংবার অনুনয় জানাতে লাগলেন। তিনি যেন মরিয়া হয়ে উঠেছেন। কাস্ত্রিয় সৌজন্য বোধকে আর প্রশ্রয় দিলেন না। অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছিলেন। রূঢ়ভাবে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। এবং জানিয়ে দিলেন লেখকের সঙ্গে আর সম্পর্ক রাখতে চান না। নিদারুণ মর্মাহত হলেন বালজাক। ইতালি ভ্রমণ বাতিল করে দিয়ে মাদারের কাছ থেকে চিরবিদায় নিয়ে জেনিভা থেকে প্যারিসে ফিরে এলেন।

এই ব্যাপারে এত আঘাতপ্রাপ্ত হয়েছিলেন যে কিছুদিন সামাজিক মেলামেশায় উৎসাহহীন হয়ে পড়লেন। তখন তাঁর একমাত্র কাজ হল একাগ্র মনে লিখে যাওয়া। প্যারিসের অধিকাংশ মানুষ যখন ঘুমিয়ে পড়েছে, বিলাস বহুল নগরী অমাবস্যার অন্ধকারে ডুবে রয়েছে বা জ্যোৎস্নাস্নাত হয়ে হাসছে, তখন লিখতে বসতেন বালজাক। সমস্ত রাত্রি ধরে লিখতেন। তখন তিনি অন্য মানুষ। ক্লান্তি অপনোদনের জন্য মাঝে মাঝে কড়া কড়া কফি খাচ্ছেন আর লিখে চলেছেন।

সকাল আটটার পর আর লেখেন না। কিন্তু তখনও বিশ্রাম নেই। অজস্র প্রুফ এসে পড়েছে প্রকাশকদের কাছ থেকে। সেগুলি খুঁটিয়ে সংশোধন করবেন। তাড়াতাড়া চিঠিপত্র আসে। সেগুলি পড়বেন, প্রয়োজন মত উত্তর লিখবেন। তারপর বিশ্রাম। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে মাত্র কয়েক ঘণ্টা ঘুমান বালজাক।

তখনকার দিনে বালজাকের মত সৌভাগ্যশালী লেখক ফ্রান্সে আর দ্বিতীয়জন ছিলেন না। তাঁর বই ভাল বিক্রি হওয়ার দরুণ প্রকাশকরা লেখা ছাপাবার জন্য পাগল হয়ে থাকতেন। অপর্যাপ্ত অর্থ তাঁকে অগ্রিম দিয়ে যেতেন। বালজাক নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই প্রকাশককে লেখা দিতেন। তাঁর সময়নিষ্ঠা ছিল অপূর্ব। লিখে এত টাকা সেকালে আর কেউ উপার্জন করতে পারেননি। তবু প্রায় এক লক্ষ ফ্রাঙ্ক ঋণ সব সময়ই তাঁর উপর ছিল। তার কারণ অনেকগুলি। তিনি ছিলেন অত্যন্ত বেহিসাবী। কালকের কথা না ভেবে আজই জলের মত অর্থ ব্যয় করতেন মেয়েদের নিয়ে আমোদ করবার জন্য। পরের চোখে চমক লাগাবার জন্য, নিজেকে ধনী প্রতিপন্ন করবার জন্য তিনি জলের মত অর্থ নষ্ট করতেন। প্রয়োজন নেই তবু দামী জিনিস কিনে বাড়ি ভরিয়ে আনন্দ পেতেন। পরিমিত জীবন কি ভাবে অতিবাহিত করতে হয়, সঞ্চয়ের উপকারিতা কি তা নিয়ে একেবারেই জানতেন না।

যাহোক, আবার ফিরে আসা যাক তাঁর প্রেম-জীবনে।

হানসকা বংশের পুরুষরাই হলেন ইউক্রেনের প্রতিপত্তিশালী জমিদার। বর্তমান বৃদ্ধ জমিদার মর্সিয়া হানসকার তরুণী সুন্দরী স্ত্রী ইভলিন বিদুষী মহিলা। তিনি বালজাকের একটি উপন্যাস পড়া শেষ করে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন। তাঁর মনে হতে লাগল লেখক নায়িকার প্রতি সুবিচার করেননি। বালজাকের মত খ্যাতিমান লেখকের এটা উচিত কাজ হয়নি বলেই মনে হল পাঠিকার।

তিনি এসম্পর্কে আলোচনা করলেন বান্ধবীদের সঙ্গে। আলোচনায় স্থির হল লেখককে এ বিষয়ে চিঠি লেখা হবে। মাদাম হানসকা লিখলেন চিঠি। ১৮৩২ সালের ২৮ শে ফেব্রুয়ারি বালজাকের জীবনের একটি স্মরণীয় দিন। ওই দিন স্নিগ্ধ গন্ধে ভরপুর চিঠিখানি তিনি পেলেন। চিঠি পড়েই মন তাঁর স্বপ্নলোকে চলে গেল। তিনি বারংবার ভাবতে লাগলেন, চিঠির ভাষা যার এত সুন্দর সে নিশ্চয় সুন্দরী, নিশ্চয়ই তরুণী, কিংবা—

চিঠির আদান-প্রদান করে যে সমস্ত কিছু জেনে নেবেন তার উপায় নেই। লেখিকা নিজের ঠিকানা দেননি। নাম পর্যন্ত নয়। চিঠি শেষ করে নামের জায়গায় লিখেছেন শুধু অপরিচিতা। বালজাক ক্রমে বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এধরনের রসিকতা করবার অর্থ কি? নায়িকার প্রতি সুবিচার কেন করা হয়নি, এই প্রশ্নের উত্তর লেখক কিভাবে দেবেন ঠিকানা জানা না থাকলে?

বলতে গেলে কয়েকদিন অস্বস্তির মধ্যে কাটল। তারপর সৌভাগ্যক্রমে অপরিচিতা পত্র লেখিকাই পরিস্থিতি সরল করে দিলেন। তিনি আবার চিঠি লিখলেন। চিঠিতে একটি দৈনিক পত্রিকার নামে উল্লেখ করে লিখলেন, ওই কাগজে বিজ্ঞাপন দিয়ে প্রাপ্তি স্বীকার করুন। মাদাম হানসকার-এর একটা খেলা বলা যেতে পারে।

প্রখ্যাত ধনী মর্সিয়া হানসকা বৃদ্ধ ও ভগ্নস্বাস্থ্যের অধিকারী। রোগের আতঙ্ক নিয়েই তাঁর দিন অতিবাহিত হয়। বিয়ের পর একটি মেয়ের বাপ হওয়া ছাড়া স্ত্রীর কাছ থেকে প্রকৃতপক্ষে আর কিছুই তিনি লাভ করেননি। মাদামকে বিশেষ দোষ দেওয়া চলে না। অপটু স্বামীর কাছে থেকে উত্তর জীবনে তিনিই বা কি পেয়েছেন? সুতরাং স্বামীকে পুরানো দামী আসবাব ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারেন না ইভলিন।

মেয়েটির জন্য তাঁর কোন ঝক্কিঝামেলা নেই। সে থাকে তার গভর্নসের কাছে। সময় কাটাবার জন্য ইভলিন শুধু বই পড়েন। তিন চারটি ভাষার উপর তাঁর দখল আছে। কাজেই ফরাসি ভাষায় লেখা বালজাকের বই পড়তে তাঁর কোন অসুবিধা হয় না। তাঁর কাছ থেকে এই বিচিত্র চিঠি পেয়ে উল্লসিত হয়ে উঠলেন বালজাক। বিজ্ঞাপন দিলেন দৈনিকে। সঙ্গে সঙ্গে উত্তর এল এবং তার সঙ্গে নাম-ঠিকানা।

এরপর নিয়মিত চিঠি-পত্র আদান-প্রদান চলতে লাগল। দু'জনেই নেশায় পড়ে

গেলেন। অবশ্য এই পত্র বিনিময় সকলের অগোচরেই ঘটেছিল। দেখা সাক্ষাৎ না হলেও, ক্রমে মন দেওয়া-নেওয়ার পালা শেষ হল চিঠির মাধ্যমেই। দেখা হল ১৮৩৩ সালে। অর্থাৎ এক বছর পরে। এক বছর ধরে ইভলিনকে লেখা বালজাকের এই চিঠিগুলি ফরাসি সাহিত্যের মূল্যবান সম্পদ হয়ে রয়েছে।

সপরিবারে ইভলিন সুইজারল্যাণ্ডে বেড়াতে এলেন। বালজাককে সংবাদ পাঠালেন জেনিভায় এসে দেখা করতে। এই দিনটির জন্যই যেন তিনি অপেক্ষা করছিলেন। সমস্ত কাজ ফেলে ছুটে এলেন জেনিভায়। মুখোমুখি হলেন দু'জনে। বলাবাহুল্য বালজাককে দেখে হতাশ হলেন ইভলিন। এতদিন যে পুরুষকে তিনি কল্পনা করে এসেছেন তার সেই সুন্দর চেহারার পরিবর্তে একি অদ্ভুত মূর্তি। এই কদাকার লোকটি এমন সুন্দর লিখতে পারে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেননি। মনমরা হয়ে পড়লেন।

বালজাকের মনে কিন্তু তার বিপরীত প্রতিক্রিয়া । ইভলিন সুন্দরী তা তিনি জানতেন। তবে এত সুন্দরী ভাবতে পারেননি। বয়স ত্রিশ অতিক্রম করেছে। মধ্য যৌবনা নারীই তো তাঁর কাম্য। বালজাক আত্মহারা হয়ে উঠলেন। কিন্তু বুঝে নিতে বিলম্ব হল না, ইভলিনের উষ্ণতার অভাব রয়েছে। তিনি তাঁকে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করতে পারছেন না। বালজাক তাঁর চেহারা সম্পর্কে সচেতন। তিনি জানতেন, এই রকম পরিস্থিতির উদ্ভব নিশ্চিতভাবে হবে।

বালজাক দমে গেলেন না। ইভলিনের মন ফেরাবার জন্য অনুনয় বিনয় আরম্ভ করলেন। এক মাস ধরে চলল এই অবস্থা। শেষ পর্যন্ত বালজাক জয়লাভ করলেন। ইভলিনের নারী চরিত্র বিচলিত হয়ে পড়ল। কতদিন মনকে কঠিন শাসনে রাখবেন? বালজাক নিজের কুৎসিত চেহারার জন্য দায়ী নন। তাছাড়া তাঁর মত বিশ্ববিখ্যাত লেখকের কাছ থেকে তিনি যে কাকুতি-মিনতি লাভ করেছেন তা ক'জন নারীর ভাগ্যে ঘটে?

সুতরাং—আর কোন বাধা রইল না। বালজাকের দুরন্ত দৈহিক ক্ষুধা নিবারণ করবার জন্য ইভলিন হানসকা নিজের দেহ দান করলেন। কয়েকদিন ধরে উদ্দাম নর্মলীলা চলল। বালজাক সপ্ত স্বর্গে বাস করতে লাগলেন। আর ইভলিন? তিনিও ক্ষুধার্ত ছিলেন। তাঁর মনও পরিপূর্ণ হয়ে উঠল। ক্রমে বিচ্ছেদের সময় ঘনিয়ে এল। দু'জনেই বিষণ্ণ।

বালজাক ব্যাকুলভাবে প্রশ্ন করলেন, এরপর?

—তুমিই বল?

এইভাবে চিরদিন চলতে পারে না। তুমি আমার সঙ্গে প্যারিসে চল।

—না, না এখন নয়।

—এখন নয় কেন?

বালজাকের চেয়ে বিচক্ষণতা ইভলিনের অনেক বেশি।

তিনি ধীরে ধীরে বললেন, গৃহত্যাগ করলে স্বামীর বিরাট সম্পত্তি থেকে আমি বঞ্চিত হব। লোকে কেচ্ছা করার চমৎকার সুযোগ পাবে। তিনি রুগ্ন ব্যক্তি। খুব বেশি দিন তিনি বোধহয় নেই।

ইভলিনের কথার গূঢ় অর্থ বালজাক ধরতে পারলেন। চলার পথে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন অনস্বীকার্য। বিপুল সম্পত্তি হাতছাড়া করা তাই বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। অসুস্থ হানসকা আর ক'দিন? ভদ্রলোক মারা যাবার পর সম্পত্তি আর সুন্দরী নারী দুই-ই লাভ করবেন তিনি। এখন শুধু কিছু ধৈর্যের প্রয়োজন। বালজাক খুশি হলেন। আগামী শীতে এখানে আবার মিলিত হবেন এই প্রতিশ্রুতি দিয়ে বিদায় নিলেন ওখান থেকে। অবশ্য ইতিমধ্যে যদি হানসকা দেহ রাখেন তাহলে তো কথাই নেই।

কিন্তু হানসকার মারা যাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। শোচনীয় স্বাস্থ্য নিয়ে বেঁচে থেকে তিনি দু'জনের অভিশাপ কুড়তে লাগলেন। এদিকে প্যারিসে কয়েকটি নারী-ঘটিত ব্যাপারে জড়িয়ে পড়লেন বালজাক। এই সমস্ত কথা চাপা থাকার নয়। পল্লবিত হয়ে ইভলিনের কানে গিয়ে পৌঁছাল। স্বাভাবিকভাবে তিনি প্রথমে মর্মাহত ও তারপর ক্রুদ্ধ হলেন। দীর্ঘ চিঠি লিখে বালজাককে জানিয়ে দিলেন, কোন সম্পর্ক তাঁর সঙ্গে রাখা আর সম্ভব হচ্ছে না।

ভয় পেয়ে গেলেন বালজাক। নিজের অসংযমের জন্য আক্ষেপ হতে লাগল। যা হোক, কাল বিলম্ব না করে, দু'হাজার ফ্রাঁ ধার নিয়ে ভিয়েনা যাত্রা করলেন ইভলিনের সঙ্গে দেখা করতে। অনেক আবেদন-নিবেদনের পর ইভলিন তাঁকে ক্ষমা করলেন। কয়েক দিন অজস্র আনন্দের মধ্যে কাটল দু'জনের। মর্সিয়ে হানসকারের স্বাস্থ্য আরো খারাপ হয়ে পড়েছে। দেখে মনে হয় যে কোন মুহূর্তে তিনি মারা যেতে পারেন।

আশায় দিন গুণতে লাগলেন। ক্লান্ত হয়ে পড়লেন বালজাক। শেষ পর্যন্ত মারা গেলেন হানসকা। তবে দীর্ঘ আট বছর পরে। মর্সিয়ের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে বালজাক লিখলেন, এই সময়ে তোমার পাশে থাকা আমি নিজের কর্তব্য বলে মনে করছি। এতদিন পরে ঈশ্বর আমাদের উপর করুণা করেছেন!

আনন্দে বালজাকের মন কানায় কানায় ভরে উঠেছে। ইভলিনকে বিয়ে করার পরই তিনি ঋণ মুক্ত হবেন। সুযোগ পাবেন আরামের, নিঃশ্বাস ফেলার। কিন্তু ইভলিনের চিঠি প্রেয়ে তিনি হতাশায় ডুবে গেলেন। মাদাম লিখেছেন, তাঁর ন্যক্কারজনক কার্যকলাপে তিনি মর্মাহত। সুতরাং সাক্ষাতের কোন প্রয়োজন নেই।

বালজাক দমে যাবার পাত্র নন। রওয়ানা হলেন সেণ্টপিটার্সবার্গ। দেখা হল দু'জনের। দু'জনেরই বয়স বেড়েছে। সালটা ১৮৪১। আবার অনুনয়-বিনয়ের বন্যা বইয়ে দিলেন বালজাক। শেষ পর্যন্ত ইভলিন নরম হলেন। চেহারার জৌলুস না

থাকলেও কথাবার্তা বলার এমন একটা আকর্ষণীয় ভাব ছিল যে কঠিনা নারীদের হৃদয়ও তিনি দ্রবীভূত করতে পারতেন।

বিয়ের প্রস্তাব করলেন।

—এখন নয়।

—কেন?

—আগে মেয়ের বিয়ে হয়ে যাক, তারপর।

যথা সময়ে মেয়ের বিয়ে হয়ে গেল। আবার বিয়ের প্রস্তাব করলেন। বালজাকের জীবনী-শক্তি ক্রমেই ক্ষীণ হয়ে আসছে। আগেকার মত আর লিখতে পারেন না। এখন ইভলিনকে স্ত্রীরূপে পেলে তিনি প্রেরণা পাবেন। আবার জ্বলে উঠবেন। সব কথাই বুঝিয়ে বললেন। বালজাককে দেহদানে বিরত না থাকলেও বিয়ের প্রস্তাব ইভলিন কৌশলে এড়িয়ে গেলেন। এই প্রত্যাখানে বালজাক ভেঙ্গে পড়লেন।

সাত বছর আরো কেটে গেল।

এই সাত বছরে অজস্রবার দেখা হল দু'জনের। ইভলিন বালজাকের নর্মসহচরী হিসেবেই রইলেন। বিয়ে হল না। ১৮৪৮ সালে বালজাক এলেন মাদামের ইউক্রেনের বাড়িতে বেড়াতে। এখানে এসেই কঠিন রোগে পড়ে গেলেন তিনি। রাজসিক চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। ধীরে ধীরে আরোগ্য লাভ করলেন। চিকিৎসকরা কিন্তু জানিয়ে দিলেন বালজাকের আয়ু আর বেশি দিন নেই।

বিস্ময়ের বিষয় এর অল্পদিন পরেই বিয়েতে রাজি হলেন ইভলিন। বালজাকের প্রতি গভীর ভালবাসা ও মমত্ববোধে যে তিনি বিয়েতে মত দিয়েছিলেন তা নয়। প্রকৃতপক্ষে ওই প্রখ্যাত ব্যক্তিকে তিনি ভালবাসতে পারেন নি। বালজাকের জীবনে অসংখ্য নারীর আনাগোনা হয়েছে। প্রকৃত ভালবাসা তিনি পেয়েছিলেন একমাত্র মাদাম দ্য বার্ণির কাছ থেকে।

ইভলিনের মনে ছিল দুর্জয় উচ্চাকাঙ্খা। বালজাকের মত বিখ্যাত লোকের সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনি আগামী দিনে চর্চিত হবেন—এই লোভ সংবরণ করতে পারেননি। তাই শেষ পর্যন্ত মৃত্যু পথযাত্রীর সঙ্গে বিয়ে করতে সম্মত হয়েছিলেন।

১৮৬০ সালের ১৪ই মার্চ বিয়ে হয়ে গেল দুজনের। দীর্ঘ আঠারো বছর অপেক্ষা করার পর বালজাকের মনস্কামনা পূর্ণ হল। কিন্তু ভাগ্যের কি চরম পরিহাস। বহু আকাঙ্ক্ষিত বিবাহিত জীবন বালজাক পাঁচ মাসের বেশি উপভোগ করতে পারলেন না।

১৮৬০ সালের ১৭ই আগস্ট রাত সাড়ে দশটার সময় বহু বিতর্কিত চরিত্র অনরে দ্য বালজাক সুদূরলোকে যাত্রা করলেন। তখন মাদাম ইভলিনের মনের অবস্থা কেমন ছিল এখন আর তা জানা যায় না।

প্রেমের রাজা ডিকেন্স

১৮১২ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি।

ইংল্যাণ্ডের পোর্টসিতে সন্ধ্যা ঘন হয়ে এসেছে। বরফ পড়ছে না বটে, তবে হিম শীতল প্রাকৃতিক পরিবেশ। কুয়াশার আস্তরণ ভেদ করে দৃষ্টি বেশিদূর প্রসারিত হয় না। এই রকম দিনে জনের ইচ্ছে ছিল না বাড়ি থেকে বেরুবার। তবে এলিজাবেথের আগ্রহকে উপেক্ষা করা সম্ভব হল না। তাদের জীবনে এইটুকু তো আনন্দ। অজস্র অভাব, অভিযোগ, পাওনাদারের তাগাদা—তবু, মাঝে মাঝে সন্ধ্যার সময় নাচের আসরে গিয়ে উপস্থিত হতে পারেন এতে মন ভরে ওঠে।

এলিজাবেথের শরীর ভাল নেই। নাচের আসরে যেতে ইতঃস্তত করার এই কারণটাই প্রধান। পথে বা সেখানে গিয়ে যদি অসুস্থতা প্রবল আকার ধারণ করে?

জন বলেছিলেন সে কথা, তোমার শরীর ভাল নেই। এই সময় যাওয়াটা বোধহয় ঠিক হবে না। এলিজাবেথ মৃদু হেসে উত্তর দিলেন, আমার কিছু হবে না। বাড়িতে চুপচাপ বসে থাকলে বরং শরীরে অস্বস্তি বাড়বে।

দু'জনে গেলেন নাচের আসরে।

জনের আশঙ্কাই বাস্তবে পরিণত হল। ওখানেই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লেন এলিজাবেথ। ধরাধরি করে বাড়ি নিয়ে আসা হল। জনের আর্থিক স্বচ্ছলতা থাকলে তিনি নিশ্চয় একজন ভাল চিকিৎসক আহ্বান করতেন। ঈশ্বরের অনুগ্রহের উপর স্ত্রীকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

পরের দিন এলিজাবেথ একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। এই অতিথির আগমনে স্বামী-স্ত্রী দু'জনের কেউ সুখী হলেন না। অভাবের সংসারে আবার এক নতুন বোঝা। তখন কোনমতেই বুঝতে পারা সম্ভব ছিল না যে, আজ যে শিশু তাঁদের ঘরে এসে পৃথিবীর প্রথম আলো দেখল, আগামী দিনে সে ইংরাজী সাহিত্যের আকাশে এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্করূপে বিরাজ করবে। বলা বাহুল্য ডিকেন্সের অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা ইতিহাসে এক অবিস্মরণীয় নজির হয়ে রয়েছে।

চার্লস ডিকেন্স ১৮১২ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি পোর্টসিতে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের পূর্বে তাঁর মা'র মনে নাচের আসরের উদ্দামতা ও তীব্র উচ্ছ্বাস থাকায়, চার্লসের জীবনে এই অনুভূতি সংক্রামিত হয়েছিল। তিনি নিজের জীবনে

উদ্দামতাকে প্রশ্রয় দিয়ে এসেছেন। এই প্রসঙ্গেই বলেছেন এক জায়গায়, "O there are days in this life, worth life and worth death. And O what a bright old song it is, that O 't' is love, 't is love, 't' is love that makes the world go round."

জন ডিকেন্স নেভি পে অফিসের সামান্য কেরানি ছিলেন। আয় তো অল্প ছিলই, তার উপর জন ছিলেন অত্যন্ত খরচে। ভবিষ্যতের কথা না ভেবে দরাজ হাতে শেষ পেনিটুকু খরচ করার মধ্যে তিনি আনন্দ পেতেন। স্বাভাবিক ভাবেই ধার-দেনার বেড়াজালে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। এই কারণে তাঁকে কয়েক বার জেলেও যেতে হয়েছিল। চার্লস জনের দ্বিতীয় সন্তান। প্রথমটি মেয়ে। অভাব-অভিযোগ ও চরম অশান্তির মধ্যে চার্লস বড় হয়েছেন। পড়াশুনা তার বিশেষ হবার কথা নয়, হয়ও নি।

পড়াশুনা করতে পারেননি বলে আজীবন চার্লসের মনে নিদারুণ আক্ষেপ ছিল। তবে এ বিষয়ে তিনি বড় একটা কারুর কাছে ক্ষোভ প্রকাশ করেননি। উত্তর জীবনে কখনও কখনও শুধু অসতর্ক মুহুর্তে এই ক্ষোভ বেদনার আকারে প্রকাশ পেত। চাকরি জীবনে প্রবেশ করে তাঁর প্রথম আয় হল সপ্তাহে ছ' শিলিং। এই অল্প ক'টি শিলিং তখন পরিবারকে সম্পূর্ণ অনাহার থেকে রক্ষা করেছিল? কাজটা আর কিছুই নয়, শিশি-বোতল পরিষ্কার করা এবং তাতে লেবেল লাগান। পনেরো বছর বয়সে চার্লস ডিকেন্স এক এটর্নী অফিসের সংবাদ বাহকের চাকরি পেলেন। অবশ্য কিছুদিনের মধ্যে আরেক অফিসে তাঁর কেরানির পদ জুটে যায়। এই কাজ করতে করতে তিনি শর্টহ্যাণ্ড শিখতে থাকেন। এবং ভাগ্য গুণে পেয়ে যান রিপোর্টারের কাজ।

আইন অফিসের কেরানির কাজ করতে তাঁর ভাল লাগত না। সাংবাদিকের চাকরিতে বেশ উৎসাহ পেতে লাগলেন। এই সময় ফিচার লেখার সুযোগ পেয়ে গেলেন, "দি মান্থলি ম্যাগাজিন" ও 'দি মর্নিং ক্রণিকাল"। ডিকেন্সের ভাগ্য অত্যন্ত সুপ্রসন্ন বলতে হবে। তাঁর এই ধারাবাহিক ফিচারটি একজন প্রকাশক গ্রন্থাকারে প্রকাশ করলেন। প্রকাশক নিশ্চয় এই লেখকের মধ্যে ভবিষ্যতের বিরাট সম্ভাবনা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি ডিকেন্সকে আরো রচনা দেবার জন্য অনুরোধ করলেন।

ডিকেন্সের লেখক-জীবন কোন এক শুভক্ষণেই আরম্ভ হয়েছিল। আরেকজন প্রকাশক এই সময় তাঁকে খেলাধূলা সংক্রান্ত দলের উপর একটি সরল রচনা লেখার কথা বললেন। বলতে কি ডিকেন্সের এই সম্পর্কে কোন জ্ঞান ছিল না। যে সময়ে ছেলেমেয়েরা খেলাধূলা করে কাটায় সেই বয়সে তিনি অন্ন চিন্তায় ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। যাহোক, দমবার পাত্র তিনি নন। টাকার এখন বিশেষ প্রয়োজন। প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। অনেক অনুসন্ধানের পর তথ্য সংগ্রহ করলেন এবং প্রচুর পরিশ্রম

করে লিখলেন "পি পিকউইক পেপারস"। এই বইটি প্রকাশিত হবার পরই ডিকেন্স খ্যাতিমান হয়ে উঠলেন। সমালোচকরা তখন তাঁকে স্বীকার করে নেননি। "দি কোয়ার্টারলি রিভিউ" এ লেখক সম্বন্ধে মন্তব্য করা হল, "ভবিষ্যৎ এঁর উজ্জ্বল একথা বলা চলে না। ইনি জ্বলন্ত হাউই এর মত উপরে উঠেছেন এবং অচিরেই পুড়ে যাওয়া কাঠির মত নিচে নেমে আসবেন।"

নতুন লেখকরা সমালোচকদের ভয় করে চলেন। তাঁদের বিরূপ মন্তব্যে ভেঙে পড়েন। কিন্তু ডিকেন্স অন্য ধাঁচের লোক ছিলেন। সমালোচকদের শ্লেষকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না। তিনি পূর্ণোদ্যমে লিখে চললেন। ক্রমে প্রকাশিত হল " অলিভার টুইষ্ট", "নিকোলাস নিকলবি" এবং আরো অনেক বই। তাঁকে নিয়ে হৈ হৈ পড়ে গেল। ওয়াল্টার স্কটের অসম্ভব জনপ্রিয়তা ছিল, কিন্তু একথা আজ বলতে বাধা নেই এ পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডের কোন ঔপন্যাসিক ডিকেন্সের জনপ্রিয়তাকে ছাপিয়ে যেতে পারেননি। অল্পদিনের মধ্যেই অবশ্য সমালোচকরা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরেছিলেন এবং তাঁর উচ্ছসিত প্রশংসায় মুখর হয়ে উঠেছিলেন।

প্রিয়দর্শন ডিকেন্স অত্যন্ত ভদ্র ও বিনয়ী ছিলেন। শিষ্টাচার বহির্ভূত কোন কাজ তিনি করতেন না। পরিচিত মহলে তিনি আদর্শ ব্যক্তি হিসেবে ছিলেন চিহ্নিত। তবে একথাও সকলে একবাক্যে স্বীকার করত। তিনি পোশাক বিলাসী। ভেলভেটের কোট, রঙ্গীন টাই ও সাদা টুপির অত্যন্ত অনুরাগী ছিলেন। মুখের মধ্যে চোখ দু'টি ছিল সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। বলতে গেলে চোখের আকর্ষণেই তাঁর জীবনে অনেক নারী এসেছিল। বহু লেখকের চেয়ে এ বিষয়ে তিনি ভাগ্যবান। তবে নারীসঙ্গ পাওয়া ও প্রকৃত প্রেম লাভ করা এক নয়। ডিকেন্সের জীবনের এই দিকটা সম্পূর্ণ খালি ছিল। আন্তরিকভাবে তৃপ্তি লাভ করেছেন এমন প্রেম তাঁর জীবনে আসেনি।

কুড়ি বছর বয়স হবার পূর্বে ডিকেন্স প্রথমবার প্রেমে পড়লেন।

তখন তিনি সামান্য চাকরি করেন, অবস্থা বিশেষ ভাল নয়। লণ্ডনের এক অতি সাধারণ পল্লীতে থাকেন "দি পিকউইক পেপারস" ও প্রকাশিত হয়নি। ডিকেন্স তখন অত্যন্ত লাজুক প্রকৃতির ছেলে। কারুর সঙ্গে বিশেষ মেলামেশা করেন না। গুটি কয়েক মাত্র বন্ধু। সব সময় নিজেকে প্রচ্ছন্ন রাখেন—অফিসে যান আর বাড়ি এসে একাগ্রভাবে ভাল লেখবার চেষ্টা করেন।

সেদিন কোন ছুটির দিন ছিল। ডিকেন্স যথানিয়মে বাড়িতেই ছিলেন। বাল্যবন্ধু হেনরী কোলেস এল দেখা করতে।

হেনরীকে পছন্দ করেন ডিকেন্স। অনেক কথা হল দুই বন্ধুর মধ্যে। ছুটির দিনেও ঘরে চুপচাপ বসে থাকা নিয়ে অভিযোগ জানালেন হেনরী। বললেন, লণ্ডনে কোন তরুণের পক্ষে এইভাবে দিন কাটান অনুচিত।

ডিকেন্স মৃদু হাসলেন। —আমার স্বভাবতো তুমি জান, তাছাড়া লিখতে হয়।

—স্বভাব পাল্টাতে হবে। তাতে তোমার লেখার বিশেষ ক্ষতি হবে বলে আমি মনে করি না। চল, আজই আমার সঙ্গে একটা পার্টিতে ঘুরে আসবে।

—কোথায়?

—মিঃ ব্যাডনালের বাড়িতে। সময় মন্দ কাটবে না।

ডিকেন্সের খুব যে যাবার ইচ্ছে হল তা নয়। কিন্তু হেনরীর অনুরোধকে উপেক্ষা করতে সাহসী হলেন না। সে আবার তর্ক জুড়ে দেবে। বললেন, এই ধরনের সুযোগের অপচয় করা বোকামি, কি বল? তুমি যখন অনুরোধ করছো, নিশ্চয় যাব।

মিঃ ব্যাডনাল অবস্থাপন্ন সমাজের মধ্যমণি। এক বিরাট ব্যাঙ্কের সঙ্গে যুক্ত আছেন। তাঁর তিনটি মেয়ে। মেয়ে তিনটি ব্যাডনাল পরিবারের সুনামকে আরো প্রতিষ্ঠিত করেছে। এদের আগামী জীবন যাতে আড়ম্বরপূর্ণ ও ঐশ্বর্যে মোড়া হয় সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছেন মিসেস ব্যাডনাল। বাড়িতে প্রায়ই পার্টির ব্যবস্থা হয়। পার্টিতে আমন্ত্রিত হয় শহরের সম্ভ্রান্ত ঘরের ছেলেরা। এদের মধ্যে থেকে জামাই খুঁজে নেওয়াই ব্যাডনাল দম্পতির উদ্দেশ্য।

ছোট মেয়ে দুটির বাগদত্তা হয়েছে। বড়টির জন্যই এখন চিন্তা। বড়মেয়ে মেরিয়া সুন্দরী। তার দিকে তাকালে স্বর্গের পরীদের (যদি তারা সত্যি থাকে) কথা মনে পড়ে। গান বাজনাতেও তার সমকক্ষ খুব কম খুঁজে পাওয়া যাবে। ব্যাডনালদের সম্পর্কে সমস্ত কথাই হেনরীর মুখে শুনলেন ডিকেন্স। এবার ওখানে যাবার কেমন উৎসাহ বোধ করতে লাগলেন।

সন্ধ্যার সময় পার্টিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। সমাজের উঁচু মহলের কোন ব্যক্তির বাড়িতে আজ পর্যন্ত তিনি পার্টি উপলক্ষ্যে যান নি। তখন মূল্যবান সাজপোশাকও তাঁর ছিল না। যা ছিল তাকেই যতদূর সম্ভব মার্জিত আকার দিয়েছেন বলা চলে। সত্যি কথা বলতে কি, বেশ ভয় ভয় করছিল তাঁর।

জমকাল বিশাল প্রাসাদ। চতুর্দিকে প্রাচুর্য ও রুচির মাখামাখি। প্রাসাদের মধ্যে প্রবেশ করলেন দু'জনে। পরিচারক পথ দেখিয়ে তাঁদের নিয়ে গেল ড্রইংরুমে। এরকম সুসজ্জিত ও বিরাট ড্রইংরুম জীবনে দেখেন নি ডিকেন্স। তিনি মুগ্ধ বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন। অতিথিরা সকলেই এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। সুবেশ ও সুদর্শন যুবকের দল।

ঘরের কোণে বসে মেরিয়া বীণা বাজাচ্ছিল। বীণার সঙ্গে বেহালায় সুর মেলাচ্ছিল তার খুড়তুতো বোন এমিলি। ঘরের মৃদু কলগুঞ্জনকে ছাপিয়ে সুরের মূর্চ্ছনা জাল বিস্তার করেছিল। ডিকেন্স সেই কোণের একটি আসনে গিয়ে বসলেন।

এক সময় বাজনা শেষ হল। মেরিয়ার দৃষ্টি পড়ল অপরিচিত যুবকটির উপর। উঠে এসে মিষ্টি হাসল। শিষ্টাচার বজায় রেখেই প্রশ্ন করল, আপনি তো মিস্টার কোলেসের সঙ্গে এলেন? এর আগে কোথায় যেন আমাদের দেখা হয়েছিল। দেখা যে কোথাও হয়নি ডিকেন্স তা জানেন। তবে মেরিয়া একথা কেন বলল তা তিনি বুঝতে পারলেন না। তাঁর জানা ছিল না অভিজাত সমাজের নতুন আলাপীদের সঙ্গে এইভাবে কথাবার্তার সূত্রপাত করতে হয়। যাহোক, মেরিয়া তাঁর সঙ্গে নিজে থেকে আলাপ করতে এসেছে, এতে তিনি নিদারুণ আনন্দিত হলেন। মেয়েদের সঙ্গে মেলামেশা করতে তিনি ভয় পান। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের এড়িয়ে চলেন।

এই প্রথমবার মিস্টার ব্যাডনাল ড্রইংরুমে প্রবেশ করার পর এক ভিন্ন ধরনের বিকার বোধ তাঁর মনকে নাড়া দিয়ে উঠল। অবশ্য একথা স্বীকার করতেই হবে, মেরিয়ার মত সুন্দরী মেয়ে, অভিজাত মেয়ের এত কাছাকাছি কখনও তিনি আসেননি।

মৃদু গলায় ডিকেন্স বললেন, আমি হেনরীর বন্ধু। তার অনুরোধেই এখানে এসেছি। আগে কিন্তু আমাদের কোথাও দেখা হয়নি।

সহজ গলায় মেরিয়া বলল, আপনার নাম কিন্তু আমার জানা হয়নি। কোথায় কাজ করেন?

ডিকেন্স খুশি হন। মেরিয়া তাঁর সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করেছে। কিন্তু পরমুহূর্তে রাজ্যের সঙ্কোচ তাঁকে ঘিরে ধরে। এই অর্থশালীদের সমাবেশে তিনি অতি নগণ্য কেরানি এ কথা বলতে তাঁর বাধল। অবশ্য উত্তর দিতে গিয়ে সত্যকে যে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন তা নয়। বললেন, পত্র-পত্রিকায় লিখি। আমার নাম চার্লস ডিকেন্স।

মেরিয়া হাসল। তার পাতলা ঠোঁটের ফাঁক দিয়ে সুন্দর দাঁতের ঝিলিক দেখা গেল। সে পানীয়ের মূল্যবান পাত্রটি তুলে ধরল ডিকেন্সের দিকে। মাথার মধ্যে কেমন ঝিমঝিম করে উঠল। আবেগে দু'চোখের পাতা বুজে আসতে চাইছে। এই অল্পক্ষণের মধ্যে এতখানি সৌভাগ্য তিনি লাভ করবেন কল্পনাও করতে পারেননি। ছুটে গিয়ে হেনরীকে ধন্যবাদ জানাতে ডিকেন্সের ইচ্ছে করছে। "প্রথম দর্শনেই প্রেম" বলে যে একটা কথা আছে তরুণ লেখক তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছেন। পানপাত্র তিনি সাগ্রহে গ্রহণ করলেন।

অনেক কথা হল দু'জনের মধ্যে। মেরিয়ার হাবভাবে কিছু অন্তরঙ্গতার ইশারা পাওয়া গেল। সগর্বে বিরাট ড্রইংরুমের চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন ডিকেন্স। অনেক ঈর্ষাকাতর চোখ তাঁদের দু'জনকে পর্যবেক্ষণ করেছে সন্দেহ নেই। মেরিয়া তাঁর জন্য অনেক সময় দিয়েছে। এক সময় পার্টি শেষ হল।

ডিকেন্সের মোহ ভঙ্গ হল। এই পার্টি অনিবার্য ভাবেই যে রাত্রি গভীর হবার

বহু পূর্বে শেষ হবে তা মনেই ছিল না তাঁর। মেরিয়ার কাছ থেকে বিদায় নেবার মুহূর্তে আবার সাক্ষাৎ করবার প্রতিশ্রুতি তিনি দিলেন। পথে নেমে বিভোর ভাবে এগিয়ে চলছেন। হেনরী তাঁর পাশে। বন্ধুর হাবভাব হেনরীকে চিন্তিত করে তুলল। উঁচু সমাজের ভাবধারা ও অন্যান্য বিষয়ের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান আছে হেনরীর। ডিকেন্সের সে রকম জ্ঞান যদি থাকত তাহলে তিনি এই ধরনের মনোবিকারের শিকার হতেন না।

ডিকেন্স যে মেরিয়ার মনে প্রথম সাক্ষাতেই প্রভাব বিস্তার করেছিলেন একথা কোনো মতেই বলা চলে না। তাঁর সুন্দর চোখ দু'টি আকর্ষণ করেছিল মেরিয়াকে। তাই সে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে অগ্রসর হয়েছিল। তাছাড়া আরো দু'টি কারণ ছিল। প্রথম, নিয়মিত যাদের দেখে দেখে মেরিয়া ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, ডিকেন্স তাদের মধ্যে কেউ নয়। দ্বিতীয় ছোট দু'টি বোন সঙ্গী জুটিয়ে নিয়েছে। সে এখনও পারেনি। এও কম লজ্জার কথা নয়। সমাজে এই নিয়ে কথা উঠতে পারে—পরিচিতদের কাউকে ভাল লাগে না মেরিয়ার। ডিকেন্স নতুন মানুষ। তাঁকে বাজিয়ে দেখে নিতে দোষ কি?

কিছুদূর এগিয়ে যাবার পর হেনরী বললেন, তোমার কি হয়েছে চার্লস? এত চুপচাপ কেন?

—কিছুই হয়নি।

—তোমার কি হয়েছে আমি জানি। হৃদয়কে এইভাবে কষ্ট দিয়ে লাভ কি? তুমি মোটেই তলিয়ে দেখনি, মেরিয়াকে কামনা করার অর্থ হল আলেয়ার পিছনে ছুটে যাওয়া।

—তুমি তার সম্পর্কে এতটা নির্দয় হয়ো না, হেনরী। আমার মন বলছে মেরিয়া সেরকম নয়। আমি তাকে ভালবেসে ফেলেছি। সেও আমার ডাকে সাড়া দেবে।

—তোমার অভিজ্ঞতা অনেক কম চার্লস। তুমি ঠকবে।

—দেখা যাক।

সাহস সংগ্রহ করে কয়েকদিন পরেই ডিকেন্স গেলেন ব্যাডনাল হাউসে। মেরিয়া খুশি হল, সাদরে গ্রহণ করল তাঁকে। অনেক কথা হল দু'জনের। ডিকেন্স যতদূর সম্ভব ঘনিষ্ঠ হবার চেষ্টা করলেন। সম্পর্ক গড়ে তোলার ব্যাপারে মেরিয়ারও ঐকান্তিকতা দেখা গেল। ডিকেন্স কিন্তু বুঝতে পারলেন না, এই ঐকান্তিকতার মধ্যে প্রকৃত পক্ষে কোন আন্তরিকতা নেই, নেই কোন উত্তাপ। মেরিয়া তাঁকে আরো বাজিয়ে দেখতে চায়। আপাতত আরও অনেকের মত তিনি তার অবসরের সঙ্গী মাত্র।

হেনরী ঠিকই বলেছিলেন, ডিকেন্সের অভিজ্ঞতার অভাব। তিনি কোন কিছুই তলিয়ে দেখলেন না। মেরিয়া তাঁকে ভালবেসেছে এই চিন্তা মনের মধ্যে দানা বাঁধতেই তিনি আত্মহারা হয়ে উঠলেন। মিসেস ব্যাডনাল লক্ষ্য করেছিলেন দু'জনকে। কিন্তু গুরুত্ব দেননি। তরুণী কন্যার দু'দশজন পুরুষ বন্ধু থাকবে বইকি।

প্রায়ই সাক্ষাৎ হয় দু'জনের। ঘনিষ্ঠ ভাবে কথাবার্তা হয়। ডিকেন্স চঞ্চল হয়ে ওঠেন। আর অপেক্ষা করে লাভ কি? বিয়ের প্রস্তাবটা এবার দেওয়াই বোধহয় বুদ্ধিমানের কাজ। এই সম্পর্কে চিন্তা করলেন আরো কয়েকদিন। ইতিপূর্বে এত গভীর ভাবে আর কোন বিষয়ে চিন্তা করেননি। প্রথমে বললেন কথাটা নিজের মাকে।

নিজেদের দারিদ্র্যের কথা চিন্তা করে শিউরে উঠলেন এলিজাবেথ ডিকেন্স। বললেন, এতবড় ঘরের মেয়েকে আমাদের মধ্যে না আনাই ভাল, চার্লস।

—মেরিয়া সেরকম নয় মা। আমাদের এই পরিবেশে সে নিশ্চয় নিজেকে মানিয়ে নেবে।

ডিকেন্স স্থির করে ফেললেন মেরিয়া এবং তার মা'কে আমন্ত্রণ জানাবেন। বিবাহের প্রস্তাব তুলবেন তারপর। তবে এই বাড়িতে নয়, এই কদর্য পল্লীতেও নয়। ভদ্র কোন পরিবেশে। অল্প খোঁজাখুঁজিতেই বেন্টিক স্ট্রীটে বাড়ি পাওয়া গেল। আঠারো নম্বরের এই বাড়িখানাকে দেখে নিন্দা করবার কিছু নেই। মা-ও বাবাকে নিয়ে ডিকেন্স এখানে উঠে এলেন।

১৮৩৩ সালের সেই সন্ধ্যা ডিকেন্সের জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বেদনার প্রতীক হয়েছিল। আমন্ত্রণ রক্ষা করতে সকন্যা মিসেস ব্যাডনাল এলেন। ডিকেন্স ব্যবস্থাপনা ও আপ্যায়নের কোন ত্রুটি রাখেননি। ঘর সাজিয়ে ছিলেন মনোরমভাবে। শুধু সেই দিনটির জন্য ভাড়া করে এনেছিলেন দরোয়ান। খাদ্যবস্তুর তালিকা অভিজাতদের পছন্দ লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছিল। সঞ্চয় যা ছিল সমস্ত খরচ হয়ে গেছে। দেনাও কিছু হয়েছে। হোক। মেরিয়া তাঁর বাড়িতে আসছে এতেই তিনি আনন্দিত।

মেরিয়ার সাজ আজ দেখবার মত। মুগ্ধ হয়ে তার দিকে তাকিয়ে থাকেন ডিকেন্স।

—কি দেখছ? মৃদু হেসে প্রশ্ন করে মেরিয়া।

—তুমি কত সুন্দর তাই আমি দেখছি মেরি।

পৃথিবীতে অনেক ক'টা বছর কাটিয়েছেন মিসেস ব্যাডনাল। তিনি চর্তুদিক খুঁটিয়ে দেখতে থাকেন। আসল এবং নকলের প্রভেদ বোঝবার দৃষ্টি তাঁর আছে। সমস্ত পরিবেশটাই তাঁর কাছে কেমন মেকি বলে মনে হয়। বিশেষ করে তাঁর খারাপ লাগে ডিকেন্সের মা-বাবার কথাবার্তা ও সাজপোশাক। কেমন যেন চাষাড়ে ভাব। সাজপোশাক দেখে মনে হয় যেন ষোড়শ শতাব্দীর মানুষ ওরা। ভ্রূকুঁচকে

থাকে মিসেস ব্যাডনালের। তাঁর অভিজাত মন হাঁপিয়ে ওঠে এই চার দেওয়ালের মধ্যে।

ইতিমধ্যে ডিকেন্স ও মেরিয়ার মধ্যে অনেক কথা হয়েছে। শেষ হয়েছে মান-অভিমানের পালা। মেরিয়া খুশিতে ঝলমল করছে। তার নাকি এখানে এসে অত্যন্ত ভাল লাগছে। ডিকেন্স আর অপেক্ষা করা সঙ্গত মনে করলেন না। আসল কথাটা বলার উপযুক্ত সময় এবার উপস্থিত হয়েছে। কুণ্ঠিত গলায় ডিকেন্স বললেন, তোমায় একটা কথা বলতে চাই, মেরি?

—বল না!

—তুমি নিশ্চয় বুঝতে পেরেছ, আমি তোমাকে প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছি?

—কি বলছ তুমি!

—আমি তোমাকে বিয়ে করতে চাই, মেরি।

মেরিয়া কল্পনাও করতে পারেনি ডিকেন্স এই ধরনের কথা বলতে পারেন। সে কেমন অসহায় বোধ করতে লাগল। সরে এল ডিকেন্সের কাছ থেকে।

—চুপ করে রইলে যে?

—এ হতে পারে না চার্লস। অসম্ভব—।

ডিকেন্সের মনের রঙ্গিন স্বপ্ন তাসের মিনারের মত ভেঙ্গে পড়ল।

তিনি আকুল গলায় বললেন, কেন হতে পারে না? তুমি কি আমায় একটুও ভালবাসনি?

—বন্ধুর মত যাকে ভালবাসা যায় তাকে বিয়ে করা যায় না চার্লস।

—আমার অনুরোধ উপেক্ষা কর না মেরি। তোমাকে না পেলে আমার জীবন ব্যর্থ হয়ে যাবে।

—সামান্য একটা ব্যাপারকে এত গুরুত্ব দেওয়া তোমার শোভা পায় না। আমি বুঝতে পারিনি শেষ পর্যন্ত তুমি এই কথা বলে বসবে।

—তুমি যদি সাধারণ বন্ধুত্বই আমার চেয়েছিলে, তবে কেন আমাকে প্রলুব্ধ করেছিলে? কেন আমাকে এত প্রশ্রয় দিয়েছিলে?

অনাসক্ত গলায় মেরিয়া বলল, তুমি যে এত ভাবপ্রবণ বুঝতে পারিনি। দেখি মাকে বলে তিনি কি বলেন!

মেরিয়া মিসেস ব্যাডনালের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল।

—মা, চার্লস, আমাকে বিয়ে করবার জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। কি করা যায় বলতো?

মা মেয়ের মনের কথা বুঝলেন।

গম্ভীর গলায়, বললেন তা হয় না, মেরি। এই বাড়ির বৌ হওয়ার জন্যে তুমি

জন্মাওনি। এদের এত সাহস হয় কি করে! একটু প্রশ্রয় পেয়েই একেবারে মাথায় উঠে বসেছে। না, না, আর এক মুহূর্ত এখানে নয়। তুমি আর কোনদিন এখানে আসবে না। আর কোনদিন কথা পর্যন্ত বলবে না এই ছোকরার সঙ্গে।

ডিকেন্সদের অজস্র অনুরোধকে উপেক্ষা করে সকন্যা মিসেস ব্যাডনাল বিদায় নিলেন। স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন চার্লস ডিকেন্স। চারিধারে এত আলো তবু মনে হচ্ছে জমাট অন্ধকার তাঁকে গ্রাস করেছে। কয়েকদিনের মধ্যেই তাঁর লেখা চিঠিগুলো মেরিয়া ফেরত পাঠিয়ে দিল। মেরিয়ার চিঠিগুলোও ডিকেন্স নিজের কাছে রাখলেন না। পাঠিয়ে দিলেন। এইভাবে তার প্রথম প্রেমের পর্ব শেষ হল।

উত্তর জীবনে আরো কয়েকবার সাক্ষাৎ হয়েছিল মেরিয়ার সঙ্গে ডিকেন্সের। তখন তিনি প্রবীণ—লব্ধ প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিক। সম্মান আর অর্থ দুই-ই তখন তাঁর প্রচুর। আর মেরিয়া? সৌন্দর্য মুছে গেছে। নানা কারণে স্বামীর অর্থ নষ্ট হওয়ায় সাধারণ অবস্থা। কোনরকমে দিন চলে। সেদিন মিসেস ব্যাডনাল জীবিত ছিলেন না। নইলে দেখতেন ভাগ্যের পরিহাস কত নিষ্ঠুর আকারে দেখা দিতে পারে।

ক্রমে ১৯৩৬ সাল এসে পড়ল।

ডিকেন্স চব্বিশ বছরের খ্যাতনামা যুবক। লেখক হিসাবে শুধু সুনামই লাভ করেননি অর্থের মুখও দেখতে আরম্ভ করেছেন। মেরিয়ার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাবার পর খুবই আঘাত পেয়েছিলেন সন্দেহ নেই। তবে একেবারে ভেঙ্গে পড়েননি। মনের অবস্থা সামলে নিয়েছিলেন কিছুদিনের মধ্যেই। তারপর কেটে গেছে বেশ কয়েক বছর। অনেক মেয়েই সাগ্রহে এগিয়ে এসেছে তাঁর দিকে। সতর্কতার সঙ্গে মিশেছেন। ভাবাবেগকে প্রশ্রয় দিয়ে আর হৃদয় খুইয়ে বসেননি।

১৮৩৬ সালেই ডিকেন্স স্থির করে ফেললেন এবার বিয়ে করবেন। আর ছন্নছাড়ার মত জীবন কাটানোর কোন অর্থ হয় না। তখনও চাকরি করছেন। তাঁর সহকর্মী জর্জ হগার্থ আটটি মেয়ের বাপ হয়ে নাজেহাল অবস্থায় দিন কাটাচ্ছিলেন। জর্জকে কিছুটা হালাক করে দেবার জন্যেই বোধহয় তাঁর বড়মেয়ে কেটকে ডিকেন্স বিয়ে করলেন।

কেট দেখতে খারাপ ছিলেন না। গুণও ছিল অনেক। তবু তাঁদের বিয়ে সুখের হয়নি। সুখের হয়নি কেটের গোটা কতক চারিত্রিক দোষের দরুণ। কেট নিজেকে স্বামীর কাছে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দেবার মনোভাব গ্রহণ করেননি। প্রতিভাবান স্বামীর যোগ্য সহধর্মিনী হতে গেলে কিভাবে থাকতে হবে সে জ্ঞানটুকু তাঁর ছিল না, এই অভিযোগ আর কারুর নয় স্বয়ং ডিকেন্সের। কেট নিম্নমধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। অনেক ভাইবোনের মাঝে অভাব-অভিযোগের সঙ্গে সংগ্রাম করতে করতে

বড় হয়েছিলেন। বিয়ে হয়ে যাবার পর ওই পরিবেশ থেকে পরিত্রাণ পেয়েছেন এতেই তিনি খুশি। এরপর স্বামীর জন্যেও তাঁর অনেক কিছু করণীয় আছে তা মনে পড়েনি। অবশ্য স্থূল কর্তব্য কর্ম তিনি সব সময়েই সাগ্রহে করেছেন। সংসার ও ছেলেমেয়েদের নিয়ে ব্যস্ত থেকেছেন। স্বামীর জন্যে চিন্তা-ভাবনা করবার অবকাশ কোথায়? স্ত্রী এই উচ্চতার অভাব আবহমানই ডিকেন্সকে ক্ষুব্ধ রেখেছে।

স্ত্রীর ব্যবহারে নিরাশ হয়ে ডিকেন্স তাদের সঙ্গে থাকার আমন্ত্রণ জানালেন মেরিকে। মেরি হগার্থ কেটের পরের বোন। দেখতে অপূর্ব সুন্দরী। ডিকেন্স মেরিকে পছন্দ করতেন। অবশ্য পরে যে তার প্রেমে পড়ে যাবেন তা তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। মেরিকে আহ্বান করবার আরো একটি বিশেষ কারণ ছিল। কেট নিজের শিশু সন্তান নিয়ে অত্যন্ত বিব্রত থাকতেন। সাংসারিক কাজকর্ম তাঁর পক্ষে করে ওঠা অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। কাজকর্মের সুবিধার জন্য মেরিকে আনবার প্রস্তাব দিতেই তিনি রাজি হয়ে গেলেন।

মেরি এল।

স্বাভাবিক ভাবেই ডিকেন্সের প্রতি তার তখন শ্রদ্ধার ভাব ছিল, কোনরকম অনুরাগ ছিল না। দিন কেটে যেতে লাগল। মেরি নানা ব্যাপারে সাহায্য করে লেখককে। এখানে ওখানে যায়। ডিকেন্সের মনে নেশা ধরে গেল। তার ক্ষণিকের অনুপস্থিতিও তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে উঠল। মেরি ক্রমে বুঝতে পারল ডিকেন্সের ব্যথা কোথায়? তিনি অকপটে কেট সংক্রান্ত সমস্ত কিছু একদিন বললেন। প্রথমে সহানুভূতি এবং তারপর প্রেম সঞ্চারিত হল মেরির মনে। ডিকেন্স তখন বুঝতে পেরেছেন, এত গভীরভাবে পূর্বে তিনি আর কাউকে ভালবাসেননি।

লেখকের মনে আবার আস্থা ফিরে এল। তিনি একাগ্রমনে লেখেন আর মেরির সান্নিধ্যে বিভোর হয়ে থাকেন। এইভাবেই দিন কেটে যাবে ডিকেন্স ভেবেছিলেন কিন্তু ঈশ্বরের ইচ্ছা ছিল অন্যরূপ।

মেঘহীন আকাশে বজ্রপাতের মত মাত্র কয়েক ঘণ্টার অসুখে মেরি হঠাৎ মারা গেল। এই অচিন্ত্যনীয় ঘটনায় বুক ভেঙে গেল ডিকেন্সের। মেরিয়ার সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর তিনি আঘাত পেয়েছিলেন, তবে এতটা নয়। বহুদিন পর্যন্ত তাঁর লেখা স্থগিত রইল। তিনি তাঁর ডায়রিতে লিখেছিলেন, "সে বিদায় নিয়েছে, ঈশ্বরের কাছে আমার আন্তরিক প্রার্থনা, আবার যেন তার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়!" মৃতা মেরির আঙ্গুল থেকে একটি আংটি খুলে নিয়ে তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত ব্যবহার করেছিলেন। তিনি এ ব্যবস্থাও করে গিয়েছিলেন, মৃত্যুর পর তাঁকে যেন মেরির পাশে সমাহিত করা হয়।

মেরির মৃত্যুর পর আরো কয়েক বছর কেটে গেল। কোনরকমে দিন কাটিয়ে চলেছেন ডিকেন্স। তিনি এখন জনপ্রিয় লেখক। প্রচুর অর্থ উপার্জন করছেন। এই সময় আমেরিকা থেকে আমন্ত্রণ পেলেন। ওখানকার পাঠকরা তাঁকে চাক্ষুষ দেখতে চায়। তাঁর কাছ থেকে কিছু শুনতে চায়। ডিকেন্স এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। স্থির হল সস্ত্রীক যাবেন আমেরিকা। তবে ছেলেমেয়েরা এখানেই থেকে যাবে। তাদের সঙ্গে নিয়ে গিয়ে ডিকেন্স বিদেশে ঝামেলা বাড়াতে চান না। কিন্তু তারা থাকবে কার কাছে? তাদের দেখাশোনা করবে কে? শেষ পর্যন্ত জর্জির হেফাজতেই তাদের রেখে যেতে হল।

কেটের আরেক বোন জর্জি। এই মেয়েটির স্বভাবই শুধু মিষ্টি নয়, চেহারাও সুন্দর। মেরির মুখের সঙ্গে বিশেষ মিল আছে। বাপ-মায়ের অনুপস্থিতিতে ছেলে-মেয়েরা মাসির অত্যন্ত অনুরক্ত হয়ে পড়ল।

সুতরাং আমেরিকা সফর শেষ করে দেশে ফিরে আসবার পরও কেট জর্জিকে যেতে দিতে পারলেন না। সে স্থায়ীভাবে রয়ে গেল এই পরিবারে। প্রথমে জর্জি সম্পর্কে ডিকেন্সের কোন আগ্রহ ছিল না। নিজের লেখা নিয়ে একটু বেশি মাত্রায় ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ মেয়েটিকে নাটকীয় ভাবে আবিষ্কার করলেন। ঘটনা কিছু নয়, একদিন জর্জিকে পিছন থেকে দেখে তাঁর মনে হল যেন মেরি। ডিকেন্স উত্তেজিত হয়ে উঠলেন। তারপর খুঁটিয়ে দেখতেই মেরির চেহারার সঙ্গে জর্জির সাদৃশ্য লক্ষ্য করলেন।

এই সাদৃশ্যের জন্য কিনা বুঝতে পারা যায় না, তবে এরপরই জর্জিকে ডিকেন্স ভালবেসে ফেললেন। আবার অন্য মানুষ হয়ে গেলেন তিনি। জর্জিও তাঁকে আন্তরিক ভালবেসেছিলেন একথা জোর দিয়ে বলার আজ উপায় নেই। তার চাপা চরিত্রকে সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন ব্যাপার ছিল। তবে ডিকেন্স তাকে নিজের করে পাবার যে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন জর্জি তাতে বাধা দেয়নি।

এইভাবে বহু বছর কেটে গেল।

ডিকেন্স পঁয়তাল্লিশের কোঠায় পৌঁছালেন। জর্জি এখনও আছে তাঁদের কাছে। সে আজকাল কেটকে সহ্য করতে পারে না। কেটের মনেও অসন্তোষ। পারিবারিক ঝামেলার মধ্যে ডিকেন্সের দিন কাটছে। বিস্ময়ের বিষয় এত ঝড়-ঝাপটা অতিক্রম করে চলেছেন অথচ লেখনীতে তার আঁচড় পর্যন্ত নেই—তেমনি স্নিগ্ধ, তেমনি অতুলনীয় রয়েছে। কিছুদিন পূর্বে "ডেভিড কপার ফিল্ড" প্রকাশিত হয়েছে। পরিচিতরা সকলেই জেনে ফেলেছেন উপন্যাসের "ডোরা" চরিত্রটি যে আর কেউ নয়, মেরিয়া ব্যাডনাল।

পঁয়তাল্লিশ বছর বয়সে ডিকেন্স আবার প্রেমে পড়লেন।

প্রেমের পাত্রীটি হলেন, অষ্টাদশী সুন্দরী অভিনেত্রী এলিন।

একথা চাপা রইল না বাড়িতে। কেন জানা যায় না— জর্জি এই ব্যাপারকে সমর্থন করলেন, কিন্তু আগুন হয়ে উঠলেন কেট। সংসারে অশান্তি চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেল। প্রত্যেকদিন একের পর এক বিরক্তিকর ঘটনা ঘটতে লাগল। পরিশেষে পরিস্থিতি এমন হয়ে দাঁড়াল যে, কুড়ি বছরের বিবাহিত জীবনের উপর যবনিকা না টেনে দিলেই নয়।

শেষ পর্যন্ত বিচ্ছেদ হয়েও গেল। স্থির হল ক্যামডেন টাউনের একটি পৃথক বাড়িতে কেট ছেলে-মেয়েদের নিয়ে থাকবেন। তাঁকে বছরে দেওয়া হবে ছ'শো পাউণ্ড। চাপ দিলেই আরো অর্থ পাওয়া যেত, কিন্তু সে পথ কেট কেন পরিহার করলেন তা বুঝতে পারা যায় না। বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হলে ডিকেন্স স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

কিন্তু তারপরও কি তিনি শান্তি পেয়েছিলেন?

সামারসেট মম লিখেছেন, "এতে বিন্দুমাত্র ভুল নেই যে, চার্লস ট্রিংহামের ছদ্মনামে (ডিকেন্স) পোকহামে একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে এলিনের সঙ্গে সেখানে থাকার ব্যবস্থা করেছিলেন।" এতে মনে হয় তিনি অভিনেত্রীর প্রেমে পড়েছেন একথা গোপন করা তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু খ্যাতির বিড়ম্বনা অনেক। এই অবৈধ প্রেম লীলার কথা অনেকেই জেনে ফেলেছিলেন।

ডিকেন্স এলিনকে ভালবাসলেও, সে তাঁকে ভালবাসতে পারেনি। দু'জনের বয়সের পার্থক্য ছিল অনেক। খ্যাতিমান ব্যক্তির সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে রাখার লোভ হয়ত সে সংবরণ করতে পারেনি। তাই ডিকেন্সকে প্রশ্রয় দিয়েছিল। তাঁর মনোভাব পরবর্তীকালে পরিষ্কার হয়েছে। এলিন তাঁর এক বন্ধুকে বলেছিল, আমার পক্ষে ডিকেন্সকে ভালবাসা কখনই সম্ভব ছিল না।

ডিকেন্স ক্রমে বুঝতে পেরেছিলেন। এলিন তাঁর সঙ্গে শুধু তাল রেখে যায় প্রকৃত পক্ষে তাঁকে ভালবাসে না। লেখক দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছেন। তখন তাঁর আর তো কোন করণীয় ছিল না। মান, সম্মান, অর্থ, প্রতিপত্তি সবই তাঁর আছে, নেই শুধু, তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসে এমন একটি হৃদয়। কেন এমন হল? এই প্রশ্ন ডিকেন্স বার বার করেছেন নিজেকে নিজেই। জীবনের বাকি ক'টা দিন তিনি মনের মধ্যে তীব্র হাহাকার বোধ নিয়েই কাটিয়ে গেছেন।

চার্লস ডিকেন্সের মৃত্যু হয় ১৮৭০ সালের ৯ই জুন। আটান্ন বছরের এই জনপ্রিয় লেখকের মৃত্যুর সময় কঠিন কোন রোগ হয়নি। কয়েক দিন সামান্য অসুস্থ থাকার পর চিকিৎসকদের হতবাক করে দিয়ে তিনি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন।

তাঁর মৃত্যুর পরও ষোল বছর বেঁচে ছিল মেরিয়া ব্যাডনাল। সগর্বে সে বলে বেড়াত, চার্লস ডিকেন্স আমায় ভালবেসে ছিলেন।

অতৃপ্ত প্রেমিক ডষ্টয়ভস্কি

যুবক ফিয়দোর মাথা নত করে দাঁড়িয়ে আছেন। এখন এইভাবে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া তাঁর আর কোন করণীয় নেই। বধ্যভূমিকে বেষ্টন করে রয়েছে সৈন্যরা। সৈন্যব্যুহের ওধারে লোকে .লাকারণ্য। লোকেরা এসেছে রাজনৈতিক বন্দীদের প্রাণদণ্ড দেখতে। হিংস্র উল্লাসে তাদের চোখ জ্বলছে। রাজকর্মচারী আসামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ পড়ে শোনাচ্ছিল। এক সময় ফিয়দোরের মধ্যে কিছু চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা গেল। তিনি শুনলেন, রাজকর্মচারী পড়ছে, ফিয়দোর মিখাইলোভিচ্ ডষ্টয়ভস্কিকে সম্রাট ও চার্চের বিরুদ্ধে প্রবন্ধ রচনা ও আপত্তিকর মতামত প্রচার করার অভিযোগে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত এবং সমস্ত সম্পত্তির অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হল। ডষ্টয়ভস্কির মুখে করুণ হাসি ফুটে উঠল। কোন রাজনৈতিক চক্রান্ত নয়, কোন রাজপুরুষকে হত্যা করেননি, এমন কি কাউকে হত্যা করার কোন পরিকল্পনাও করেননি শুধু নিজের স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করেছিলেন গুটি কয়েক রচনায়, এই অপরাধেই তিনি পৃথিবীতে থাকার অধিকার হারিয়েছেন।

এবার নির্দিষ্ট জায়গায় কয়েদিদের সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড় করান হল। কাঠের খুঁটির সঙ্গে প্রত্যেককে বেঁধে মোটা কাপড় দিয়ে মুখ ঢেকে দেওয়া হল। জীবনের উপর মমতা কার নেই? এই সঙ্গীন মুহূর্তে ডষ্টয়ভস্কির মন অব্যক্ত কান্নায় ভরে উঠল। কিইবা দেখলেন, কতটুকু কাজই বা করে যেতে পেরেছেন? অসীম বলে নিজেকে সংযত করে রাখলেন তিনি। মনের মধ্যে যে প্রবল ঝড় বইছে তা বিন্দুমাত্র প্রকাশ পেল না। তাঁর হাবভাব বা মুখোভঙ্গীতে সকলের মানসিক অবস্থা একরকম নয়। কেউ কেউ চিৎকার করে বিলাপ করতে আরম্ভ করেছে। আবার কেউ অকথ্য ভাষায় গালাগালি করছে রাজতন্ত্রকে।

সময় প্রায় হয়ে এল। সৈন্যরা বন্দুক উঁচিয়ে প্রস্তুত হয়ে রইল। উপরওয়ালার আদেশ পাবামাত্র তারা ট্রিগারে চাপ দেবে। আর একে একে প্রাণ মিশে যেতে থাকবে হাওয়ার সঙ্গে। ঠিক এই সময় সাদা রুমাল উড়িয়ে, দেবতার আশীর্বাদের মত জনতার মধ্য দিয়ে পথ করে দ্রুত পায়ে বধ্যভূমিতে এসে দাঁড়ালেন—একজন রাজকর্মচারী। তিনি জানালেন, সম্রাটের দয়া হয়েছে। বন্দীদের আর প্রাণদণ্ড হবে না। তবে মুক্তিও পাবে না কেউ। আসামীদের আট বছরের জন্য সাইবেরিয়ায়

নির্বাসিত করা হয়েছে। প্রথম চার বছর কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। পরের চার বছর দাসত্ব করতে হবে সৈন্যবাহিনীর।

কয়েদিরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কঠোর পরিশ্রম করতে হবে তাতে তাদের ক্ষোভ নেই, প্রাণরক্ষা পেয়েছে এই যথেষ্ট। ডষ্টয়ভস্কি কিন্তু কোন সান্ত্বনা খুঁজে পেলেন না। সাইবেরিয়ায় যারা যায় তারা কি কখনও ফিরে আসে? অসহ্য অত্যাচারে তিলেতিলে ওখানে মরার চেয়ে একটি বুলেটে মুহূর্তের মধ্যে সব শেষ হয়ে যাওয়া এখানে ভাল ছিল। কিন্তু তার মনোভাবকে গুরুত্ব দেবার জন্য এখানে কেউ বসে নেই। সুতরাং অন্যান্য কয়েদিদের সঙ্গে তাকেও যথাসময়ে দণ্ড ভোগ করতে সাইবেরিয়ায় চলে যেতে হল।

রাশিয়ার সম্রাট অনিচ্ছাকৃত ভাবেই এই সময় যে দূরদৃষ্টির পরিচয় দিয়েছিলেন তার জন্য পৃথিবীর সাহিত্য-রসিক সমাজ আবহমানই তাকে ধন্যবাদ জানিয়ে যাবেন। সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত না হয়ে যদি পূর্বের আদেশ মত ডষ্টয়ভস্কিকে গুলির সামনে বুক পেতে দিতে হত তাহলে বিশ্বসাহিত্যে যে ক্ষতি হয়ে যেত তা পূরণ হত না কোনদিন। আমরা মুগ্ধ বিস্ময়ে রসাস্বাদন করতে পারতাম না "ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিসমেণ্ট" 'ব্রাদার্স অফ কারামাজোভ", "দি ইডিয়ট" "দি গ্যাম্‌লার" ইত্যাদির। সুতরাং রাশিয়ার সেই সম্রাট সমস্ত দৃষ্টিকোণ থেকে কুখ্যাত হলেও এই ব্যাপারে ধন্যবাদ পাবার অধিকারী বইকি!

ফিয়দোর মিখাইলোভিচ্ ডষ্টয়ভস্কি ১৮২১ সালে জারতন্ত্র রাশিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। সোনার চামচ মুখে নিয়ে তিনি পৃথিবীতে আসেন নি। তাঁর বাবা একটি দাতব্য চিকিৎসালয়ের চিকিৎসক ছিলেন। অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির মানুষ ছিলেন তিনি। চার ছেলেমেয়ে ছাড়া, স্ত্রী, অধীনস্থ কর্মচারী ও প্রতিবেশীদের প্রতি তাঁর ব্যবহার ছিল অত্যন্ত রুক্ষ। কখনো কখনো আবার ভীষণ মনমরা হয়ে পড়তেন। পরবর্তী জীবনে ডষ্টয়ভস্কি বাবার এই স্বভাব পেয়েছিলেন।

সংসারে অশান্তি লেগে থাকতো। অভাবও ছিল নানারকম। মায়ের অবস্থার জন্য ডষ্টয়ভস্কি বেদনা বোধ করতেন। সহানুভূতির অন্ত ছিল না। কিন্তু দুর্দান্ত প্রতাপ বাবার সামনে মুখ ফুটে কিছু বলার সাহস হত না। তাঁর যখন পনেরো বছর বয়স মা মারা গেলেন ক্ষয়রোগে এবং বাবাও মারা গেলেন একদিন। স্বাভাবিক মৃত্যু তাঁর হয়নি। তাঁকে কোন অত্যাচারী লোক নির্মমভাবে হত্যা করে মৃতদেহ ঝোপের আড়ালে ফেলে গিয়েছিল। তখন ডষ্টয়ভস্কি ও তাঁর দাদা মাইকেল ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলে পড়ছেন।

শোক সামলে কোন রকমে পাশ করলেন। চাকরি পেতেও অসুবিধা হল না। কিন্তু এই অবস্থাকে মেনে নিতে মন চায় না ডষ্টয়ভস্কির। তিনি সাহিত্যকে

ভালবাসেন। অধিকাংশ সময় গল্প উপন্যাসের মধ্যেই ডুবে থাকেন। লিখছেনও কিছু কিছু। কাজেই বেশি দিন চাকরি করা চলল না। এর পর অত্যন্ত দুর্গতির মধ্যে দিন কেটেছে ডষ্টয়ভস্কির। নির্দিষ্ট আয় নেই। বাবার মৃত্যুর পর মৃগী রোগ তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছিল। এখন মাঝে মাঝে দুরন্ত আকারে তা দেখা দেয়। রোগা হয়ে গেছেন। সুশ্রী তিনি কোন দিন ছিলেন না, তবে এখন যেন আরো বিশ্রী দেখায়। বিমর্ষ থাকেন সব সময়।

তবু তাঁর কলম বন্ধ থাকে নি। শোচনীয় মানসিক অবস্থার মধ্যেই নিয়মিত লিখে গেছেন। ১৮৪৫ সালের মে মাসে 'পুওর ফোক" শেষ হল। প্রকাশিত হল বইখানি। হৈ হৈ পড়ে না গেলেও মোটামুটি আলোড়ন এল পাঠক মহলে। নতুন লেখককে অভিনন্দন জানালেন অনেকে। বিখ্যাত সমালোচক বেলেনস্কি প্রশংসা করলেন 'পুওর ফোকের"। এরপর প্রকাশিত হল আত্মজীবনীমূলক একটি উপন্যাস। ডষ্টয়ভস্কি সাহিত্য জগতে প্রবেশ লাভের অধিকারী হলেন।

প্রথম প্রেমও এল জীবনে এই সময়।

বই দু'টি প্রকাশিত হবার পর অভিজাত সমাজে মেলামেশা করবার সুযোগ এসে গিয়েছিল। এই সূত্রে পরিচিত হয়ে পড়েছিলেন বহু নামকরা লেখক ও শিল্পীর সঙ্গে। এবং অনেক সুন্দরী নারীর সংস্পর্শে এসেছিলেন তিনি। আভদোতিয়া তাদের মধ্যে একজন। সুন্দরী বলতে যা বোঝায় বাইশ বছরের আভদোতিয়ার শরীরের প্রতিটি স্তরে তা বিদ্যমান ছিল।

এই তরুণীকে দেখার পরই ডষ্টয়ভস্কি হৃদয় হারালেন।

আলাপ হল। তাকে ঘিরে সোনালি জাল বুনতে লাগলেন লেখক। তাকে কাছে পাবার জন্য উতলা হয়ে উঠলেন। কিন্তু কাজটি তেমন সহজ ছিল না। তাকে ঘিরে অনেক অভিজাত তরুণ কলগুঞ্জন করছে। প্রেম নিবেদনও করছে। যদিও আভদোতিয়া কুমারী নয়, বিবাহিতা তরুণী। প্রেম নিবেদনকারীদের মধ্যে পরবর্তী কালের প্রখ্যাত সাহিত্যিক তুর্গিনিভও ছিলেন। শুধু এই কারণেই বোধহয় আজীবন ডষ্টয়ভস্কি বিদ্বেষ পোষণ করে এসেছেন তুর্গিনিভের উপর।

বিশেষ সুবিধা করতে পারলেন না। একটা বিরামহীন জ্বালা ডষ্টয়ভস্কিকে পাগল করে তুলল। আভদোতিয়াকে একা পেয়েও তিনি নিজের মনের কথা বলতে পারেন না। আত্মপ্রত্যয় ও আত্মপ্রতিষ্ঠা না থাকায় রাজ্যের কুণ্ঠা তাঁকে মূক করে রাখে। সমাজের মক্ষিরাণী আভদোতিয়া বোধহয় সমস্তই বুঝতে পারে, কিন্তু মুখে কিছু প্রকাশ করে না। শেষে মরিয়া হয়ে ডষ্টয়ভস্কি নিজের মনের কথা বললেন তাকে। আভদোতিয়া কিছুই বলল না। হাসল শুধু। উপেক্ষার হাসি কি রকম হয় লেখকের তা অজানা ছিল না।

মন ভেঙে গেল তাঁর।

ডষ্টয়ভস্কি বুঝতে পারলেন তাঁর মত হীন অবস্থা ও হীন চেহারার লোকের পক্ষে চাঁদ ধরতে যাওয়া উচিত হয়নি। তাঁর প্রেম নিবেদন নিশ্চয় অসীম ধৃষ্টতার পরিচায়ক বলেই মনে হয়েছে আভদোতিয়ার। তাই মুখে কিছু না বলে, শুধু উপেক্ষার হাসি হেসে সে তাঁকে সচেতন করে দিয়েছে। এরপর স্বাভাবিক ভাবেই অভিজাত সমাজের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক ছিন্ন হল।

এক তরফা প্রেমপর্ব শেষ হলেও, ডষ্টয়ভস্কির মানসিক অবস্থার উন্নত হল না। শেষে এমন পরিস্থিতি দাঁড়াল যে, জীবন-যন্ত্রণা ভুলে থাকতে গিয়ে জুয়াড়ি হয়ে গেলেন। মদকে দূরে রাখলেও পণ্যনারীদের কাছে তাঁর যাতায়াত বৃদ্ধি পেল। শূন্য হৃদয়কে ভরিয়ে তোলার ক্ষমতা এদের নেই, কিছু অর্থের বিনিময়ে এরা শুধু লেখকের দেহের ক্ষুধা মিটিয়ে চলল।

এই রকম অবস্থাতেই তিনি রাশিয়ার সমাজবাদী দলের সংস্পর্শে এলেন। তাদের ভাবধারা তাঁকে আকর্ষণ করল। সমাজবাদী দলের প্রচারের জন্য লিখতে লাগলেন নানারকম রচনা। বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন এখানে ওখানে। তাঁর কার্যকলাপ রাজতন্ত্রের গোয়েন্দাদের চোখ এড়াল না। সম্রাটের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার অপরাধে তিনি গ্রেপ্তার হলেন। তারপর আরো অনেকের সঙ্গে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হল তাঁকে।

নাটকীয় ভাবে প্রাণরক্ষা পাবার পর ডষ্টয়ভস্কি গেলেন সাইবেরিয়ার ভয়ঙ্কর বন্দী শিবিরে। চারটি বছর সেখানে তাঁর কাটল নরক যন্ত্রণার মধ্যে। পশুর খাদ্য খেয়ে থাকতে হত। সমস্ত দিন প্রচণ্ড খাটুনির পরও একটু অন্যমনস্কতার দরুণ পিঠে পড়ত চাবুকের ওপর চাবুক। পিঠ ফেটে রক্ত গড়িয়ে পড়লেও সেদিকে দৃষ্টিপাত করত না শান্ত্রীরা।

অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে মারা পড়বেন, এই বিশ্বাস ছিল ডষ্টয়ভস্কির। কিন্তু বাস্তবে সে রকম কিছু হল না। চার বছর নরকে কাটিয়ে বাকি দণ্ডভোগের জন্য এলেন সেমিপালতিনস্কে। ছোট শহর। সৈন্য শিবিরে থাকতে হয়। এখানে সেই যন্ত্রণাদায়ক অবস্থা নেই। তাছাড়া স্বাধীনতাও আছে অনেক।

সেনাবাহিনীর অধ্যক্ষ বেলিকভ সুরুচি সম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি কি ভাবে জানতে পারলেন ডষ্টয়ভস্কি একজন লেখক। তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে আলাপ করলেন সেনাধ্যক্ষ। তারপর নিয়মিত দেখা হতে লাগল দু'জনের। ডষ্টয়ভস্কি খবরের কাগজ ও বই পড়ে শোনান তাঁকে। এখানেই আলাপ হল ইসায়েভ ও মারিয়ার সঙ্গে। স্বামী-স্ত্রী মাঝে মাঝে আসতো বেলিকভের বাড়িতে গল্পগুজোব করে সময় কাটাতে।

মারিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হলেন ডষ্টয়ভস্কি।

মারিয়া শিক্ষিতা ও সরুচিসম্পন্না নারী। মোটামুটি সুন্দরী তার জীবনের বর্তমান বিড়ম্বনার কথা ক্রমে শুনলেন ডষ্টয়ভস্কি। উন্মাদের মত মদকে আঁকড়ে আছে ইসায়েভ। তার স্বাস্থ্য নষ্ট হয়ে গেছে। এই নেশার জন্য চাকরি গেছে তার। সংসারের দায়-দায়িত্ব এখন সমস্ত মারিয়ার ঘাড়ে এসে পড়েছে। একটি ছেলে আছে, তার ভবিষ্যতের জন্যই এখন বেশি দুর্ভাবনা।

ইসায়েভের বাড়িতে ঘন ঘন যেতে লাগলেন ডষ্টয়ভস্কি। তাঁর দুর্দশার কথা শুনল মারিয়া। তার অনুভূতিপ্রবণ মন মমতায় ভরে উঠল। লেখকের ক্রমে ধারণা হল মারিয়াও বোধহয় তাঁর দিকে ঝুঁকেছে। কিন্তু মুখ ফুটে কোন কথাই তিনি বলতে পারেন না। স্বভাব আগেকার মতই রয়ে গেছে। অন্তরের আকুলতা সঙ্কোচের আবরণকে ভেদ করতে পারে না।

তবুও দিন ভালই কেটেছিল। নিজের মনের কথা বলতে না পারলেও, মারিয়াকে প্রতিদিন চোখের সামনে পাচ্ছেন এতেই সন্তুষ্ট ছিলেন ডষ্টয়ভস্কি। অবশ্য এই অবস্থা বেশি দিন রইল না। ইসায়েভ শহর থেকে বেশ কয়েক মাইল দূরে চাকরি পেল। স্ত্রী ও ছেলেকে নিয়ে সে চলে গেল তার কর্মস্থলে। যেটুকু আনন্দ জীবনে দেখা দিয়েছিল, একটি ফুৎকারে আগুন নিভে যাওয়ার মত মুহূর্তের মধ্যে তা কোথায় মিলিয়ে গেল। দারুণ হতাশ হয়ে পড়লেন ডষ্টয়ভস্কি।

যদিও মারিয়া যাবার আগে তাঁকে একটি জিনিস দিয়ে গিয়েছিল। তা আর কিছু নয়, ভালবাসার স্বীকৃতি। চিঠিপত্রের আদান-প্রদান চলতে লাগল। মারিয়ার কাছ থেকে কখনও যদি চিঠি আসতে বিলম্ব হয়, অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে পড়েন তিনি। অনুযোগ করে আবার চিঠি দেন। এইভাবেই দিন কাটছিল। কিছুদিন পরে বদ্ধ মাতাল ইসায়েভ মারা গেল।

এই মৃত্যুকে ডষ্টয়ভস্কি দেবতার আশীর্বাদ বলে মনে করলেন। তাঁর ও মারিয়ার মধ্যে আর তো বাধা রইল না। মারিয়া যখন তাঁকে ভালবেসেছে তখন বিয়ের ব্যাপারে আর বিলম্ব করা উচিত নয়। শহর ছেড়ে বাইরে যাবার আইন নেই, মুখোমুখি কোন কথা বলার সুযোগ ডষ্টয়ভস্কি পেলেন না। অগত্যা চিঠিতেই বিয়ের কথা লিখতে হল তাঁকে।

সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল মারিয়া। অভাবের তাড়নায় সে অস্থির। কিছু টাকা চেয়ে পাঠিয়েছে, কিন্তু বিয়ের ব্যাপারে কিছুই লেখেনি। ডষ্টয়ভস্কি কোনরকমে ধার করে কিছু টাকা পাঠালেন। বিষয় উল্লেখ করে আবার চিঠি দিলেন। উত্তর এল। এই চিঠিতেও মারিয়া ওবিষয়ের কোন উল্লেখ করেনি। ব্যাপার কি! মারিয়া কি তার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে চায় না? তাই যদি হবে তবে চিঠির উত্তর দিয়ে যাচ্ছে কেন?

তবে এই চিঠি নিতান্ত সৌজন্যমূলক? মারিয়া অন্য কারুর সঙ্গে মন দেওয়া নেওয়ার জন্য মেতেছে?

সদা বিমর্ষ ডষ্টয়ভস্কি অতিমাত্রায় বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

কয়েক দিনের মধ্যেই মনোস্থির করে ফেললেন। তাঁকে মারিয়ার কাছে একবার যেতেই হবে। যেতে গেলে আইন অমান্য করতে হয়। শেষে সরকারি কাজের ছুতাতেই শহরের বাইরে এলেন। তাঁকে দেখে মারিয়া বিস্ময়ে ভেঙ্গে পড়ল। তারপর তাকে কেমন অসহায় দেখাতে লাগল।

ডষ্টয়ভস্কি নিজের কোন সঙ্কোচকে প্রশ্রয় দেবেন না আগেই স্থির করে এসেছিলেন। তিনি জানতে চাইলেন, কেন মারিয়া তার চিঠিতে লেখা একটি কথা বার বার এড়িয়ে গেছে?

মারিয়া কাঁপা গলায় বলল, উপায় ছিল না—তোমাকে দেবার মত আমার আর কিছুই নেই।

—তুমি কি বলতে চাইছো?

—আমি আরেকজনকে ভালবেসে ফেলেছি।

স্তব্ধ হয়ে ডস্টয়ভস্কি শুনলেন। তাঁর ধারণাই সত্য প্রমাণিত হল। প্রতিপক্ষের কাছে আবার হেরে গেলেন। তিনি আরো শুনলেন, প্রেমিকটির সঙ্গে একই জায়গায় ইসায়েভ কাজ করতো। সে স্বাস্থ্যবান ও সুপুরুষ। চব্বিশ বছরের সেই পুরুষ ত্রিশ বছরের মারিয়াকে ভালবেসেছে।

তাদের বিয়ে হতে আর বিশেষ বিলম্ব নেই।

এতদিন ধরে মনের মধ্যে মারিয়াকে ঘিরে যে পরিকল্পনা ডষ্টয়ভস্কি লালন করেছিলেন তার আর কোন মূল্য রইল না। কোন অভিযোগ জানালেন না। কোন আক্ষেপ করলেন না। কি লাভ?

বললেন, নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত হতে পেরেছো। এটা সুখের কথা। ঈশ্বর তোমাদের মঙ্গল করুন।

মনের মধ্যে প্রবল ঝড় নিয়ে তিনি ফিরে এলেন সামরিক শিবিরে। মারিয়ার কাছে কোন অভিযোগ না জানালেও ঈশ্বরের কাছে অভিযোগ ছিল। কেন তিনি এইভাবে বঞ্চিত হচ্ছেন বারংবার? কেন তাঁর জীবন আর দশজনের মত সরল খাতে রইল না? কেন তিনি রূপবান নন, স্বাস্থ্যবান নন?—কেন—কেন?

অবশ্য এবারও তাঁর প্রতি ঈশ্বর সদয় হলেন। অল্পদিনের মধ্যেই তার প্রমাণ পাওয়া গেল। কোন অভিযোগ ও নিজের স্বপক্ষে কোন কথা না বলেই ডষ্টয়ভস্কি চলে যাবার পর মারিয়ার স্পর্শকাতর মন হু-হু করে উঠল। সে বুঝতে পারল তাঁর ভালবাসা কত গভীর, কত পবিত্র। তাঁর পরিবর্তে তার নতুন প্রেমিক কেমন

মূল্যহীন হয়ে পড়ল। মারিয়ার মনে হতে লাগল, চব্বিশ বছরের ওই তরুণটির ভালবাসায় কোন আন্তরিকতা নেই, সে তার দেহটি শুধু অধিকার করতে চায়।

তাছাড়া চেহারার কথা বাদ দিলে, ডষ্টয়ভস্কির যোগ্যতা সম্পর্কে কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। তাঁর এই কারাজীবন কিছুমাত্র কলঙ্কের নয়। তিনি চুরি, ডাকাতি বা খুন করে সাইবেরিয়ায় আসেননি। যারা সর্বহারা, যারা অত্যাচারিত তাদের বক্তব্য তুলে ধরবার চেষ্টা করেছিলেন—এই তাঁর অপরাধ।

সাইবেরিয়ায় তাঁর দিন শেষ হয়ে আসছে। আবার ফিরে যাবেন বৃহত্তর জন-জীবনে সাহিত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে। তারপর বেশি সময় নেবে কি? মারিয়া ক্ষণিকের মোহকে ঝেড়ে ফেলে নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিশ্চিত হল।

মারিয়ার সম্মতি পেলেন ডষ্টয়ভস্কি। আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। হবারই কথা, জীবনে এরচেয়ে বড় সুখবর তিনি আর কখনো পাননি। তাছাড়া তাঁর সমস্ত অভিমান ধুয়ে গেল। একটি নারীর হৃদয় জয় করার কৃতিত্ব এখন তাঁর। বিয়ে হয়ে গেল।

তাঁর ক্ষমতা অল্প। বিয়ের অনুষ্ঠানে বিশেষ সমারোহ হল না। অতি পরিচিত কয়েকজন নিমন্ত্রিত হয়ে এলেন মাত্র। রাত গভীর হবার আগেই অতিথিরা বিদায় নিলেন। ঘরে তখন মাত্র দু'জন—মারিয়া ও ডষ্টয়ভস্কি। দু'জনের মুখেই হাসি। এই রাতটি মধুরতর করে তোলার অনেক রঙ্গীন পরিকল্পনা করে রেখেছেন লেখক। অবশ্য তাঁর জানা ছিল না, বিধাতা হাসছিলেন অলক্ষ্যে বসে। মারিয়াকে সম্পূর্ণ করে পাবার পূর্বমুহূর্তে এক বিয়োগান্ত ঘটনা ঘটে গেল। এই বিয়োগান্ত ঘটনাই তাঁদের বিবাহিত জীবন কে বিষিয়ে তুলল আবহমানের জন্যে।

ঘটনাটি গুরুতর কিছু নয়, তবু—

নিজের সাফল্যে অসম্ভব উত্তেজনা বোধ করেছিলেন ডষ্টয়ভস্কি। মারিয়ার নিকটবর্তী হলেন। তাঁর দু'চোখের কানায় কানায় স্নিগ্ধ কামনা টলটল করছে। তিনি কি তাকে পরিপূর্ণ দৈহিক তৃপ্তি দিতে পারবেন? মারিয়াকে কাছে টেনে নেবার পরই তারই স্নায়ু কেমন দুর্বল হয়ে পড়ল, তিনি গড়িয়ে পড়লেন বিছানা থেকে নিচে। মারিয়া ভয় পেয়ে গেল। লেখক তখন অজ্ঞান।

চিকিৎসককে ডাকা হল। তিনি এসে রোগীকে পরীক্ষা করে বললেন, মৃগীরোগ। এর পরই মারিয়ার সমস্ত সুখস্বপ্ন ভেঙ্গে গেল। কেমন ধিক্কার এল নিজের উপর। এই রকমের অসুস্থ মানুষ নিয়ে জীবন কাটাতে হবে? মারিয়ারও শরীরে যে কঠিন রোগ বাসা বেঁধে রয়েছে। সে কথা তখন তার জানা ছিল না।

একই বাড়িতে দু'টি অসুখী মানুষের জীবনযাত্রা আরম্ভ হল। সামরিক কর্তৃপক্ষর কাছ থেকে অল্প কিছু অর্থ পান ডষ্টয়ভস্কি। তাতে সংসারের সমস্ত প্রয়োজন মেটে না। অভাব অভিযোগ আরো ক্ষিপ্ত করে তোলে মারিয়াকে। সংসারে শান্তি নেই।

কথায় কথায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তুমুল বিবাদ হয়। ডষ্টয়ভস্কি আবার সেই বিমর্ষ ভাব ফিরে পেয়েছেন। মারিয়াকে পেয়েও পাচ্ছেন না এ আক্ষেপ এখন কা'কে জানাবেন? অন্যমনস্ক থাকার জন্য লেখা আরম্ভ করেছেন। মনকে যতদূর দৃঢ়বদ্ধ করে লিখে চলেন।

তাঁর শাস্তির মেয়াদ শেষ হল।

মারিয়াকে নিয়ে তিনি এলেন রাশিয়ায়। মস্কোর কিছু দূরে বাসা বাঁধলেন। বলা বাহুল্য অভাব আগের মতোই রইল। শহরের পরিচ্ছন্ন, বিলাসবহুল জীবনের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন দু'জনে। জীবনের ধারে কাছে যাবার সাধ্য নেই। সাধ্য নেই বলে অশান্তি আরো গুরুতর আকার নিতে থাকে দু'জনের মধ্যে।

আরো একটি ব্যাপারে ডষ্টয়ভস্কি অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। মারিয়ার শরীরে ক্ষয় রোগের লক্ষণ আগেই প্রকাশ পেয়েছিল। এখানে আসবার পর তা গুরুতরভাবে দেখা দিল। চিকিৎসা করার পয়সা নেই। দিন দিন মারিয়ার শরীর খারাপ হতে লাগল। ডষ্টয়ভস্কি সাধ্যমত তার সেবা করেন। মনের অবস্থা শোচনীয়। তবু লেখা ছাড়েন না। অবিরাম লিখে চলেন।

ক্রমে বড় ভাই মাইকেলের সহযোগিতায় একটি সাহিত্য পত্র প্রকাশ করলেন। এতেই তাঁর "নোটস ফ্রম দি হাউস অফ দি ডেড" ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশিত হল। এই রচনাটি তাঁর প্রাথমিক প্রতিষ্ঠায় প্রচুর সহযোগিতা করেছে। সাইবেরিয়ার বন্দীজীবনের মর্মান্তিক কাহিনী তিনি উপন্যাসটিতে বিবৃত করেছেন।

প্রগতিশীল ছাত্রমহলে তিনি জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন। প্রায়ই তারা তাদের বৈঠকে তাঁকে সমাদরে নিয়ে যায়। ডষ্টয়ভস্কি সেখানে গিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেন। গল্প পড়ে শোনান। এইরকম এক আসরে অ্যাপোলি নারিয়াকে তিনি প্রথম দেখলেন। বছর তেইশের সুন্দরী তরুণী। এখনও তার পাঠ্যজীবন চলেছে।

ডষ্টয়ভস্কি আবার নতুন করে হৃদয় হারালেন। তাঁর মনে হতে লাগল এমন সপ্রতিভ, এমন প্রাণোচ্ছল মেয়ে আগে তিনি দেখেন নি। তার পুরো নাম অ্যাপোলি নারিয়া সুশ্লভা। সুশ্লভা ডষ্টয়ভস্কির অনেক লেখা পড়েছে। লেখকের প্রতি তার গভীর শ্রদ্ধা। গল্প লেখার কথা নিয়েই তার সঙ্গে লেখকের আলাপের সূত্রপাত হল। সুশ্লভা কয়েকটি গল্প লিখেছে। ডষ্টয়ভস্কিকে অনুরোধ করেছে সেগুলিকে সংস্কার করে দিতে। সানন্দে সম্মত হয়েছেন তিনি। অল্প আলাপেই তিনি তখন বুঝে ফেলেছেন, এই নারী পুরুষের সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে মেটাতে পারবে। পারিবারিক চিন্তায় মুহ্যমান ও অভাব জর্জরিত ডষ্টয়ভস্কি সমস্ত কিছু ভুলে সুশ্লভার প্রেমে নিজেকে ডুবিয়ে দিলেন।

প্রায় দেখা-সাক্ষাৎ হতে লাগল। প্রথমেই অবশ্য সুশ্লভা তাঁর সঙ্গে প্রেমের

সম্পর্ক স্থাপন করেনি। আলোচনা সাহিত্যের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত। মন আকুল হয়ে উঠলেও ডষ্টয়ভস্কি কিছু বলতে পারতেন না। মনে পড়ে যেত তাঁর শারীরিক দৈন্যতার কথা। তাঁর ডাকে যদি ও সাড়া না দেয়। যদি অবজ্ঞার হাসি হাসে?

সুশ্লভার কয়েকটি গল্প তিনি প্রকাশের ব্যবস্থা করে দিলেন। সুশ্লভার মনেও ধীরে ধীরে পরিবর্তন আসতে লাগল। লেখকের প্রতি নিজের গভীর শ্রদ্ধাকে সে ভালবাসে বলে ভুল করল। বিস্ময়ের বিষয় হলেও একথা সত্য যে, আজ পর্যন্ত সে কারুর প্রেমে পড়ে নি। সুতরাং প্রেম সম্বন্ধে তার কোন অভিজ্ঞতাই ছিল না। সুশ্লভার মনোভাব প্রকাশ হয়ে পড়তেই ডষ্টয়ভস্কি নিশ্চিন্ত হলেন। আত্মপ্রত্যয়বোধ মনের মধ্যে জাগ্রত হল। অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই তাঁদের আলোচনা থেকে সাহিত্য চর্চা বাদ পড়ে গেল। ডষ্টয়ভস্কির অভিজ্ঞ প্রভাবে পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, সুশ্লভা স্বেচ্ছায় তাঁকে দেহ দান করল।

মারিয়া অনাদৃত হয়ে পড়ে থাকে। ডষ্টয়ভস্কি আগেকার মত আর তার সেবায় তৎপর হলেন না। বাড়িতে আজকাল থাকেনই বা কতটুকু। মারিয়া দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলতে ফেলতে অনুভব করে, পৃথিবীতে তার দিন ফুরিয়ে এসেছে। সুশ্লভা ও ডষ্টয়ভস্কির অবৈধ মেলামেশার কথা চাপা থাকে না। পরিচিত মহলে এই রসাল বিষয় নিয়ে আলাপ আলোচনা চলতে থাকে। দু'জনেই অস্বস্তিবোধ করতে লাগলেন। শেষপর্যন্ত তাঁরা স্থির করলেন, সমস্ত যখন জানাজানিই হয়ে গেছে তখন দু'জনে আর কিছু ঢাকবার চেষ্টা করবেন না। ফ্রান্স বা ইতালিতে বেড়িয়ে আসবার পরিকল্পনা করলেন দু'জনে।

যাত্রার আয়োজন শেষ হল। নির্দিষ্ট দিনে সুশ্লভা যাত্রা করল কিন্তু ডষ্টয়ভস্কি পারলেন না। সৈনিক প ত্রে একটা প্রবন্ধ লিখেছিলেন, সরকার পক্ষের ধারণা হল তাঁদের কটাক্ষ করা হয়েছে। কৈফিয়ৎ দিয়ে ব্যাপারটাকে মিটিয়ে ফেলতে কয়েক দিন সময় লেগে যাওয়া স্বাভাবিক। যখন যাত্রা করলেন তখন সুশ্লভা প্যারিসে পৌঁছে গেছে।

ডষ্টয়ভস্কির কাছে টাকা বেশি ছিল না। সুশ্লভার সঙ্গে প্যারিসে আরাম করে থাকতে গেলে বেশ কিছু টাকার প্রয়োজন। সরাসরি প্যারিসে না গিয়ে তাই ওয়াইসব্যাডেনে আসলেন। জুয়া খেলার জন্য এই শহরটি সমস্ত ইউরোপের মধ্যে বিখ্যাত। যদি জুয়ায় টাকার অঙ্কটা বাড়িয়ে নেওয়া যায় মন্দ কি?

ভাগ্য প্রসন্ন ছিল। কয়েকদিন ওখানে থেকে গেলেন। খেলায় বেশ কিছু টাকা জিতে নিলেন। আনন্দিত মনে প্যারিসে পৌঁছালেন। সুশ্লভার কোথায় উঠেছে তাঁর জানা ছিল। এখানে পৌঁছাতেই তার সঙ্গে দেখা হল তাঁর। তিনি লক্ষ্য করলেন, সুশ্লভা সাগ্রহে গ্রহণ করল না তাঁকে। তার কেমন যেন অন্যমনস্ক ভাব।

কি হল আবার!

ডষ্টয়ভস্কির বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা পড়তে লাগল। তাঁকে কোন প্রশ্ন করবার সুযোগ দিল না সুশ্লভা। নিজের মনের কথা প্রকাশ করল বেশ সহজ ভাবেই।

—তুমি বেশ দেরি করে ফেলেছো। একা এতদিন এখানে আমি থাকতে চাইনি। তুমি কাছে থাকলে বোধহয় এরকমটা হত না।

—কি বলতে চাইছো?

—আমি এখানে একজনকে ভালবেসে ফেলেছি।

ডষ্টয়ভস্কি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। অবশ্য তাঁর ভাগ্যে যে এই রকমই ঘটবে তাতো তাঁর অজানা নয়। কাঁপা গলায় প্রশ্নটা ফিরিয়ে দিলেন—ভালবেসে ফেলেছ?

—হাঁ, সালভাদোর একজন স্প্যানিশ।

সুশ্লভার নতুন প্রেমিকটির সম্পর্কে আরো অনেক কথা জানা গেল। সালভাদোর প্যারিসে এসেছে ডাক্তারি পড়তে। স্বাস্থ্যবান সুশ্রী তরুণ। প্রথম দর্শনেই তাকে ভালবেসে ফেলেছে সুশ্লভা। ভালাবাসার ডাকে সাড়া দিতে সালভাদোর বিলম্ব করেনি। পরাজিত ডষ্টয়ভস্কি ফিরে এলেন নিজের হোটেলে। কান্নার আবেগে তাঁর শরীর তখন কাঁপছে। নতুন করে আবার তাঁর মনে পড়ল, কোন মেয়ে তাঁকে ভালবাসতে পারে? তাঁর স্বাস্থ্য নেই, যৌবন নেই, কমনীয়তা নেই। সালভাদোরের মত তরুণদের সব আছে। তাদের জন্যই তো সুশ্লভার মত মেয়েদের জন্ম।

প্যারিসের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল।

এবার কি তিনি ফিরে যাবেন রাশিয়ায়?

সুশ্লভার ভুল ভাঙল কয়েকদিনের মধ্যেই। সালভাদোর তাকে ভালবাসেনি, ভালবেসেছিল তার দেহকে। খেয়াল খুশিমত তার দেহকে ব্যবহার করে একদিন সে সরে পড়ল। বিপর্যস্ত মনের অবস্থা নিয়ে সুশ্লভা নিজের আস্তানায় পড়ে রইল। ডষ্টয়ভস্কি দু'হাত বাড়িয়ে তাকে গ্রহণ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে রয়েছেন একথা জেনেও তাঁর কাছে গেল না।

ডষ্টয়ভস্কি সমস্তই শুনেছিলেন। তার বিপদের দিনে চুপ করে থাকতে পারলেন না। প্যারিস থেকে বিদায় নিলেন তাকে সঙ্গে নিয়ে। দু'জনে এলেন ব্যাডেন ব্যাডেনে। এই শহরটিও জুয়া খেলার এক বিরাট কেন্দ্র। যা টাকা ছিল এখানে খেলে সমস্ত হেরে গেলেন ডষ্টয়ভস্কি। এমনকি নিজের গায়ের শার্টটিও তাঁকে বাজিতে খোয়াতে হল। একেবারে নিঃস্ব অবস্থা। একা থাকলেও কথা ছিল, সঙ্গে সুশ্লভা রয়েছে, অবিলম্বে টাকার প্রয়োজন।

তুর্গিনিভ তখন ওখানেই ছিলেন। পুরানো বিদ্বেষ ভুলে তাঁর কাছে যাওয়া ছাড়া আর উপায় রইল না। সমস্ত শুনে টাকা ধার দিলেন তুর্গিনিভ। ডষ্টয়ভস্কি সুশ্লভাকে নিয়ে ওখান থেকে যাত্রা করলেন। ইউরোপের বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়ালেন

দু'জনে। এত কাছাকাছি থেকেও পূর্বের মত আর তিনি সুশ্লভাকে পরিপূর্ণভাবে পেলেন না। সে নিজেকে অসম্ভব প্রচ্ছন্ন করে রেখেছে। পুরুষের বিশ্বাসঘাতকতাতে, হয়ত তার এই পরিবর্তন। অনেক অনুযোগ, অনেক সাধ্যসাধনা করেছেন ডষ্টয়ভস্কি। কোন ফল হয়নি। পূর্বের অনুরাগ নিজের মনে নতুন করে সঞ্চারিত করতে সে অনিচ্ছুক। এমনকি যৌন সম্পর্ক স্থাপনেও সে আর পূর্বের মত উৎসাহ বোধ করে না। হাজার বার চাইলে লোকে যেমন ভিক্ষুককে পয়সা দেয়, ঠিক সেই ভাবে মাঝে মধ্যে একটু অনুগ্রহ করে মাত্র।

সুশ্লভার মনের ভাব শেষ পর্যন্ত হয়ত ডষ্টয়ভস্কি বুঝতে পেরেছিলেন। সে তাঁর ও সালভাদোরের মধ্যে কোন পার্থক্য খুঁজে পাচ্ছে না। সালভাদোর তার দেহকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলে একদিন পালিয়েছে। তিনিও ছিনিমিনি খেলে চলেছেন। কই, স্ত্রীকে ত্যাগ করে তাকে বিয়ে করবার প্রস্তাব তো একবারও করেন নি? ডষ্টয়ভস্কির সুনাম ছাড়া আর কি আছে। সে নিজের ভরা যৌবন নিয়ে তাঁর কাছে পড়ে রয়েছে। অথচ একটু তৎপর হলেই তার যৌবন আর সৌন্দর্যের হাতছানিতে কত বিত্তশালী, রূপবান পুরুষ সাড়া দেবে। ডষ্টয়ভস্কি দু'জনের মধ্যেকার সম্পর্ককে আর দীর্ঘতর করে তোলার কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পেলেন না। এই ভাবে দিন কাটানোর চেয়ে ছাড়াছাড়ি হয়ে যাওয়াই ভাল।

ছাড়াছাড়ি হলও। ডষ্টয়ভস্কি ফিরে এলেন রাশিয়ায়।

এইভাবে তাঁর জীবন থেকে হারিয়ে গেল সুশ্লভা। তবে মন থেকে একেবারে সে হারিয়ে যায়নি। পরবর্তী জীবনে তার প্রমাণ লেখক দিয়েছেন, তাঁর বিখ্যাত "ক্রাইম অ্যাণ্ড পানিসমেণ্ট" উপন্যাসে। উপন্যাসের "দুনিয়া" চরিত্রটি আর কেউ নয়, সুশ্লভা। আরো কয়েকটি উপন্যাসে তার চরিত্রের ছায়া পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়।

রাশিয়ায় ফিরে এসে ডষ্টয়ভস্কি দেখলেন মারিয়া মৃত্যুশয্যায়। তাঁকে দেখে ঘৃণায় মুখ ফিরিয়ে নিল সে। স্বামী এই ঘৃণা মাথা পেতে নিলেন। এটা তাঁর প্রাপ্য। স্ত্রীর সেবা করেন আর নতুন উপন্যাসটি লিখতে থাকেন ধীরে ধীরে। মারিয়া যেন তাঁর ফিরে আসার অপেক্ষায় ছিল। ১৮৬৪ সালের এপ্রিল মাসে সে ডষ্টয়ভস্কিকে মুক্তি দিয়ে চলে গেল।

অবশ্য মারিয়ার মৃত্যুর পর, দায়মুক্ত হয়েই তিনি সুশ্লভার কাছে ছুটে গিয়েছিলেন। এখন আর কোন বাধা নেই, তিনি সহজেই বিয়ে করে তাকে ঘরে আনতে পারেন। সুশ্লভা কিন্তু তাঁর প্রস্তাব যথানিয়মে প্রত্যাখান করল।

গড়িয়ে গেছে দু'টি বছর আরো।

ডষ্টয়ভস্কির নাম চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। তবে স্বভাবের দোষে নিজেকে

ঠিক ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে এখনও পারেন নি। এই বছরই এক অসুবিধার মুখোমুখি দাঁড়াতে হল তাঁকে। এক প্রকাশকের কাছ থেকে তিন হাজার রুব্‌ল নিয়েছিলেন। কথা ছিল ১৮৬৬ সালের ১লা নভেম্বরের মধ্যে প্রকাশককে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি দিতেই হবে। গড়িমসি করার দরুণ ডষ্টয়ভস্কি উপন্যাসটি লিখে উঠতে পারেন নি। এদিকে সময় বিশেষ নেই। অক্টোবর মাস প্রায় এসে গেল। লেখক বেশ ভাবনায় পড়ে গেলেন। নিজের উপর বিরুক্তও হলেন। এক মাসের মধ্যে কোন মতেই উপন্যাস লিখে ওঠা সম্ভব নয়। এই বিপদ থেকে উদ্ধার পাবার কোন উপায় আছে কিনা জানতে চাইলেন বন্ধু-বান্ধবের কাছে।

একজন বললেন, উপায় একটা আছে। একজন স্টেনোগ্রাফার বহাল কর। তুমি বলে যাবে, সে লিখতে থাকবে। উপন্যাস তাড়াতাড়ি শেষ হতে বাধ্য।

এই প্রস্তাব পছন্দ ডষ্টয়ভস্কির।

অনেক অনুসন্ধানের পর স্টেনোগ্রাফার পাওয়া গেল। মধ্যবিত্ত ঘরের মেয়ে অ্যান। খুঁটিয়ে দেখলে তাকে কেউ সুন্দরী বলবে না। তবে চেহারায় চটক আছে। পুরুষের মনে হিল্লোল জাগাতে পারে সহজেই। তবে তার চোখের দিকে তাকালেই বুঝতে পারা যায় পদে পদে নিজেকে সস্তা করে দেবার প্রবৃত্তিকে সে ঘৃণা করে।

চাকরির প্রয়োজন অ্যানের ছিল। কিছুদিন থেকেই নিজের মনের মত একটা চাকরির অনুসন্ধান সে করছিল। ডষ্টয়ভস্কির প্রয়োজনে উমেদার হয়ে দাঁড়াবার অর্থ কিন্তু শুধু চাকরি সংগ্রহের জন্য নয়। অ্যান তাঁর রচনার সঙ্গে পরিচিত ছিল। লেখকের প্রতিভা তার মনে রেখাপাত করেছিল গভীর ভাবে। এই বিদগ্ধ প্রতিভার ছোঁয়া পাবে এই আশাতেই সে উপস্থিত হয়েছিল তাঁর কাছে। তার আশা ফলবতী হল। অ্যানের শান্ত স্বভাব দেখেও মার্জিত কথাবার্তা শুনে তাকেই মনোনিত করলেন ডষ্টয়ভস্কি।

১৮৬৬ সালের ৪ঠা অক্টোবরে অ্যান যোগ দিল কাজে।

ডষ্টয়ভস্কি সময় অপচয় করলেন না। ডিক্টেশন দিতে আরম্ভ করলেন। দ্রুত হাতে নোট করে যেতে লাগল অ্যান। "দি গ্যাম্বলার" শেষ হল ২৯ শে অক্টোবর। এই ছাব্বিশ দিনে অ্যান পঞ্চাশ হাজার শব্দ নোট করেছিল।

উপন্যাসটি শেষ হলে আরামের নিঃশ্বাস ফেললেন লেখক। অনেক বড় দায় থেকে উদ্ধার লাভ করেছেন তিনি। ধূর্ত প্রকাশক তাঁকে আর বেকায়দায় ফেলতে পারল না। অ্যানের কাজ শেষ হয়েছে। এখন তার বিদায় নেবার পালা। কিন্তু লেখকের কাছ থেকে সরে যেতে মনে চাইছে না।

ডষ্টয়ভস্কির মত মহান লেখক যে কত অভাব অনটনের মধ্যে দিন অতিবাহিত করেন, এই কয়েক দিন যাওয়া আসাতেই অ্যান তা বুঝতে পেরেছে। কখনও

কখনও তাঁকে সংসারের সামান্যতম জিনিষপত্র বিক্রি করেও আহার্য বস্তু সংগ্রহ করতে হয়। অথচ আয় তাঁর মন্দ নয়। সমস্ত চলে যায় জুয়ায়। সংসার পরিচালনা করবারও কেউ নেই।

ডষ্টয়ভস্কির অসহায় অবস্থা মনে মনে উপলব্ধি করেছে অ্যান। মমতায় তার মন কানায় কানায় পূর্ণ। কখনও কখনও লেখক তার কাছে স্মৃতিচারণ করেছেন। শুনিয়েছেন নিজের জীবনের দুঃখ দুর্দশার কথা। হতাশ প্রেমের কথা। দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বলেছেন, শেষ জীবনটা সুখে কাটাবো এই আশা ছিল তাও সফল হবার কোন সম্ভাবনা দেখছি না!

অ্যান একদিন বলল, আবার বিয়ে করলেই তো পারেন?

হাসলেন ডষ্টয়ভস্কি! করুণ হাসি।

—এখন আর আমায় কে বিয়ে করবে বল?

—এমন কি কেউ নেই?

অ্যান আশা করেনি এমন একটা কথা এবার বলবেন লেখক, কার কাছে আমি যাব? তুমি আমাকে বিয়ে করবে অ্যান!

কথাটা বলে ফেলার পরই ডষ্টয়ভস্কির মন অনুশোচনায় ভরে উঠল। কেন বললেন একথা? তিনি কি জানেন না, তাঁর বুভুক্ষু মনের উপর প্রেমের প্রলেপ দিতে কোন মেয়ে এগিয়ে আসবে না। এগিয়ে আসেব না তার বিশ্রী চেহারা দেখে, এগিয়ে আসবে না তার হীন স্বাস্থ্য ও যৌবন উত্তীর্ণ লক্ষ্য করে। বারবার প্রত্যাখ্যাত হয়েছেন তবু ভিখারীর মত দীনতা স্বীকার করতে উন্মুখ। নিজের এই স্বভাবের জন্য সময় সময় নিজের উপরই বিরক্ত হন ডষ্টয়ভস্কি।

কিন্তু অ্যান ও সুশ্লভার মধ্যে পার্থক্য অনেক। মস্তিষ্ক নিয়ে কারবার করলেও তা বুঝতে পারেন নি লেখক। তার মনের গঠন অনেক উন্নত।

ডষ্টয়ভস্কির প্রস্তাব শুনে সচকিত হয়ে উঠল অ্যান। এরকম আশা করেনি। এ তার সৌভাগ্য। বিরাট প্রতিভার সঙ্গে তার জীবন একাকার হয়ে যাবে। আগামী দিনে অ্যানের নাম ভেসে যাবে না লক্ষ লক্ষ মেয়ের নামের জোয়ারে।

অ্যান ধীর গলায় বলল, এ আমার সৌভাগ্য!

বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছালেন ডষ্টয়ভস্কি।

—কিন্তু আমার বয়স!

—বয়স কোন প্রতিবন্ধক নয়। আমি তোমাকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত ভালবাসব।

অনেক দিন পরে আরামের নিঃশ্বাস ফেলার অবকাশ পেলেন ডষ্টয়ভস্কি। কিন্তু এই সংবাদ প্রচারিত হবার পরই দু'পক্ষের আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধু-বান্ধব আপত্তি

তুললেন। নানা রকম যুক্তি তর্কের অবতারণা করলেন। এ সমস্ততে কর্ণপাত করলেন না পঁয়তাল্লিশ বছরের পাত্র ও অতি তরুণী পাত্রী। বিয়ে হয়ে গেল।

বিয়ে হবার পর অনাবিল আনন্দে দিন কাটবে ভেবেছিলেন ডস্টয়ভস্কি। কিন্তু প্রথম কিছুদিন তা হল না। একটা অস্বস্তি তাঁকে ঘিরে রইল। কোন সাহিত্যবাসরে, কোন পার্টিতে অ্যান কারুর সঙ্গে মেলামেশা করলেই বুকের মধ্যে জ্বালা অনুভব করেন। সেই ব্যক্তির সঙ্গে নিজের চেহারার তুলনা করে দেখেন। তাঁর ভয় হয়, অ্যান হয়ত তাঁকে একদিন ছেড়ে চলে যাবে। ক্ষণিকের দুর্বলতায় সে যে ভুল করেছে তা প্রকাশ পেলেই শুধরে নেবে।

অ্যান বুদ্ধিমতী মেয়ে। সে স্বামীর মনোভাব বুঝে ফেলার সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নেয়। নিজের সমস্ত ইচ্ছা, সমস্ত মতবাদকে উপেক্ষা করে স্বামীর মানসিক শান্তির বিনিময়ে। সে চায় ডস্টয়ভস্কি শান্ত চিত্তে নিজেকে সাহিত্যে ঢেলে দিন—আরো যশস্বী হোন।

অ্যানের পরিবর্তনে আশ্বস্ত হন ডস্টয়ভস্কি। তবু মন থেকে সন্দেহ সম্পূর্ণ দূর হয় না। আবার ফিরে যান জুয়া খেলায়। সময় সময় তিরিক্ষি হয়ে ওঠে মন। অত্যাচার করেন অ্যানের উপর। অনটনের সংসারে অশান্তির হাহাকার আরো বেড়ে ওঠে। অ্যান কোন প্রতিবাদ করে না। নিজের গয়না খুলে দেয় তাঁকে জুয়া খেলার জন্য।

ডস্টয়ভস্কি আত্মধিক্কারে কুকঁড়ে ওঠেন কখনও কখনও। তিনি অনুভব করেন অ্যান নিজের দেহ ও মন সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিয়েছে তাঁকে। এত ভালবাসা, দৈহিক মিলনে এত আনন্দ মারিয়া তাঁকে দিতে পারেনি, দিতে পারেনি সুশ্লভা। তিনি ভাগ্যবান। একটি নারীর হৃদয় এভাবে জয় করা ভাগ্যবানের পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু এই সমস্ত কথা আবার তিনি ভুলে যান। অ্যানকে অপমানিত করতে পশ্চাৎপদ হন না।

"নোটিস ফ্রম দি আণ্ডার ওয়ার্লন্ড" গ্রন্থের এক জায়গায় নায়কের মুখ থেকে তিনি বলিয়েছেন, "Love-really consists of the right–freely given by the beloved to tyranize over her." "ভালবাসা অত্যাচার করার অধিকার দেয়" এই কথা তিনি শুধু উপন্যাসেই লিখে যান নি। নিজের জীবনেও অক্ষরে অক্ষরে তা কার্যকরী করেছেন। অ্যান যেভাবে তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ করেছিল, মারিয়া বা সুশ্লভা সেইভাবে করেনি বলেই বোধহয় অন্তর্জ্বালায় জ্ঞানশূন্য হয়ে সময় সময় অ্যানের সঙ্গে জঘন্য ব্যবহার করতেন।

অবশ্য শেষ জীবনে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ সামলে নিতে পেরেছিলেন। বিশেষ করে অ্যান মা হবার পর। মারিয়া তাঁকে সন্তান উপহার দিতে পারেনি। দীর্ঘদিনের

মৃগীরোগ তাঁর সেরে যায়। এমন কি জুয়া খেলা পর্যন্ত ছেড়ে দিয়েছিলেন। কঠোর জীবন সংগ্রামে ক্লান্ত ডষ্টয়ভস্কির জীবনে এতদিনে অনাবিল তৃপ্তি এল।

এরপর তিনি অনেক দিনের পরিকল্পনাকে রূপ দিতে অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছে ছিল টলষ্টয়ের "ওয়ার অ্যাণ্ড পিসের" মত বিরাট এক উপন্যাস কয়েক খণ্ডে লিখবেন। নাম দেবেন "The life of a Great Sinner" দৃঢ়বদ্ধ মনোভাব নিয়ে যখন লিখতে বসলেন তখন কিন্তু উপন্যাসের আকার কিছু ছোট করবার মনস্থ করলেন। সেই দু'খণ্ডের প্রথম খণ্ডটি হল "ব্রাদার্স অফ কারমাজোভ"। বিশ্বসাহিত্যের অন্য উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড তিনি লিখে যেতে পারেন নি। আকস্মিকভাবে মৃত্যু এসে দেখা দিল।

১৮৮১ সালে ২৮ জানুয়ারি ডষ্টয়ভস্কি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন। অ্যান তার কথা রেখেছিল, তাঁর জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত একান্ত অনুগতভাবে তাঁকে সেবা করেছে। ডষ্টয়ভস্কি যে সত্যি ভালবাসেন তাকে একথা সে বহু পূর্বে বুঝতে পেরেছিল। তিনি তার প্রতি যে অত্যাচার করেছেন তা বিরূপ মনোভাবের পরিচায়ক নয় ভালবাসার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন।

বিশ্বস্ত প্রেমিক ব্রাউনিং

নিজের ঘরে সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে কবিতার পাতায় ডুবে ছিলেন এলিজাবেথ। ছোট বোন হেনরিয়েটা পর্দা সরিয়ে ঘরে প্রবেশ করল। তার সুন্দর মুখে থমথমে ভাব বিরাজ করছে. কয়েক মিনিটে দাঁড়িয়ে থেকে, দিদির দৃষ্টি আকর্ষণ করতে না পেরে সে ফিরে যাচ্ছিল। এই সময় এলিজাবেথ তাকে দেখতে পেলেন।

—কিছু বলবে?

হেনরিয়েটা এগিয়ে এল। থমথমে ভাবের পরিবর্তে এবার তার মুখ লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। সে কার্পেটের দিকে তাকিয়ে ইতঃস্তত করতে লাগল।

তাকে নিজের পাশে বসতে ইঙ্গিত করে, স্নিগ্ধ গলায় এলিজাবেথ বললেন, কি হয়েছে বলতো? তুমি যেন অত্যন্ত বিব্রত বোধ করছ।

সোফায় বসে পড়ে, নিজের ইতঃস্ত ভাবকে কোনরকম কাটিয়ে হেনরিয়েটা বলল, আমি এনগেজমেণ্টের বিষয় মনোস্থির করে ফেলেছি দিদি।

এলিজাবেথ শুনেছিলেন, হেনরিয়েটা একটি ভদ্র এবং যোগ্য যুবকের প্রেমে পড়েছে। তিনি বললেন, এতো আনন্দের কথা। আমি বিশ্বাস করি তুমি সুখী হবে।

—কিন্তু বাবা!

হেনরিয়েটা কথা শেষ না করলেও এলিজাবেথ ব্যারেটের মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। তাদের পরিবারের এ এক অর্থহীন ব্যাপার। এডওয়ার্ড ব্যারেট ছেলে-মেয়েদের কথা গ্রাহ্যের মধ্যে আনতে রাজি নন। বিশেষ করে তাদের মধ্যে কেউ বিয়ে করতে চাইছে এ কথা শুনলে তো কুরুক্ষেত্র বেঁধে যাবে। বিচিত্র স্বভাবের লোক তিনি। এই প্রসঙ্গে কিছু কথা এখানে বলে নেওয়া বাঞ্ছনীয়।

অবস্থাপন্ন এডওয়ার্ড মোল্টন ব্যারেট অত্যন্ত কড়া প্রকৃতির ও ধর্মভীরু ব্যক্তি। তিনি পরিবারের প্রত্যেক ব্যক্তিকে কড়া শাসনের মধ্যে রাখতে অভ্যস্ত। তার বিধানের বা হুকুমের একটু নড়চড় হলে বাড়িতে হুলস্থূল পড়ে যায়। তখন তিনি রাগে কাঁপতে কাঁপতে ছেলেমেয়ে নির্বিচারে প্রহার করতে থাকেন। এই পরিস্থিতির মধ্যেও তাঁর এগারোটা সন্তানের দিন মোটামুটি ভাবে কাটছিল। মিসেস ব্যারেট মারা যাবার পর তাদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল।

এই সময় আবার আরেক বিপত্তি ঘটেছিল। জামাইকায় মিষ্টার ব্যারেটের বিরাট

আখের কারবার। সেখানে অসংখ্য নিগ্রো ক্রীতদাসকে তিনি নির্দয় ভাবে খাটাতেন। এই ক্রীতদাসের উপর শাসন করে করেই বোধহয় তাঁর স্বভাব এমন কড়া হয়ে উঠেছিল। অকস্মাৎ বৃটিশ সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস প্রথা নিষিদ্ধ হয়ে গেল। ব্যবসায় লোকসান হয়ে গেল তাঁর। বলা বাহুল্য মিষ্টার ব্যারেটের মেজাজ আরো চড়ে গেল। ছেলেমেয়েদের উপর অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে গেল অনেক। অবিশ্বাস্য হলেও তিনি এক অলিখিত ফর্মান জারি করলেন, বিয়ে করাতো দূরের কথা, ছেলেমেয়েরা কেউ প্রেমের ধারে কাছে যেতে পারবে না। তখন রক্ষণশীল ভিক্টোরিয়ান যুগ ছিল বলেই সকলে তাঁর কথা ভয়ে ভয়ে মান্য করে চলত। কাজেই হেনরিয়েটার প্রেমে পড়ে যাওয়া এবং প্রেমিককে বিয়ে করতে চাওয়া স্বাভাবিক ভাবেই গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য হবার সম্ভাবনা।

—দিদি, তুমিই পার প্রস্তাবটা বাবার কাছে নিয়ে যেতে।

হেনরিয়েটা অনুনয় করল।

চিন্তিত গলায় এলিজাবেথ বললেন, আমি বলতে পারি। কিন্তু ফলাফল কি হবে তা তোমার অজানা নয়।

—দিদি!

—বেশ, আমি যাচ্ছি তাঁর কাছে.

এলিজাবেথ কোনরকমে উঠে দাঁড়িয়ে, স্ক্রাচে ভর দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন। ছোটবেলায় ঘোড়া থেকে পড়ে গিয়ে গুরুতর আহত হয়েছিলেন। একটি রক্তবাহী শিরা ছিঁড়ে গিয়েছিল। সেই থেকে তিনি পঙ্গু। সব সময় যে স্ক্রাচে ভর করে অল্প অল্প চলতে পারেন তাও নয়। তাঁর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয় বিছানা ও সোফায়।

ছেলেমেয়েদের মধ্যে মিষ্টার ব্যারেট এলিজাবেথকে যা একটু স্নেহ করেন। দু'টি কারণ অবশ্য এর আছে। প্রথমত, এলিজাবেথ পঙ্গু, কারুর প্রেমে পড়ার সম্ভাবনা নেই। দ্বিতীয়ত, তিনি কবিতা লিখতে পারেন এবং সমস্ত কবিতা এখানে ওখানে ছাপা হয়। সম্প্রতি একটি কবিতা গুচ্ছও বেরিয়েছে।

যতদূর সম্ভব মোলায়েম ও বিনীত ভঙ্গীতে এলিজাবেথ হেনরিয়েটার ভবিষ্যৎ জীবনের কথা তুললেন মিষ্টার ব্যারেটের কাছে। শুনেই রাগে আগুন হয়ে উঠলেন তিনি। মেয়ের এই ঘোড়া ডিঙ্গিয়ে ঘাস খাওয়ার চেষ্টাকে তার বিরুদ্ধে ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র বলে মনে করতে লাগলেন। ডাকা হল হেনরিয়েটাকে। গালাগালের ফোয়ারায় তাকে স্নান করিয়ে দিলেন মিষ্টার ব্যারেট। নতজানু হয়ে বারবার ক্ষমা চাইতে হল হেনরিয়েটাকে।

এলিজাবেথ নিজের ঘরে ফিরে গেলেন। সুস্থ পরিবেশ না হলে সাহিত্য সাধনা

বিঘ্নিত হয়। উপায় নেই। এই অশান্তির মধ্যেই 'দি ক্রাই অফ দি চিল্ডরেণ' এর মত বিশ্ববিখ্যাত কবিতা এলিজাবেথ ব্যারেট লিখেছেন।

ঘরে ফিরে তিনি দেখলেন, ভৃত্য চিঠি রেখে গেছে। তাঁর কাছে চিঠি আসে মাঝে মাঝে। কবিতা পড়ে কার কেমন লেগেছে এই সমস্ত মতামত থাকে চিঠিতে। অন্যসময় হলে এই মুহূর্তেই চিঠিখানা খুলতেন না এলিজাবেথ। এখন মনের মোড় অন্যধারে ঘোরাবার জন্যই খাম ছিঁড়লেন। চিঠিখানা পড়ে কিন্তু আনন্দে দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

প্রিয় কুমারী ব্যারেট,

আপনার কবিতা আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে পড়ে থাকি। আপনি কি জানেন একবার আপনার সঙ্গে আমার দেখা হবার উপক্রম হয়েছিল। আপনার আত্মীয় মিষ্টার কেনিয়ান আমাকে প্রশ্ন করেছিলেন, আপনি মিস্ ব্যারেটের সঙ্গে দেখা করবেন? তারপর দেখা হওয়ার ব্যবস্থা করতে গিয়ে ফিরে এসে বললেন, আপনি তখন দেখা করবার মত সুস্থ নন। সেদিনের কথা স্মরণ করে আমার মনে হয়, দূর দেশ ভ্রমণ করতে গিয়ে আমি এমন দেশে গিয়ে পড়েছিলাম, যেখানে আছে একটি মাত্র পর্দার আড়াল। সামান্য বাধার জন্য শুধু পর্দা অতিক্রম করতে পারলাম না। আমি হাজার হাজার মাইল দূরে নিজের ঘরে ফিরে গেলাম, বিশ্বের সেই পরম বিস্ময় আমার অদেখাই রইল।

নমস্কার গ্রহণ করুন।

আপনাদের—রবার্ট ব্রাউনিং।

রবার্ট ব্রাউনিং এর মত প্রতিষ্ঠাবান কবি তাঁকে চিঠি লিখেছেন। বিস্ময়ের বিষয় বইকি। এলিজাবেথ কেমন গর্ববোধ করতে লাগলেন। উত্তর দিতে বিলম্ব করলেন না। যোগ্য উত্তরই দিলেন। দু'ই কবির মধ্যে চলতে লাগল পত্রের আদান-প্রদান। রবার্ট ব্রাউনিং-এর কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না এখানে।

রবার্টের বাবা ছিলেন একজন ব্যাঙ্ক কর্মচারী। সাহিত্যের প্রতি তাঁর প্রবল আকর্ষণ ছিল। তাঁর একমাত্র সন্তানের ছোটবেলা থেকেই বাসনা কবি হবার। ছেলের এই ইচ্ছাকে অধিকাংশ গুরজনেরা ভাল চোখে দেখতেন না। কিন্তু রবার্টের বাবা ছিলেন

অন্য প্রকৃতির। তিনি রবার্টকে এই বিষয়ে উৎসাহ দিলেন এবং সুযোগ করে দিলেন বিভিন্ন ভাষায় অবগাহন করবার। কোন স্কুল কলেজে পড়েননি রবার্ট ব্রাউনিং। তবে অনেকগুলি ভাষায় তাঁর প্রগাঢ় জ্ঞান ছিল।

চিঠিপত্র দু'জনের মধ্যে যখন লেখা আরম্ভ হয় তখন এলিজাবেথের বয়স উনচল্লিশ ও রবার্ট ব্রাউনিং এর তেত্রিশ। রবার্ট তখনও কুমার। দু'জনের পত্রালাপ চললেও, দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। একটি চিঠিতে ব্রাউনিং সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। এলিজাবেথ জানালেন, এখন নয়। শীতকালে শরীর ভাল থাকে না, বসন্তকালে সাক্ষাৎ হবে।

বসন্তকাল এল।

কবি চিঠিতে পূর্বকথা স্মরণ করিয়ে দিলেন। শঙ্কিতা হলেন এলিজাবেথ। তিনি পঙ্গু, তায় বিগতা যৌবনা। বয়সেও তাঁর চেয়ে বড়। ব্রাউনিং হয়তো মনে মনে তাঁকে নিয়ে কল্পনার সুন্দর ছবি এঁকে রেখেছেন। মুখোমুখি হবার পরই অত্যন্ত হতাশ হবেন। তাছাড়া আরেকটি বাধা আছে। সেই বাধাটি হলেন মিষ্টার ব্যারেট। ব্রাউনিং-এর আগমনকে তিনি ভালভাবে গ্রহণ করতে হয়তো পারবেন না। তাঁর পক্ষে কবিকে অপমান করাও অস্বাভাবিক নয়। বলতে গেলে এই কারণেই এতদিন ব্রাউনিং-এর সঙ্গে সাক্ষাৎকে সযত্নে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করেছেন এলিজাবেথ।

যদিও সাক্ষাৎ করবার জন্য আকুল হয়ে আছেন তিনি।

অগত্যা উপায়ন্তর না দেখে মিষ্টার ব্যারেটকে কথাটা জানানই বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। যে কোন কারণেই হোক মিষ্টার ব্যারেট সেদিন খোস মেজাজে ছিলেন। তাঁর মেজাজ ভাল ছিল বলেই এলিজাবেথ কথাটা পাড়তে সাহসী হয়েছিলেন। একথা সেকথার পর তিনি বললেন, একজন ভদ্রলোককে বাড়িতে আমন্ত্রণ করবার ইচ্ছে আছে।

মিষ্টার ব্যারেটের ভ্রূ কুঁচকে উঠল।

—কে সে?

—একজন কবি।

--কবি!

—আপনি তাঁর নাম নিশ্চয় শুনে থাকবেন? রবার্ট ব্রাউনিং, বর্তমানে আমাদের দেশের শ্রেষ্ঠ কবি।

ব্রাউনিং-এর নাম বোধহয় মিষ্টার ব্যারেট শুনেছিলেন। কবি মেয়ের এই আব্দারকে তিনি অগ্রাহ্য করলেন না। বিরাট বাধাকে অতি সহজেই অতিক্রম করতে পেরে এলিজাবেথ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। ব্রাউনিংকে চিঠি দিলেন। একটি দিন স্থির করে, আমন্ত্রণ জানিয়ে তিনি লিখলেন..... "আপনি হয়ত ভেবেছেন, আমার

সঙ্গে সাক্ষাতের পর আপনার মূল্যবান অভিজ্ঞতা হবে। আমি কিন্তু জানি আপনি হতাশ হবেন। তা সত্ত্বেও আপনি যদি আসতে চান আমার আপত্তি নেই। আপনি এলে লাভ আমারই হবে বেশি। তবে একবার এলে দ্বিতীয়বার আসবার ইচ্ছা আপনার হবে না!"

রবার্ট ব্রাউনিং নির্দিষ্ট দিনে এলেন।

কবিকে দেখে, তীব্র শিহরণ অনুভব করলেন এলিজাবেথ। ব্রাউনিং-এর মনের মধ্যে কি খেলা চলেছে, তাঁর মুখ দেখে বুঝতে পারা গেল না। তবে আগ্রহের সঙ্গে অনেকক্ষণ কথাবার্তা বললেন তিনি। একসময় বিদায়ের মুহূর্ত উপস্থিত হল। বাড়ি ফিরে ব্রাউনিং পরের দিনই চিঠি দিলেন। লিখলেন, ... "আপনাকে কি অত্যন্ত বিরক্ত করে এসেছি? বেশিক্ষণ থেকেছি কি কিম্বা অভদ্রের মত জোরে কথা বলেছি।"......

এলিজাবেথ সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "আপনার স্বভাবে আমি কোন অশোভন আচরণ লক্ষ্য করিনি। অপ্রিয় কথা বোধহয় বলতে পারেন না। আগামী মঙ্গলবার অনুগ্রহ করে নিশ্চয় আসবেন।"

যথাসময় ব্রাউনিং এলিজাবেথের চিঠি পেলেন।

চিঠিতে অনন্যসাধারণ কোন কথা ছিল না, বা ছিল না কোনরকম উচ্ছ্বাস। চিঠির উত্তর দিতে গেলে যে ক'টা কথা থাকা দরকার সেই ক'টাই ছিল মাত্র। তবু ব্রাউনিং এর মন উদ্বেল হয়ে উঠল। এখন পরিষ্কার অনুভব করলেন, তিনি এলিজাবেথকে ভালবেসে ফেলেছেন। ভালবাসার পাত্রী হিসেবে এলিজাবেথকে অনেকে কল্পনাই করবেন না। অধিকাংশ মানুষ এই বিগতা যৌবনা নারীর দিকে তাকাতে চাইবেন কিনা সন্দেহ। ব্রাউনিং ছিলেন আলাদা জাতের মানুষ। তিনি পঙ্গু বিগত যৌবনা এলিজাবেথকে দেখেন নি, তিনি দেখেছিলেন তাঁর প্রতিভা, তাঁর হৃদয়।

এলিজাবেথের চিঠি পাবার পর বহুক্ষণ চিন্তা করলেন ব্রাউনিং। তারপর নিজের মনের কথা জানানোই সঙ্গত মনে করলেন। চিঠি লিখলেন। আবেগময় ভাষায় নিজের মনের কথা অকপটে কবি জানালেন এলিজাবেথকে। উত্তরের জন্য বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর এল। বলাবাহুল্য উত্তর কবির অনুকূলে ছিল না।

ব্রাউনিং-এর কাছ থেকে প্রেমপত্র পেয়ে এলিজাবেথ আনন্দে প্রায় কেঁদে ফেললেন। তিনি হাতে চিঠিখানা নিয়েও বিশ্বাস করতে পাচ্ছিলেন না, তাঁরই জন্য কবির হৃদয়ে এত প্রেম সঞ্চিত আছে। কিন্তু এই আনন্দ দীর্ঘস্থায়ী হল না। ভাবাবেগ কমলেই এলিজাবেথ সচেতন হয়ে উঠলেন। একটা প্রশ্ন মাথাচাড়া দিয়ে উঠল,

কবির সুন্দর জীবন কেন বিড়ম্বিত হবে তাঁর ব্যর্থ জীবনের সঙ্গে মিশে গিয়ে? বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠছিল তবুও এলিজাবেথ লিখলেন, "ভবিষ্যতে এই ধরনের চিঠি লিখবেন না। যদি লেখেন, আমার পক্ষে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা আর সম্ভব হবে না। নিশ্চিত জানবেন, আপনার বন্ধুত্বই আমার জীবনের অমূল্য সম্পদ। পূর্ব কথামত আগামী মঙ্গলবারে না এসে তার পরের মঙ্গলবার আসুন। সেদিন আমরা সাহিত্য নিয়ে আলোচনা করব।"

চিঠি পেয়ে ব্রাউনিং মর্মাহত হলেন। আশঙ্কাও হল। তাঁর মনের মধ্যে ঝড় বইতে লাগল। নিজের উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে উঠলেন। এত তাড়াতাড়ি করা তাঁর উচিত হয়নি। মন বুঝে ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই ছিল বুদ্ধিমানের মত কাজ। হয়ত এলিজাবেথ তাঁর এই ব্যবহারে অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছেন। ব্রাউনিং ভেবে পেলেন না এখন, কেন তিনি উন্মত্তের মত চিঠিতে ওই সমস্ত কথা লিখেছিলেন।

সসঙ্কোচে ব্রাউনিং নির্দিষ্ট দিনে গেলেন, এলিজাবেথের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। কিছুই হয়নি এমনি ভাবে এলিজাবেথ গ্রহণ করলেন কবিকে। তবু স্বস্তি পেলেন না ব্রাউনিং।

বললেন, আমাকে ক্ষমা করবেন!

—কেন বলুন তো?

—চিঠিতে ওই সমস্ত কথা আমার লেখা উচিত হয়নি।

—আপনি মিথ্যে সঙ্কোচকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন।

একটু থেমে এলিজাবেথ আবার বললেন, আপনার ও আমার বয়সের মধ্যে পার্থক্য আছে। আপনি জানেন কি, আপনার চেয়ে আমি কয়েক বছরের বড়?

ব্রাউনিং কিছু বলতে গিয়েও বললেন না।

—তাছাড়া! এলিজাবেথ বললেন, আপনি উন্মুক্ত পরিবেশে মানুষ হয়েছেন, আমার দিন কেটেছে সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে। বাবা তাঁর ছেলেমেয়েদের এই গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে চান। ঐ প্রসঙ্গে আর কথা হল না। বাকি সময় দু'জনের মধ্যে সাহিত্য আলোচনা হল।

এরপর ব্রাউনিং এলিজাবেথের কাছে যাওয়া বন্ধ করলেন। এমন কি চিঠি দেওয়াও বন্ধ। চিন্তিত হলেন এলিজাবেথ। নানা আশঙ্কায় ভরে উঠল তাঁর মন। শেষে চিঠি দিলেন কবিকে, "অনেকদিন দেখা-সাক্ষাৎ হয়নি। কোন কারণে আপনি কি আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন? আপনার নীরবতায় আমি অত্যন্ত চিন্তিত ও বিব্রত বোধ করছি।"

ব্রাউনিং নিজের ব্যবহারে লজ্জিত হলেন। অনুভব করলেন, যাওয়া-আসা বা চিঠি বন্ধ করে দেওয়া তাঁর উচিত হয়নি। এই সঙ্গে আনন্দও হল এলিজাবেথ

তাঁর অভাব অনুভব করছেন। তিনি লিখলেন, "আপনার ধারণা অমূলক। আপনার কোন কথায় ও কাজে আজ পর্যন্ত বিরক্তবোধ করতে দেখেছেন কি? আমি শুধু একটি অনুগ্রহ চাইছি, আমাকে শুধু বলতে দিন, আপনাকে সমস্ত অন্তর দিয়ে ভালবেসেছি। বর্তমান অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যে, আমার আর ফিরে আসবার পথ নেই।

এই সময় এলিজাবেথের স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে পড়ল। এত খারাপ হয়ে পড়ল যে চিকিৎসকরা পর্যন্ত ভয় পেয়ে গেলেন। ব্রাউনিং-এর মনের অবস্থাও অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে উঠল। তিনি চেষ্টা করেও এক লাইন লিখতে পারেন না। যাহোক, গুরুতর কিছু ঘটল না। এলিজাবেথ ধীরে ধীরে বিপদ কাটিয়ে উঠলেন। চিকিৎসকরা অভিমত প্রকাশ করলেন, এখন লণ্ডনের কুয়াশা ভেজা স্যাঁতস্যাঁতে জলহাওয়ার মধ্যে থাকলে শরীর আবার খারাপ হয়ে পড়তে পারে। সুতরাং হাওয়া বদল করা একান্ত বাঞ্ছনীয়।

অনেকদিন পরে আবার দু'জনের দেখা হল।

ব্রাউনিং এর দিকে তাকিয়ে এলিজাবেথ বললেন, আপনাকে অত্যন্ত রোগা দেখাচ্ছে। আপনিও কি অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন?

—না।

—তবে?

—আপনি অসুস্থ থাকলে মানসিক অবস্থা ভাল থাকতে পারে না।

—আপনি আমার চিন্তায় নিজের শরীর নষ্ট করেছেন।

এই অবকাশকে হারাতে চাইলেন না ব্রাউনিং—। নরম গলায় বললেন, কেন করছি তা কি তুমি বুঝতে পারনি এলিজাবেথ? যখন তোমার অসুস্থতা আমাকে পাগল করে তুলেছিল, তখনই হৃদয়ঙ্গম করেছি তোমাকে আমি কত ভালবাসি।

দুর্বল এলিজাবেথ কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়লেন।

—কিন্তু...!

—কোন কিন্তু নয়। তুমি আমার ডাকে সাড়া দাও।

এলিজাবেথ মাথা নত করে রইলেন।

—তুমি কি আমাকে ভালবাস না এলিজাবেথ?

—না—না, সে কথা নয়—।

—থাক, এ আলোচনা এখন। এই আলোচনায় তোমার মন বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়ছে। এলিজাবেথ লজ্জিত হলেন। তিনি কিছু বলবার পূর্বেই ব্রাউনিং অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। অন্যান্য কথা ছাড়াও চিকিৎসকরা কি অভিমত প্রকাশ করেছেন সে বিষয়ে আলোচনা হল। ব্রাউনিং বললেন, লণ্ডন ছেড়ে কোথাও হাওয়া

বদল করতে হলে, আমি তোমাকে ইতালির কোন শহরে বা মাল্টা যেতে পরামর্শ দেব।

অন্যমনস্ক ভাবে এলিজাবেথ বললেন, আমারও তাই ইচ্ছে। দেখি বাবাকে বলে।

মিষ্টার ব্যারেটের মত পাওয়া গেল না। তিনি প্রাচীনপন্থী। তাঁর অভিমত হল, চিকিৎসকরা ওরকম বলেই থাকে। তাঁদের কথায় চলতে গেলে অর্থের অপচয় ছাড়া আর কিছুই হবে না। তাছাড়া অসুখের পর হাওয়া বদল করাটা আজকাল ফ্যাসানে দাঁড়িয়েছে। ওসমস্ত আধুনিকতাকে তিনি প্রশ্রয় দিতে নারাজ।

এলিজাবেথ মিষ্টার ব্যারেটকে অসন্তুষ্ট করে কিছু করতে চাইলেন না। চার দেওয়ালের মধ্যে তাঁর মন হাঁপিয়ে উঠেছে। মুক্ত পরিবেশে যাওয়ার জন্য তিনি উন্মুখ, কিন্তু উপায় নেই—। যথা সময়ে কথাটা জানাতে পারলেন ব্রাউনিং। মনস্থির করতে যেটুকু দ্বিধা ছিল তা তিরোহিত হল। কারণ ইতিমধ্যে এলিজাবেথ সমস্ত বিষয়টি বর্ণনা করার পর লিখেছিলেন, "এ অবস্থায় আমি কি করব একমাত্র আপনিই স্থির করে দিতে পারেন।"

ব্রাউনিং তাঁর সঙ্গে দেখা করে বললেন, দু'দিক সামলে নেওয়া যায় এমন একটি পথ আমি দেখাতে পারি।

—কোন্ পথ?

—আমাদের বিয়ে হলে গেলে সমস্ত গোলমাল মিটে যাবে। তখন মিষ্টার ব্যারেটের হুকুম তুমি মানতে বাধ্য থাকবে না। আমরা সহজেই লণ্ডনের বাইরে যেতে পারব।

—না—না, এ হবার নয়—।

—কেন?

—আপনার জীবনকে ব্যর্থ করে দেবার কোন অধিকার আমার নেই। আমার মত পঙ্গুকে বয়ে বেড়ানো কতদূর ক্লান্তিকর এখন আপনি তো বুঝতে পারছেন না। অনুগ্রহ করে ও অনুরোধ আমাকে আর করবেন না।

মর্মাহত ব্রাউনিং বিদায় নিলেন।

দিন দু'য়েক পরে এলিজাবেথের কাছ থেকে তিনি চিঠি পেলেন।

—"আপনি যে আমাকে কত গভীরভাবে আকর্ষণ করেছেন, তা আগে আমি অনুভব করতে পারিনি। এখন থেকে জানবেন, আমি সম্পূর্ণ আপনার। এই কারণেই আপনার প্রস্তাবে আমার পক্ষে রাজি হওয়া সম্ভব হয়নি। আপনার সুন্দর জীবনকে দুর্বিসহ করে তোলবার ইচ্ছা আমার নেই।

এজিলাবেথ তাঁকে অন্তর দিয়ে ভালবাসেন জানবার পর একনিষ্ঠ প্রেমিক

ব্রাউনিংকে আর নিরস্ত করা গেল না। তিনি অনুনয়ের বন্যা বইয়ে দিলেন। মোটেই তাঁর জীবন দুর্বিসহ হয়ে উঠবে না। বরং সুন্দর পরিণতি নেবে একথা বারংবার জানাতে থাকায় এলিজাবেথ সম্মতি না দিয়ে পারলেন না। এরপর একটি বিষয়ে তাঁরা কিন্তু স্থির নিশ্চিত হলেন, তাঁদের বোঝাপড়া শেষ হলেও, এই বিয়েতে কখনই মত দেবেন না মিষ্টার ব্যারেট।

উপায় না থাকায় একদিন ব্রাউনিং এর সঙ্গে বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লেন এলিজাবেথ। গির্জায় তাঁদের পরিণয় সম্পন্ন হল। দু'জনে চলে গেলেন ইতালিতে। বাকি জীবনের অধিকাংশ সময় তাঁরা ইতালিতেই ছিলেন। দু'জনেই নিজের প্রতিভায় ইংরাজী সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে চললেন।

কিন্তু বিধাতার বিধানে তাঁদের প্রেম দীর্ঘ-স্থায়ী হতে পেল না। পনেরো বছর পরে ব্রঙ্কাইটিস রোগে মারা গেলেন এলিজাবেথ! রবার্ট ব্রাউনিং এরপর আঠাশ বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু নারীর সংস্পর্শকে সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। এই দীর্ঘ সময় তিনি স্ত্রীর চিন্তায় বিভোর থেকেছেন আর উচ্চাঙ্গের কবিতা লিখেছেন।

স্বামী ও স্ত্রী দু'জনেই প্রখ্যাত কবি বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে এ এক বিরল দৃষ্টান্ত।

রসিক প্রেমিক শ

"আমার জীবনে কোন প্রেমলীলা নেই।"

১৯৩০ সালের ২০ শে জুন তারিখের একখানা চিঠিতে এই কথা লিখেছিলেন জর্জ বার্ণাড শ।

ওই চিঠিতে তিনি নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে আরো লিখেছিলেন, "মেয়েরা মাঝে মাঝে আমার উপর আকৃষ্ট হয়েছে। আমিও প্রাচীন আইরিশ ভঙ্গীতে যথারীতি তাদের অনুরাগ প্রদর্শন করেছি। তুমি জানো, ঊনত্রিশ বছর বয়স পর্যন্ত আমি ছবি, গান, অপেরা ও গল্পের মধ্যে জীবন কাটিয়েছি এবং প্রলোভন মুক্ত থেকেছি। এই ঊনত্রিশ বছর বয়সেই মায়ের এক বিধবা ছাত্রী আমার মনে বিশেষভাবে কৌতূহল উদ্রেক করেন। সে ঘটনা জানার যদি আগ্রহ থাকে তাহলে আমার Philanderer বইখানি পড়ে দেখো।—"

আমার জীবনে কোন প্রেমলীলা নেই এই কথা লিখে শ বোধহয় বিশেষ এক হাস্যরসের অবতারণা করবারই চেষ্টা করেছিলেন। কারণ তাঁর জীবনে অসংখ্য মেয়ে আনাগোনা করেছে এবং তাদের অধিকাংশের সঙ্গে তিনি হয় উদ্দাম নয়ত নিরাসক্ত ভঙ্গীতে প্রেম করেছেন। উপরের চিঠিতে যে বিধবার কথা লিখেছেন সে হল জেনী প্যাটারসন।

জেনীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার পূর্বে তাঁর জীবনে প্রেম এসেছিল। প্রথম প্রেম। ১৮৮২ সালের প্রথম দিক বা তার দু' এক মাস আগেকার কথা। এলিস লকেটের প্রেমে পড়ে গেলেন তিনি। লকেট হাসপাতালে নার্সের চাকরি করত এবং গান শিখতে আসতো তাঁর মায়ের কাছে। প্রথমে নিজের মনের ভাব শ প্রকাশ করেন নি। কবিতা ইত্যাদি লিখে নিজের হৃদয়াবেগ দমন করেছিলেন। লকেটের কাছে সমস্ত কিছু প্রকাশ পেল ১৮৮৩ সালের ৯ই সেপ্টেম্বরে। আসনাবার্গ স্ট্রীটে শ এর মা'র কাছে লকেট যথা নিয়মে সেদিন গান শিখতেই এসেছিল। ওখান থেকে ফেরার পথে শ তাকে লিভারপুল স্ট্রীট স্টেশনে পৌঁছে দেন। এই একান্ত অবকাশে দু'জনের মধ্যে অনেক কথাই হয়েছিল। শ কি বলেছিলেন তা জানা যায় না। তবে নিজের মনের কথা যে প্রকাশ করেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কারণ পরে লকেটকে তিনি লিখেছিলেন—

লকেট,

"—ক্ষমা করো! গত রাত্রে বোধহয় আমার মনোহারা সহচরীকে আহত করেছি। অন্তত তিনি যদি ছলনা না করে থাকেন তাহলে এই রকমই মনে হয়। সেই থেকে মানসিক কষ্টে আছি। ট্রেন ফেল করার অনুশোচনায় সহচরী হয়ত আত্মধিক্কার দিচ্ছেন।... তোমাকে চিঠি লেখার আবেগ সংবরণ করতে পারলাম না। আমি যা বলি তার কিছু অন্তত বিশ্বাস করো। আমার জিভ বড় দুরন্ত। কলম মারাত্মক, আর হৃদয় অতি শীতল। আগামীকাল নিজের উপর রাগ হবে এই চিঠি তোমাকে পাঠানোর জন্য। — বিদায় প্রিয়তমে! বড় বাড়াবাড়ি হয়ে গেল, না? পুড়িয়ে ফেলো চিঠিখানা। না হয় পোড়ো না। হায়! বড় দেরি হয়ে গেল, এতক্ষণে বোধহয় সবটা পড়ে ফেলেছো।" —জি. বি. এস।

এই চিঠির উত্তরে লকেট প্রশ্রয়ের আভাস বোধহয় দিয়েছিল। কারণ শ'র লেখা পরের চিঠি পড়ে এই রকমই অনুমান করা যায়। এরপর থেকে দু'জনের মধ্যে নিয়মিত চিঠির আদান প্রদান চলতে লাগল। দেখা-সাক্ষাৎও হয়। প্রেম বেশ জমে উঠল। কিন্তু শেষ রক্ষা হল না। শ এর আর্থিক অবস্থা সে সময় একেবারেই ভাল ছিল না। কোন প্রকাশকই তাঁর উপন্যাস ছাপতে রাজি নয়। কাজেই শূন্য পকেটে প্রেমকে চূড়ান্ত রূপ দেবার জন্য শুধু বিয়ে করতে শ'র মন সায় দিল না। তাছাড়া আরো কারণ ছিল। লকেট কখনই তাঁর মনে পরিপূর্ণ আবেগ সৃষ্টি করতে পারেনি।

সুতরাং যেমন হঠাৎ একদিন প্রেমের সূত্রপাত হয়েছিল তেমনই হঠাৎ একদিন তার অবসান হল। পরবর্তী জীবনে লকেট ডাক্তার শার্প নামে এক ভদ্রলোককে বিয়ে করে সুখী হয়েছিল। তবে বহুদিন পর্যন্ত তার মনে শ'র জন্য স্থান ছিল।

এবার মিসেস জেনী প্যাটারসনের কথায় আসা যাক।

এই বিধবা ধনী মেয়েটি শ'র চেয়ে কম করে পনেরো বছরের বড় ছিল। সে ছিল অত্যন্ত উদ্দাম প্রকৃতির এবং সুন্দরী। জেনী বুদ্ধিমতী হলেও, স্বভাব কিছু উগ্র ছিল বলা চলে। তবে একথা অস্বীকার করবার উপায় ছিল না যে, পুরুষদের আকর্ষণ করবার ক্ষমতা ছিল জেনীর প্রচণ্ড। শ'র সঙ্গে তার আলাপ হয় তাঁর মা'র গানের স্কুলে। প্রথম দর্শনেই তিনি আকৃষ্ট হলেন। ঘন ঘন দু'জনের দেখা-সাক্ষাৎ হতে লাগল। বহুক্ষণ ধরে গল্পগুজব করেন। খাওয়া দাওয়া সেরে ফিরে আসেন।

১৮৮৫ সালের জুলাই মাসের মাঝামাঝি তিনি নিজের ডায়েরিতে লিখেছেন, "... পার্কের পথ ধরে ওর বাড়ি গেলাম। দু'জনে সাপার খেলাম। নিদারুণ সমস্ত কথাবার্তা হল, শেষে প্রেম নিবেদন। রাত তিনটায় ফিরেছি, কিন্তু এখনও আমার কৌমার্য অক্ষত।"

সুতরাং দু'জনের সম্পর্ক ধীরে ধীরে কোন্ দিকে অগ্রসর হচ্ছিল তা সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায়। অতীতে সুযোগ-সুবিধা কিছু পেয়েছিলেন শ, কিন্তু নিজের কৌমার্যকে নষ্ট হতে দেননি। এজন্য যে আত্মপ্রসাদ অনুভব না করতেন তা নয়। তবে জেনীর সঙ্গে আলাপ ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হবার পরই তার যৌন বুভুক্ষু মন শাসনের বাঁধন মানছিল না। জেনী তাঁর মনের ভাব বুঝতে পেরেছিল। তার তাগিদও অল্প ছিল না।

শেষ পর্যন্ত চারিত্রিক দৃঢ়তা দৈহিক ক্ষুধার কাছে পরাভূত হল। ২৬ জুলাই তারিখে শ নিজের ডায়েরিতে লিখেছেন, রাত তিনটে পর্যন্ত ছিলাম, নতুন অভিজ্ঞতায় ঊনত্রিশতম জন্মদিন পালিত হল। —বাড়ি ফেরার সময় দরজার কাছে আমাদের যখন বিদায় নেবার পালা চলছিল কথাবার্তা শুনে পাশের বাড়ির বৃদ্ধর ঘুম ভেঙ্গে যায়। এবং তিনি আমাদের লক্ষ্য করেন। গভীর রাতে এই অভিসারের অসৎ উদ্দেশ্য তিনি নিশ্চয় বুঝেছেন।

তাঁদের ঘনিষ্ঠতার কথা কারুর অজানা রইল না। শ'র মা ও বোন নিশ্চিন্ত হলেন। জেনীর অনেক টাকা আছে। তাকে বিয়ে করলে শ'র বাকি জীবন সুখেই কাটবে। শ'র মনের অবস্থা ক্রমে অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। জেনীকে বিয়ে করার কথা তিনি ভাবতেই পারেন না, তার হাত থেকে রেহাই পেলে বেঁচে যান। নর্মলীলা সমান তালে চললেও তিনি ভালভাবেই অনুভব করেছিলেন, এই মধ্যবয়স্কা, উগ্রস্বভাবা নারীর সঙ্গে বেশিদিন মানিয়ে চলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব। তাঁর তরুণ মন কোন তরুণীর জন্য হাঁপিয়ে উঠেছে।

এই রকম যখন মনের অবস্থা তখন ফোবিয়ান সোসাইটিতে আলাপ হল, গ্রেস গিলক্রাইস্ট ও জেরেল্ডাইন পুনারের সঙ্গে। কিন্তু এদের সঙ্গে মন দেওয়া-নেওয়ার পালা বেশিদূর অগ্রসর হল না। মাঝপথেই থেমে গেল এক অজানা কারণে। শ অত্যন্ত অস্বস্তি বোধ করতে থাকেন, কিন্তু জেনীর হাত থেকে রেহাই পাবার কোন পথ দেখতে পান না। একরকম আগলে-আগলে বেড়ায় সে তাঁকে। শ মন দিয়ে কিছু লিখতে পারে না। রাজ্যের অবান্তর চিন্তা তাঁর মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখে।

অ্যানি বেসান্তের সঙ্গে দৈব একদিন আলাপ হয়ে গেল। আমরা ভারতীয়রা অ্যানি বেসান্তকে ঘনিষ্ঠভাবে চিনি। অ্যানির বাবা উইলিয়াম বার্টন পার্শী উড আয়ার্ল্যাণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। উচ্চ মধ্যবিত্ত পরিবারের এই ভদ্রলোক লণ্ডনেই

ঘর বেঁধেছিলেন। বাবার ভালবাসা বেশিদিন পাননি অ্যানি। তাঁর যখন মাত্র পাঁচ বছর বয়স তখন উড মারা গেলেন। এরপর অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতিকে মানিয়ে নিতে নিতে তাঁকে যৌবনের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে পৌঁছাতে হয়েছে। তিনি অপূর্ব সুন্দরী ছিলেন। শান্ত, ধীর ও বুদ্ধিমতী হিসেবে পরিচিত মহলে তাঁর খ্যাতি ছিল।

যখন তাঁর কুড়ি বছর বয়স তখন ফ্র্যাঙ্ক বেসান্তের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল। ফ্র্যাঙ্ক পেশায় ছিলেন পাদরি। তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল। দু'টি ছেলেমেয়েও হল। ফ্র্যাঙ্ক ছিলেন সাদাসিধে ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। একেবারেই রোমান্টিক নন, যা অ্যানির মনে পীড়ার কারণ হয়ে উঠল।

সংসার ও স্বামীর সম্পর্কে তিনি হতাশ হয়ে অন্য কাজে মন দিলেন। তাঁর বক্তৃতা দেবার বেশ ক্ষমতা ছিল। সুরেলা গলায় বক্তৃতা দিয়ে তিনি শ্রোতাদের মন্ত্রমুগ্ধ করে দিতে পারতেন। অ্যানি চলে এলেন নিজের মায়ের কাছে। অ্যানির মা'র অবস্থা ভাল ছিল না। সুতরাং দু'জনকে নানারকম কাজকর্ম করে সংসারের দৈনন্দিন চাহিদা মেটাবার জন্য সচেষ্ট থাকতে হত। খ্রীষ্টধর্ম ও দেবত্বের বিরুদ্ধে গভীর অনাস্থা ছিল অ্যানির। সময় পেলেই তিনি এই সম্পর্কে বক্তৃতা দিতেন।

এই সময় তাঁর সঙ্গে পরিচয় হল চার্লস ব্রডলের। ব্রডলে প্রচলিত ধর্মের বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করবার প্রয়াসে ব্রতী হয়েছিলেন। অ্যানি তাঁর সঙ্গে যোগ দিলেন। সর্বত্র দু'জনে বক্তৃতা দিয়ে বেড়াতে লাগলেন। স্ত্রীর কার্যকলাপে ক্রুদ্ধ হয়ে মিষ্টার বেসান্ত ছুটে এলেন তাঁর কাছে। কলহ প্রচণ্ড আকার নিল। যতদূর জানা যায়, মিষ্টার বেসান্ত মেরেও ছিলেন আনিকে। বলাবাহুল্য এরপর স্থায়ী বিচ্ছেদ ঘটে গেল দু'জনের মধ্যে।

ফেবিয়ান সোসাইটিতে শ'র সঙ্গে অ্যানির আলাপ হয়। অ্যানির আগুনের মত রূপ শ'র মনে জ্বালা ধরিয়ে দিল একথা না উল্লেখ করলেও চলে। দেখা-সাক্ষাৎ প্রায় হতে লাগল। দু'জনে দু'জনের প্রতি গভীরভাবে আকৃষ্ট হলেন। অভ্যাস মত শ' অ্যানিকে অনেক চিঠি লিখলেন। অ্যানিও তার যথাযোগ্য উত্তর দিলেন। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে নিয়মিত দেখা না হলে দু'জনের মনের উপরই ভীষণভাবে চাপ পড়ে।

শ নিজের জীবনকে সুষ্ঠু রূপ দেবার জন্য সচেষ্ট হলেন। এত গভীরভাবে তিনি পূর্বে বিয়ের কথা ভাবেন নি। অ্যানির মত মেয়ে তাঁর জীবনকে আরো সম্ভাবনাময় করে তুলবে এ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ছিলেন। দু'জনের জীবন একই সূত্রে গাঁথা হোক এই আগ্রহ প্রকাশ করলেন অ্যানির কাছে। সহর্ষে প্রস্তাব গৃহীত হল।

তবে দু'জনের মাঝে একটা কাঁটা তখনও খচখচ করছে। মিষ্টার বেসান্ত জীবিত।

এবং আইনসঙ্গত ভাবে বিবাহ বিচ্ছেদ অ্যানির সঙ্গে হয়নি তখনও। শ স্বামীর সঙ্গে অবিলম্বে বিবাহ বিচ্ছেদ করে নেবার পরামর্শ দিলেন অ্যানিকে। কিছু আইন ঘটিত গোলমাল দেখা দেবে এবং বিলম্বও হবে অনেক, এই কারণ দেখিয়ে অ্যানি প্রস্তাবটি বাতিল করে দিলেন।

তারপর তিনিও ক'টি চুক্তিপত্র তৈরি করে বললেন, আমাদের 'ফ্রি ম্যারেজ' হবে। স্বামী স্ত্রীর মতই আমরা বাস করব কিন্তু আইনসম্মত ভাবে আমাদের বিয়ে হবে না। তুমি চুক্তিপত্রে সই করে দাও।

শ ঘাবড়ে গেলেন। লুকিয়ে চুরিয়ে অনেক কিছু হয়। লোকে দেখেও দেখে না। তবে খোলাখুলি সমাজের বুকের উপর এই ভাবে বোধ হয় বাস করা ঠিক নয়।

তিনি তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে বললেন, সর্বনাশের বাকি রইল কি। এতো পৃথিবীর সমস্ত চার্চের প্রতিজ্ঞার চেয়েও খারাপ। এরচেয়ে আইনের তোয়াক্কা না করে তোমাকে দশবার বিয়ে করতে পারি।

অ্যানি শ'র কাছে থেকে এরকম উত্তর আশা করেন নি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল উনি এই চুক্তিপত্রকে সহর্ষে স্বাগত জানাবেন। যাহোক, আরো কয়েকবার অনুরোধ জানালেন কিন্তু শ'কে রাজি করানো গেল না। তিনি ভেজা গলায় বললেন, তাহলে তো চুকেই গেল। আমার চিঠিগুলো ফিরিয়ে দাও, আর এই নাও তোমার লেখা চিঠি।

অ্যান চিঠির গোছা এগিয়ে ধরলেন।

সবিস্ময়ে শ বললেন, চিঠিগুলো রাখতে চাও না—আশ্চর্য! আমার তো কোন প্রয়োজন নেই এই চিঠির।

এই প্রেমের এইখানে পরিসমাপ্তি ঘটল।

এরপর শ'র জীবনে উদয় হল অভিনেত্রী ফ্লোরেন্স এমেরি। ফ্লোরেন্স অভিনেত্রী হলেও সাহিত্যের প্রতি তার অনুরাগ দেখলে অবাক হয়ে যেতে হত। তার চমৎকার কবিতা আবৃত্তি শোনবার মত বিষয় ছিল। প্রতিবারের মত অল্প সময়ের মধ্যেই শ গভীর ভাবে প্রেমে পড়ে গেলেন ফ্লোরেন্সের। দু'জনে যত তত্র ঘুরে বেড়ান। কনসার্টে যান, খাওয়া দাওয়া করেন এখানে ওখানে গিয়ে। তখনও কিন্তু জেনীর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ হয়নি। কথাটা ঠিক বলা হল না। জেনীর বিরক্তিকর ভাব তাঁকে আঁকড়ে রয়েছে।

অভিনেত্রী ফ্লোরেন্সের উপর শ ঝুঁকেছেন একথা জেনীর কানে পৌঁছাল। রাগে আগুন হয়ে উঠল সে। তারপর তার মত মেয়ের পক্ষে যা করা একান্ত স্বাভাবিক সে সেই কাজই করে বসল। সেই ঘটনার উল্লেখ শ নিজের ডায়েরিতে রেখেছেন।

তিনি লিখেছেন, "সন্ধ্যার সময় ফ্লোরেন্সের কাছে গিয়েছিলাম। কিছুক্ষণ পরে জেনী এসে উপস্থিত। অত্যন্ত কুৎসিত দৃশ্যের অবতারণা করল সে। অকথ্য ভাষায় আমাদের আক্রমণ করল। ফ্লোরেন্সকে সরিয়ে দিলাম সেখান থেকে। নইলে জেনী তাকে আঘাত করত। জোর করে তাকে ওখান থেকে নিয়ে যেতে আমার দু'ঘণ্টা লাগল। ব্রস্টন স্কোয়ারে ওর বাড়িতে পৌঁছাতে আমাদের একটা বেজে গেল। বাড়ি ফিরলাম তিনটের পর। নিজের ব্যবহারে কোথাও অভব্যতা প্রকাশ করিনি। ক্লান্তভাবে যখন বিছানায় আশ্রয় নিলাম তখন চারটে।"

এই ঘটনার পর জেনীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক শ'র শেষ হল। ওই সঙ্গে ফ্লোরেন্সের উপর যে অনুরাগ ছিল তাও জোলো হয়ে গেল। এর থেকে অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না যে শ ফ্লোরেন্সকে প্রকৃতপক্ষে ভালবাসেন নি। তাঁর অবচেতন মন জেনীর হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য আকুল হয়ে উঠেছিল, ফ্লোরেন্সকে অবলম্বন করেই এই অবস্থা থেকে তিনি শুধু উদ্ধার পেতে চেয়েছিলেন। শ'র সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক চুকে যাবার পর ফ্লোরেন্স কবি ইয়েট্সের প্রণয়পাত্রী হিসেবে পরিচিতা হয়েছিল।

আয়ারল্যাণ্ডের ডাবলিনে শ পরিবারের সুনাম ছিল। এই বংশের অনেকেই ধর্মযাজক, পদস্থ সরকারী কর্মচারী, ব্যবসায়ী ইত্যাদি হয়ে জন্মেছেন। জর্জ কার শ কিন্তু বংশের অন্যান্যদের মত ভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে আসেন নি। তাঁর বাবা মারা যাবার সময় রেখে গেলেন বিধবা স্ত্রী ও পনেরোটি ছেলেমেয়ে। এই ষোল জনের দু'মুঠো অন্নের ব্যবস্থা তিনি করে যেতে পারেন নি। কার শ সুপুরুষ ছিলেন। মুখের মধ্যে খুঁত অবশ্য ছিল। অস্কার ওয়াইল্ডের বাবা স্যার উইলিয়াম কার শ'র টেরা চোখকে অপারেশন করে সোজা করতে গিয়ে চোখের অবস্থাকে আরো ঘোরালো করে তুলেছিলেন। যাহোক, একটা চাকরি কোনরকমে সংগ্রহ করতে পেরেছিলেন কার। যথাসময়ে ষাট পাউণ্ড পেনসনে চাকরি শেষ হল। তিনি কাল বিলম্ব না করে পেনসন বিক্রী করে কিছু টাকা সংগ্রহ করলেন এবং নেমে পড়লেন ব্যবসায়।

বয়স তখন তাঁর চল্লিশ। এতদিন পরে বিয়ে করার কথা কারোর মনে পড়ল। তিনি করিতকর্মা লোক। মনের বাসনাকে অপূর্ণ রাখার প্রয়োজনীয়তা দেখলেন না। পরিচিতা এলিজাবেথ গারলির কাছে বিয়ের প্রস্তাব করলেন। এলিজাবেথের বয়স কুড়ি। এই বিয়েতে পাত্রীর বাড়ির কাবুর মত ছিল না। কিন্তু কিছুতেই কিছু হল না। বিয়ে হলে গেল যথা সময়ে।

১৮৫৬ সালে ডাবলিনের আপার সিঙ্গ স্ট্রীটের এক বাড়িতে এলিজাবেথ একটি

পুত্রের জননী হলেন। এই নবজাতকটি জর্জ বার্ণাড শ। বার্ণাডের শৈশব কেটেছে অভাব-অভিযোগের মধ্যে দিয়ে। তাছাড়া ছিল অশান্তি। বাবা মাতাল হয়ে থাকতেন। মা'র সঙ্গে প্রচণ্ড ঝগড়া করা তাঁর নিত্যকর্ম ছিল। বলা বাহুল্য আর্থিক অসচ্ছলতা ও শোচনীয় সাংসারিক পরিবেশের জন্যই শ'র লেখাপড়া বেশিদূর অগ্রসর হল না।

মাত্র তের বছর বয়সে তিনি সংগ্রামের পথে নেমে পড়লেন। "মেসার্স স্কট, স্পেন এণ্ড রুণী" কোম্পানিতে তাঁর চাকরি হল। ১৮৭১ সালে "ইউনিক টাউনসেণ্ড কোম্পানি"তে যোগ দিলে-' এখানে তাঁর পদ হল জুনিয়র ক্লার্কের। এই সময় থেকেই তিনি কিছু কিছু লি- -তে আরম্ভ করেন। সেই সমস্ত লেখা ছাপার আকারে প্রকাশিত না হলেও সাহিত্যিক হবার বাসনা তখনই তাঁর মনে দানা বাঁধতে আরম্ভ করে।

পাঁচ বছর টাউনসেণ্ড কোম্পানিতে চাকরি করেছিলেন শ। তারপর লণ্ডন যাওয়া সম্পর্কে পরবর্তীকালে শ বলেছেন, "আমার জীবনসাধনা ডাবলিনে বসে থাকলে সম্পূর্ণ হবে না। আমাকে লণ্ডনে যেতে হবে। লণ্ডন ইংরাজী ভাষার সাহিত্য কেন্দ্র। তখন গেলিক ভাষা না থাকায় আয়ারল্যাণ্ডের নিজস্ব সংস্কৃতি ছিল না। যে সব আইরিশম্যান সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে উন্নতির আশা রাখতেন তাঁরাই দেশ ত্যাগ করে কোন সাংস্কৃতিক শহরের নাগরিকত্ব লাভের চেষ্টা করতেন। আমার মনেও সেই ধারণা বদ্ধমূল হল।"

১৮৭৬ সালে চাকরি ছেড়ে দেবার নোটিশ দিলেন। কর্তৃপক্ষ ভাবলেন মাইনে বাড়ানোর জন্য বোধহয় এই নোটিশ। তাঁরা এই কর্মচারিটির মাইনে সঙ্গে সঙ্গে বাড়িয়ে দিলেন। কিন্তু তাতেও কোন ফল হল না। নিজের মালপত্র গুছিয়ে নিয়ে একদিন বার্ণাড শ ইংলণ্ডের জাহাজে উঠে বসলেন।

লণ্ডনে পা দেবার পর কয়েক বছর তাঁকে প্রায় কপর্দকশূন্য অবস্থায় কাটাতে হয়েছে। কোন সম্পাদক তাঁর লেখা ছাপতে চায়নি। বিজ্ঞাপন ইত্যাদি লিখে কোন রকমে পেট চালাতেন। এই শোচনীয় দিনগুলির সম্পর্কে বার্ণাড শ নিজেই লিখেছেন "আমার অবস্থা ভেবে দেখবার মত। আমি বিদেশী আইরিশম্যান, ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের জাঁতাকলের ছাপ না থাকায় আর সমস্ত বিদেশীর থেকেও বিদেশীতম। লণ্ডন কোন মতেই আমাকে গ্রহণ করতে চায় না। পনেরো শিলিংএ মাত্র একটি প্রবন্ধ বিক্রী হল। এক প্রকাশকের স্কুলে প্রাইজের কয়েকটি উপযোগী ছড়ার প্রয়োজন হল। রহস্য করে একটি প্যারডি লিখে পাঠালাম। আশ্চর্য, তিনি আমাকে পাঁচ শিলিং পাঠালেন। আমি তাঁর ব্যবহারে চমৎকৃত হয়ে একটি ভাল কবিতা লিখে পাঠালাম। তিনি মনে করলেন এটা ঠাট্টা। আমারও কবিতা লেখার

ভূমিকা শেষ হল। একবার পাঁচ পাউণ্ড পেয়েছিলাম, কোন প্রকাশকের কাছ থেকে নয়, এক উকিলের অনুরোধে পেটেন্ট ওষুধের উপর ডাক্তারি প্রবন্ধ লিখে। কিন্তু সেটিও সাফল্য লাভ করল না। ন'বছরে মোট ছ'পাউণ্ড আয় তবু লোকে আমাকে সাপস্টার্ট বলে।"

১৮৭৯ সালের মধ্যে তিনি পাঁচখানা উপন্যাস লিখে ফেলেন। প্রকাশকের দরজায় দরজায় ঘুরেও কোন সুবিধা হয় না। ওই বছরই অক্টোবর মাসে এডিসন টেলিফোন কোম্পানিতে বার্ষিক আটচল্লিশ পাউণ্ড মাইনের চাকরি পেয়ে হাতে চাঁদ পেলেন যেন। তাঁর মত বিরাট প্রতিভাকে প্রথম জীবনে কিভাবে দিন কাটাতে হয়েছে সেই প্রসঙ্গে লিখতে গিয়ে শ'র অন্যতম জীবনীকার প্রখ্যাত চেষ্টারটন বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। যে বার্ণাড শ ন' বছরে ছ' পাউণ্ড রোজগার করেছেন যাঁর রচনা বারংবার সম্পাদক ও প্রকাশকের টেবিল থেকে ফিরে এসেছে, সেই বার্ণাড শ পরবর্তী জীবনে খ্যাতি, স্তুতি ও অর্থের শিখরে আরোহণ করেছিলেন।

শ'র সঙ্গে মে মরিসের প্রথম দেখা হয় হ্যামারস্মিথ হাউসে।

তখনকার খ্যাতিমান কবি মরিস শ'র বন্ধু ছিলেন। যদিও বয়সের মধ্যে অনেক পার্থক্য ছিল। শ ছিলেন তাঁর চেয়ে বাইশ বছরের ছোট। মে মরিসের ছোট মেয়ে।

সেদিন রবিবার। উইলিয়াম মরিস কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "হ্যামারস্মিথ সোসাইটি"র সভাতে যোগ দেবার পর শ "হ্যামারস্মিথ হাউস" থেকে বেরিয়ে আসছেন। তখন সন্ধ্যা। বিদায় সম্ভাষণ জানাবার উদ্দেশ্যে মুখ ঘোরাতেই দেখলেন একটি তরুণী ড্রইংরুম থেকে বেরিয়ে এল। সে, মে মরিস। সুশ্রী মুখ। রুচিশীল সাজ-পোশাক। দেখলেই মন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে। চোখ ফেরান যায় না।

যথানিয়মে শ প্রেমে পড়ে গেলেন।

পরিচয় হল ক্রমে। নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ হতে লাগল। মে'র মার্জিত কথাবার্তায় একেবারে আত্মহারা হয়ে পড়লেন শ। তাঁর মনে হতে লাগল এতদিন পরে যোগ্যপাত্রীর সন্ধান পেয়েছেন। ঘণ্টার পর ঘণ্টা দু'জনের মধ্যে কথাবার্তা হয়। বেশি কথা শ'ই বলেন। ভালবাসার কথা দু'জনের মধ্যে আলোচিত না হলেও, শ নিশ্চিত স্থির হয়েছিলেন, যে তাঁর মনের ভাব মে বুঝতে পেরেছে এবং সে তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতে আরম্ভ করেছে।

অল্পদিনের মধ্যেই তাঁর ভুল ভেঙ্গে গেল। হ্যালিড়ে স্পারলিং "সোসাইটি"র কমরেডদের মধ্যে একজন। উড়ু-উড়ু স্বভাবের এই লোকটিকে কেউই আমল দিত না। অথচ দেখা গেল মে একদিন ওই হ্যালিডের সঙ্গে নিজের এনগেজমেণ্ট ঘোষণা করল। শ'র নিয়মিত উৎসাহহীন কথাবার্তা তার মনে বিন্দুমাত্র দাগ কাটেনি।

এনগেজমেণ্টের কথা শুনে শ ভীষণ হতাশ হলেন। অগত্যা তাঁকে ডায়েরিতে লিখতে হল, "এই তো স্বাভাবিক পরিণতি। কিন্তু কোন রোমান্সের ইতিহাসে একে বিশ্বাসভঙ্গ ছাড়া আর কিছুই বলা চলে না। আমার চেয়ে কমরেড অযোগ্য, তার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তার মত মানুষ ভবিষ্যতে উন্নতি করতে পারে না।"

বিয়ে হয়ে যাবার পর মে লণ্ডন থেকে দূরে নিজেদের কাছে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে গেল শ'কে। এত ব্যাপারের পরও শ কেন এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করেছিলেন, গোঁজামিল দিয়ে তার জবাব দেবার চেষ্টা করেছিলেন তিনি। পরিশ্রমে তাঁর শরীর নাকি ভেঙ্গে পড়েছিল। হাওয়া পরিবর্তনের বিশেষ প্রয়োজন, কিন্তু সামর্থ নেই। মে'র আমন্ত্রণ স্বাস্থ্যের জন্যই, তাই গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে অনেক কথাই লিখেছেন শ। লিখেছেন "সে তার বাবার সৌন্দর্যবোধ ও সাহিত্যিক গুণাবলী উত্তরাধিকারী সূত্রে পেয়েছিল। ওদের নতুন পাতা সংসারে চমৎকারভাবে দিন কাটতে লাগল। আমাকে অতিথি হিসেবে পেয়ে সে আনন্দিত, হ্যালিডে খুশি হয়েছিল তার স্ত্রীকে মনোরম মেজাজে রেখেছিলাম বলে।"

মে এবার তাঁর দিকে একটু ঝুঁকেছে বলে মনে হল। তার কথাবার্তা ও ব্যবহারে তা প্রকট হয়ে উঠছে। শ একটু ভয় পেয়ে গেলেন। স্পারলিং স্ত্রীর মনোভাব বুঝতে পেরেছে বলে মনে হল। এবং—। শ লিখেছেন, "মে'র স্বামী আমার বন্ধু। তার অতিথি হয়ে এসে তারই স্ত্রীকে নিয়ে সরে পড়া সম্মানজনক কাজ নয়। এ কাজ সামাজিকবিধি বহির্ভূত। যদিও যৌন এ ধর্ম সম্পর্কিত ব্যাপারে আমি স্বাধীন মতবাদ পোষণ করতাম। আমি জানতাম কলঙ্ক রটলে আমাদের দু'জনেরই ক্ষতি হবে। যুক্তিতর্ক দিয়ে বিচার করলেও এই ঘটনার অন্ধকার দিকটি আমার কাছে বড় হয়ে দেখা দিত। সুতরাং আর কোন যুক্তিতর্ক মনে আনলাম না। ওখান থেকে সরে পড়লাম।"

সালটা ১৮৯৬।

শ-এর পরিচিত ফেবিয়ান সোসাইটির ওয়ের দম্পতি কয়েক সপ্তাহের জন্য "সেণ্ট আগুরু রিক্টরিতে" এসে বাসা বাঁধলেন। প্রতি বছর কয়েকজন বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে গ্রামাঞ্চলে গরমকালে এসে কয়েকদিন কাটিয়ে যান। এবার ওয়েরদের সঙ্গে এসেছেন, ট্রেভেলিয়ান গ্রাহামওয়ালেশ, শার্লোট পারকিনস, শার্লোট টাউনসেণ্ড ও জর্জ বার্ণাড শ। সকলেই ফেবিয়ান সোসাইটির সদস্য।

এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্য অনবদ্য। সকলের বেশ ভাল লাগল। সোস্যালিজিম চর্চা, হেঁটে বা সাইকেলে বেড়ান, প্রচুর খাওয়া-দাওয়া এই সমস্তর মধ্যে দিয়েই

অতিথিদের সময় কাটতে লাগল। আর বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে শার্লোট টাউনসেণ্ডের প্রেমে পড়ে গেলেন শ।

মিস শার্লোট টাউনসেণ্ড সমৃদ্ধশালী ও অভিজাত পরিবারের মেয়ে। তাঁর বাবা হোরেস পেইন টাউনসেণ্ড খ্যাতিমান আইরিশ ব্যারিষ্টার ছিলেন। ডাবলিনে এঁদের পারিবারিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেই শ চাকরি করতেন। অপূর্ব সুন্দরী না হলেও শার্লোটকে সুন্দরী বলা চলে। ধীর, স্থির ও রুচিশীলা তরুণী। প্রণয়প্রার্থী ও পানিপ্রার্থীর সংখ্যা তাঁর কম নয়। তাদের এড়িয়ে বর্তমানে তিনি সোস্যালিজিমকে আঁকড়ে ধরেছেন।

শ নিজের বাক্যচ্ছটায় শার্লোটকে আকর্ষণ করলেন। ওয়ের দম্পতির ধারণা ছিল, গ্রেহাম ওয়ালেশের সঙ্গে তাঁর জমবে ভাল। কিন্তু তাঁরা সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, শার্লোট ঝুঁকেছে বার্ণাড শ'র দিকে। দু'জনে সাইকেল চড়ে দূর দূরান্তরে চলে যান। শ নিজের লেখা নাটক পড়ে শোনান শার্লোটকে।

এর কিছুকাল পূর্ব থেকে তৎকালীন বৃটিশ ষ্টেজের রাণী এলেন টেরীর সঙ্গে শ'র ঐতিহাসিক পত্রালাপ আরম্ভ হয়েছে। যার পরিসমাপ্তি ঘটতে সময় লেগেছিল ছাব্বিশ বছর। এই ছাব্বিশ বছর ধরে একরকম নিয়মিত শ চিঠি লিখেছেন, এলেন টেরীকে।

যাহোক, শার্লোটের সঙ্গে যখন বেশ জমে উঠেছে তখন শ সেণ্ট অ্যাগুরু রেকটরি থেকে টেরীকে চিঠিতে লিখলেন, "এক ধনবতী আইরিশ মহিলা এখানে এসেছেন। মেয়েটি চতুরা এবং দৃঢ় চরিত্রের।......তাঁর প্রেমে পড়ে নিজের হৃদয়কে স্নিগ্ধ করতে চাই। আমি শুধু প্রেমে পড়তে ভালবাসি, তাঁর অর্থসম্পদকে নয়। সুতরাং আর কেউ তাঁকে বিয়ে করবে না—অবশ্য আমার ওপরে, যদি ওর মন সায় দেয়।"

আবার অন্য এক চিঠিতে শ টেরীকে লিখেছেন, "আমার এই আইরিশ বিত্তশালিনীকে কি বিয়ে করব? তিনি বিয়ের উপর আস্থাহীন। তবে আমার ধারণা, তাঁকে আমি রাজি করাতে পারব। তারপর শত শত মাস চালাব বিনা খরচায়।"

প্রকৃতিতে দু'জনের পার্থক্য ছিল অনেক। অনেক বিষয়ে শ'র বিপরীত মনোভাব পোষণ করতেন শার্লোট। রাজনীতিতে তাঁর আগ্রহ ছিল না। সমাজের কাজে গঠনমূলক কাজ করতেই তিনি ভালবাসতেন। যেমন—"লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকস" জাতীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য তিনি প্রাণপাত করে চেষ্টা করতেন।

দু'জনের মধ্যেকার পার্থক্যকে কিন্তু কেউই বড় চোখে দেখলেন না। এই পার্থক্য ভরাট করে দিয়েছে প্রেম। ১৮৯৮ সালের শরৎকালে শ ও শার্লোটের অন্তরঙ্গতা চূড়ান্ত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাল। কিন্তু তখনও বিয়ের প্রস্তাব করেননি শ।

১৮৯৮ সালের প্রথম থেকে শার্লোট তাঁর একরকম সেক্রেটারির মত হয়ে পড়লেন। এই সময় শ তাঁর বিখ্যাত "প্লেজ—প্লেজেণ্ট অ্যাণ্ড আনপ্লেজেণ্ট" প্রকাশের ব্যবস্থায় ব্যস্ত ছিলেন। তবুও সময় পেলেই দু'জনে বেড়াতে বেরোতেন। কখনও বা শার্লোটের "লণ্ডন স্কুল অব ইকনমিকসের" উপরতলার ফ্ল্যাটে গিয়ে বসতেন। এর পরই তাঁর শরীর ভেঙে পড়ল। প্রেম, লেখা, থিয়েটার, মিটিং-এ বক্তৃতা—একা মানুষের পক্ষে এত কিছু সামলাতে গেলে শরীর ভাঙ্গবেই। তার উপর আরেক উপসর্গ দেখা দিল। জুতার ফিতে ক্রমাগত টান করে বাঁধার জন্য পায়ে ঘা হল। সামান্য ঘা। কয়েকদিন পরে ঘা আর সামান্য রইল না। এমন অবস্থা দাঁড়াল যে অস্ত্রোপচার না করে উপায় নেই। অস্ত্রোপচারের পর দেখা গেল, "নেক্রসিস অব বোন" হয়েছে। পায়ের হাড় পর্যন্ত ক্ষয়ে যেতে পারে। শ বেশ ভাবনায় পড়ে গেলেন। শার্লোটের চিন্তার অন্ত নেই। সেবা-যত্ন চলতে লাগল।

শ'র ফ্ল্যাট মোটেই ভাল ছিল না। তারপর নিজের অভ্যাসের দোষে তিনি অপরিষ্কার ও জঞ্জালে পূর্ণ করে রেখেছিলেন। এরকম পরিবেশে শার্লোট তাঁকে এখানে থাকতে দিতে চাইলেন না। তাঁর ইচ্ছে শকে নিজের পল্লীভবনে নিয়ে গিয়ে ভালভাবে পরিচর্যার ব্যবস্থা করেন। শ ফাঁপরে পড়ে গেলেন। তাঁর যাবার আন্তরিক ইচ্ছে থাকলেও, একটা প্রবল বাধা মাথা চাড়া দিয়ে রয়েছে তাঁর সামনে। অবিবাহিত দু'জন—নারী-পুরুষ, একই সঙ্গে বসবাস করবে এটা পরিচ্ছন্ন সামাজিক রীতিসম্পন্ন নয়। শেষ পর্যন্ত একটা রফা হল।

এ সম্পর্কে শ পরে বলেছেন, "যে কারণে আমাদের বিয়ে স্থির হল, আগে ভাবতে পারিনি, এই কারণে আমি বিয়ে করব। নিজের চাইতে তাঁর কথাই আমাকে বেশি চিন্তা করতে হয়েছে। আমরা এখন দু'জনে দু'জনের প্রতি নির্ভরশীল।"

শ শার্লোটকে বলেছিলেন, নিশ্চয়ই হেসেই বলেছিলেন, "আমাকে যদি নিয়ে যেতেই চাও তাহলে আগে গিয়ে ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের কাছে বিয়ের নোটিশ পেশ কর।"

বিয়ের প্রস্তাব নাটকীয়ভাবে হলেও শার্লোট রাজি হলেন।

শার্লোটই সমস্ত ব্যবস্থা করলেন। ১৮৯৮ সালের ১লা জুন লণ্ডন কাউণ্টির ষ্ট্রাণ্ড ডিস্ট্রিকের রেজিস্ট্রারের অফিসে তাঁদের বিবাহ আইনসিদ্ধ হবে বলে স্থিরীকৃত হল।

নির্দিষ্ট দিনে বিয়ের সাক্ষী হিসেবে উপস্থিত হলেন, গ্রাহাম ওয়ালেশ এবং হেনরী সল্ট। তাছাড়া দু'জনের অনেক বন্ধু-বান্ধবও উপস্থিত হলেন। পাত্র শ ক্রাচে ভর দিয়ে গেলেন। এই সময় এক মজার ব্যাপার হয়। এ বিষয়ে শ নিজেই বলেছেন, "রেজিস্ট্রার ভাবতেই পারেননি আমিই পাত্র। তাঁর ধারণা হয়েছিল এই উৎসবে

অংশগ্রহণকারী আমি একজন ভিক্ষুক মাত্র। ওয়ালেশ ছ'ফুট লম্বা। সুতরাং উৎসবে নায়ক হিসাবে তাঁর সঙ্গে আমার বাগদত্ত বিয়ে রেজিস্ট্রার প্রায় সেরেই ফেলেছিলেন। ওয়ালেশ চিন্তা করে দেখলেন সাক্ষীর পক্ষে এই হঠকারিতা প্রকাশ করা বোধহয় উচিত নয়। তিনি ইতঃস্তত করে শেষে আমাকেই জায়গা করে দিলেন।"

রেজিস্ট্রারকে দোষ দেওয়া যায় না। বার্ণাড শ পড়ে গিয়েছিলেন ময়লা ছেঁড়া পোশাক। পাত্র এইরকম সাজ-পোশাকে বিয়ে করতে আসবে, ভাবা যায় না। অথচ আর সকলের বেশভুষা তাকিয়ে দেখবার মত।

এইখানেই শেষ নয়। বিয়ের পরও আরো অনেকের সঙ্গে প্রেমে পড়েছেন শ। এমনকি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্তও। যদিও শার্লোটের প্রতি তাঁর ব্যবহার কখনও নিচু মানের হয়নি। বিবাহ বিচ্ছেদও হয়নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত শার্লোট শ'র সঙ্গেই ছিলেন। ১৯৪৩ সালের ১২ই সেপ্টেম্বর শার্লোটের মৃত্যু হয়। এরপর শ আরো সাত বছর বেঁচেছিলেন।

অসংখ্য নারীর সঙ্গে প্রেমের খেলায় মেতেও রসিক জর্জ বার্ণাড শ বলে গেছেন, "আমার জীবনে কোন প্রেমলীলা নেই!"

বহুবল্লভ ফ্রাঙ্ক হ্যারিস

দোতলা ডেক থেকে ঘোরানো সিঁড়ি দিয়ে কিছুটা নিচে নামা যায়। সেখানে প্যাকিং বাক্স ও নানা জিনিষের চটে মোড়া গাঁট গাদাগাদি করে রাখা হয়েছে। এই সমস্ত মাল ইংল্যাণ্ড থেকে আমেরিকায় চলেছে। জাহাজ নিউইয়র্কের ডকে ভেড়বার আগে এখানে কারুর আসবার কথা নয়। কোন্ প্রয়োজনে আসবে?

প্রায় দিন দু'য়েক হল দেখা-সাক্ষাৎ করবার জন্য দু'জন এই জায়গাটাকেই নির্বাচন করেছে। কারুর চোখে ধরা পড়বার সম্ভাবনা না থাকায় এই নির্বাচন। আজও তারা এসেছে। অতি সঙ্কীর্ণ জায়গায় ঘেঁযাঘেঁষি করে বসেছে ষোল বছরের জেসি আর চোদ্দ বছরের হ্যারিস। অতি মৃদু গলায় কথা হচ্ছে তাদের মধ্যে। হ্যারিস জেসির নরম কাঁধের উপর মুখ ঘষছে থেকে থেকে। ষোল বছর বয়স হলেও জেসি পরিপূর্ণ নারী হয়ে উঠেছে। সে বুঝতে পারে সহজেই হ্যারিস কি চায়।

সরে আসার চেষ্টা করে জেসি বলল, আমাদের বাগদানটা এবার বোধহয় সেরে ফেলা উচিত। অবশ্য তুমি যদি সত্যি আমাকে ভালবেসে থাক।

হাসল হ্যারিস! অদ্ভুত সুন্দর আকর্ষণীয় হাসি তার। পরবর্তী জীবনে এই হাসিই তাকে অধিকাংশ নারীঘটিত ব্যাপারে জয়যুক্ত করেছে। আবহমানই তার এই মন মাতানো হাসিতে মেয়েরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছে।

—আমি তোমাকে ভালবাসি কিনা এই সন্দেহের দোলায় এখনও দুলছো?

—না। এমনি বলছিলাম। তবে এবার—

—এখন নয়। তাড়াতাড়ি করে লাভ কি? ভাগ্যের সন্ধানে আমেরিকায় যাচ্ছি। নিজের পায়ে দাঁড়াতে দাও, তারপর—।

কথাবার্তা আর এগুলো না বিশেষ।

একটু চুপ করে থেকে জেসি বলল, এবার আমায় উঠতে হবে। অনেক কষ্টে বাবার চোখে ধুলো দিয়ে এখানে এসেছি। তিনি যদি জানতে পারেন আমি কেবিনে নেই, তাহলে আর রক্ষা থাকবে না।

জাহাজের চীফ ইঞ্জিনিয়ার জেসির বাবা। অত্যন্ত বদরাগী লোক। নিজের কাজ ছাড়া অন্য কিছুতে রসের সন্ধান পান না। তাঁর খেয়াল হয়েছে মেয়ের বয়েস বেড়েছে। সুতরাং তার উপর কড়া দৃষ্টি রাখা উচিত। রাখছেনও। তবুও যে জেসি

তাঁর দৃষ্টি বাঁচিয়ে হ্যারিসের সঙ্গে মেলামেশা করে চলেছে, সেটা বিস্ময়ের বিষয় বই কি! তবে শেষ রক্ষা করা গেল না।

ওরা সবে উঠে দাঁড়িয়েছে কাল আবার এখানে সাক্ষাৎ স্থির করে নিয়ে। ঠিক এই সময় দু'জনে সবিস্ময়ে লক্ষ্য করল, বিশাল দেহী ইঞ্জিনিয়ার গম্ভীর মুখে সেই ঘোরান সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছেন। ওদের দু'জনের মেলামেশার কথা কিন্তু সেলারদের কাছে অজ্ঞাত ছিল না। তাদের মুখ থেকে ছড়াতে আরম্ভ করে কথাটা। এই কিছুক্ষণ আগে শুনেছেন ইঞ্জিনিয়ার। রাগে কাঁপতে কাঁপতে তিনি ছুটে এসেছেন মেয়ের অভিসার ভঙ্গ করতে। দুর্দান্ত রাগী বাবার কাছে হাতে নাতে ধরা পড়ে গিয়ে ঠক ঠক করে কাঁপতে আরম্ভ করল জেসি। ইঞ্জিনিয়ারও রাগে কাঁপছিলেন।

চিৎকার করে বললেন, তুমি এখানে—!

হ্যারিসও ভয় পেয়ে গেল। তার মনে হতে লাগল, জেসি তো গেলই। জাহাজে যে চমৎকার আশ্রয়টি পাওয়া গেছে, ইঞ্জিনিয়ারের কোপে পড়ে তাও না হাতছাড়া হয়ে যায়।

—বেআক্কেল মেয়ে, এই ভাবে আমার নাম ডোবাচ্ছ? চলে এস এখান থেকে। আর কোনদিন কোন বেচাল তোমার দেখতে যেন না পাই।

মেয়েকে নিয়ে চলে গেলেন ইঞ্জিনিয়ার। হ্যারিসের বুক খালি হয়ে গেল। চৌদ্দ বছরের হ্যারিস ভয় ও মনমরা ভাব নিয়ে ফিরে এল নিজের কেবিনে। যেন পূর্ণ যৌবনের হতাশ প্রেমিক। কয়েক দিনের মধ্যে সে আর জেসির দেখা পেল না। এদিকে জাহাজ নিউইয়র্কের প্রায় মুখোমুখি। বাপের কাছে জেসি কিভাবে তাড়িত হয়েছে তা ভগবান জানেন। হ্যারিস নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা জলাঞ্জলি দিয়ে এখন পাগলের মত শুধু জেসির কথাই ভেবে চলেছে।

জাহাজ নিউইয়র্কের মুখোমুখি। আর বোধহয় দেখা হল না।

কিন্তু ঈশ্বর হ্যারিসের প্রতি সদয় ছিলেন। আবার সাক্ষাৎ হল দু'জনের। শুকনো মুখে, ভয়ে ভয়ে তার কেবিনে এল জেসি। হ্যারিস কিছু বলল না। সবলে জড়িয়ে ধরল তাকে। জেসি সরে আসবার চেষ্টা করল।

—আমার হাতে বেশি সময় নেই। কোনরকমে বাবার চোখে ধুলো দিয়ে চলে এসেছি তোমাকে গোটা কয়েক কথা বলতে।

—বল?

—আমি অসম সাহসের পরিচয় দিয়েছি। বাবাকে বলেছি, সমস্ত কথা। তিনি অত্যন্ত রাগ করেছেন আমার উপর। এরকম ছেলেমানুষীকে তিনি কখনই প্রশ্রয় দেবেন না জানিয়েছেন।

—ছেলেমানুষী! হ্যারিস অবাক।

—তিনি বলেছেন, আমার যা বয়স তাতে আমি তাঁর অমতে কারুর সঙ্গে প্রেম করতে পারি না বা কাউকে বিয়ের কথা দিতে পারি না।

—খুবই চিন্তার কথা হল।

—আমার ভয় করছে হ্যারিস। আমাকে এখন ছেড়ে দাও হ্যারিস। নিউইয়র্কের ঠিকানা এনেছি। ওখানে আমার সঙ্গে দেখা কর।

জেসি সরে এল হ্যারিসের কাছ থেকে। তার হাতে ঠিকানা লেখা কাগজটা গুঁজে দিয়ে দ্রুত কেবিন থেকে বেরিয়ে গেল। বুভুক্ষুর মত জেসির গমনপথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইল হ্যারিস।

আজকের নিউইয়র্কের সঙ্গে সেদিনের নিউইয়র্কের তুলনা করা চলে না ঠিকই। তবে সেদিনের বিশাল নিউইয়র্কেও নতুন মানুষ থৈ খুঁজে পেত না। হ্যারিস জাহাজ থেকে নেমে রাজপথের উপর এসে দাঁড়াল। এত মানুষ একসঙ্গে আগে কখনও দেখেনি। কেমন যেন দিশেহারা হয়ে পড়ল। কি হবে? কোথায় যাবে?

কিন্তু ভাগ্য তার ভালই বলতে হবে। এই জনসমুদ্রে হ্যারিসকে খড়কুটোর মত ভাসতে হল না। অচিরেই এক দয়াবতী ভদ্রমহিলার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল তার। তিনি হ্যারিসকে নিজের বাড়িতে স্থান দিলেন। এমন কি তাঁর স্বামী একটা চাকরির ব্যবস্থাও করে দিলেন। কাজটা ব্রুকলিন ব্রীজের কাছে। একটু পরিশ্রম সাপেক্ষ। তবে আয় ভাল। প্রতিদিন অন্তত পাঁচ ডলার।

হ্যারিস রাজি হয়ে গেল। কয়েকদিন সন্ধানের পর সে জেসির সন্ধানে গেল। ঠিকানা ছিল। কাজেই বাড়ি খুঁজে বার করতে বিশেষ অসুবিধা হল না। জেসি থাকে তার দিদির কাছে। দিদিকে নিজের মনের কথা বলেছিল জেসি। হ্যারিসকে দেখে মিসেস প্লামার অবাক। এইটুকু ছেলের প্রেমে পড়েছে তার বোন।

যাহোক, তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন হ্যারিসকে। বাড়িতে তাঁর বাবা ইঞ্জিনিয়ার সাহেব থাকলে অনর্থ ঘটত সন্দেহ নেই। সৌভাগ্যক্রমে তিনি আবার জাহাজ নিয়ে বেরিয়ে পড়েছিলেন। তিনজনের মধ্যে অনেক কথা হল। সুখেই কাটল বেশ কিছুক্ষণ।

হ্যারিস নিয়মিত যাওয়া-আসা আরম্ভ করল। তবে এমন সময় বেছে নিল যখন মিসেস প্লামার বাড়িতে অনুপস্থিত থাকে। জেসি ছাড়া আর কেউ নেই। ক্রমে দু'জনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা চরম পর্যায়ে পৌঁছল। কিশোর হ্যারিস পূর্ণ-বয়স্ক যুবকের মত আকণ্ঠ পান করল তার প্রেমিকাকে।

স্বপ্নের জাল বুনতেও বাধা নেই। বিয়ের পর কি ভাবে দু'জনের জীবন কাটবে তার

পূর্ণাঙ্গ আলোচনা বার বার হয়েছে। এমন কি কিভাবে ঘর সাজানো হবে, কিভাবে উন্নত পর্যায়ে সামাজিকতা বজায় রাখা হবে তা নিয়েও দু'জনে মাথা ঘামিয়েছে।

এদিকে নানা কারণে কারখানার চাকরিটা হ্যারিসের গেল। তবে সে বেকারভাবে বসে থাকবার ছেলে নয়। জুতো পালিশ করবার কাজে নেমে পড়ল নিউইয়র্কের রাস্তায়। এই কাজে তার আয় বরং আগের চেয়ে বেড়ে গেল। কবিতা আওড়াতে আওড়াতে মন দিয়ে ধনী দরিদ্র নির্বিশেষে জুতা পালিশ করে যায়।

একদিন এক নাটকীয় ঘটনা ঘটে গেল। একজনের জুতা পালিশ করতে করতে কবিতা আওড়ে চলেছে।

ভদ্রলোক এই শ্রেণীর ছেলের মুখে কবিতা আবৃত্তি শুনে অবাক হয়ে গেলেন। সহানুভূতির সঙ্গে জেনে নিলেন তার বর্তমান অবস্থা। জানতে চাইলেন সে চিকাগোয় গিয়ে তাঁর হোটেলে চাকরি করবে কিনা? রাজি হয়ে গেল হ্যারিস। রাস্তায় জুতা পালিশ করতে করতে তার মন বোধহয় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তবে চিকাগোয় গেলে জেসির সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটবে—খামখেয়ালী হ্যারিস এই দিকটা মোটেই চিন্তা করে দেখল না।

নিউইয়র্কের মায়া কাটিয়ে একদিন চেপে বসল চিকাগোর ট্রেনে। এইভাবে ইংরাজী সাহিত্যের সব্যসাচী ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিসের প্রথম প্রেম শেষ হল।

জেমস টমাস হ্যারিস সম্ভবত ১৮৬০ সালে ইংল্যাণ্ডের গ্যালওয়েতে জন্মগ্রহণ করেন। পরবর্তী জীবনে তিনি নিজেই নিজেকে ফ্রাঙ্ক হ্যারিস নামে পরিচিত করেন। সাহিত্যের দরবারে ফ্রাঙ্কের মত সমস্ত বিষয়ে এত 'ফ্রাঙ্ক' আর কাউকে দেখা যায়নি। শোচনীয় নৈতিক চরিত্রের জন্য তিনি সুখ্যাত ছিলেন না। তবুও তাঁর মত খ্যাতিমান লেখক-সাংবাদিক সে যুগে আর একজনও ছিলেন না। ফ্রাঙ্কের সমসাময়িকদের মধ্যে অনেকে বলেছেন, "লোকটির চরিত্র বীভৎস হলেও তিনি যে প্রতিভাবান এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।" তাঁর সম্পর্কে যতগুলি বিশেষণ ছিল আজ পর্যন্ত আর কোন লেখকের নামের পেছনে এতগুলি বিশেষণ যোগ করে দেওয়া সম্ভব হয়নি। সেকালের একজন বিখ্যাত সমালোচক ফ্রাঙ্ক হ্যারিস সম্পর্কে বলেছিলেন, "তিনি একজন Poet, Pronographer, Cow Boy, Con Man, Biographer, Black Mailer, Champion Liar, Genious Shakespearean Critic, Servent-Girl Seducer, Short Story Writer." এতে ফ্রাঙ্ক হ্যারিস ইংল্যাণ্ড থেকে আমেরিকা পালাবার পথে নিজের জীবনের প্রথম প্রেমের পাঠ শেষ করলেন। আরো পরিষ্কার করে বলতে গেলে, জীবনে তিনি যে অসংখ্য কামযুক্ত প্রেমের কদর্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন, তার হাতেখড়ি হয়েছিল জেসির সঙ্গে অন্তরঙ্গতায়।

ফ্রাঙ্কের চেহারাও ছিল বিচিত্র। লম্বা তিনি ছিলেন না বেঁটেও তাকে বলা চলত না। হিল উঁচু জুতো পরে তিনি নিজেকে লম্বা প্রতিপন্ন করতেন। পেশীবহুল বিরাট দেহ। জাঁদরেল গোঁফ একমাথা কালো কোঁকড়ানো চুল। জমকালো সাজ-পোশাক। প্রথম দর্শনেই মনে হত জার্মান সম্রাটের কোন নিকট আত্মীয়। চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লক্ষ্য করবার মত। কথাবার্তা বলতেন অত্যন্ত চড়া সুরে।

মেয়েদের বাহ্যিক রূপ হরণ করবার মত রূপ তাঁর ছিল না বলতে গেলে। তবুও অসংখ্য মেয়ে রূপ আর দেহ নিয়ে এগিয়ে এসেছে তাঁর কাছে। তিনি তাদের নিয়ে নির্বিচারে খেলা করেছেন। সে পরের কথা। আগে অন্যান্য বিষয়ে আলোচনা শেষ করে নেওয়া যাক।

আমেরিকায় নানা কাজের ফাঁকে ফাঁকে কিছু পড়াশুনা করেছিলেন। যখন তাঁর পূর্ণ-যৌবন সেই ১৮৮৭ সালে তিনি আমেরিকা থেকে ইউরোপে এলেন। প্যারিসে বাস করলেন কিছুদিন। ব্রাইটন কলেজে অধ্যাপনা করলেন। লণ্ডনে পা দেবার পরই বলতে গেলে ওখানকার সাহিত্য-সমাজে প্রতিষ্ঠা অর্জন করলেন। ওখানে তাঁর প্রথম চাকরি হল "এসপেক্টর" পত্রিকায়। কয়েক মাস পরেই "ইভনিং নিউজের" সম্পাদক হয়ে গেলেন। কিন্তু বারংবার অশ্লীল হেডিং পত্রিকায় ব্যবহার করে তাঁর চাকরি গেল।

অন্য কেউ হলে এরপর আর সম্পাদনার ক্ষেত্রে স্থান পেতেন না। কিন্তু ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের কথা স্বতন্ত্র। তিনি অনন্যসাধারণ ভাগ্য নিয়ে পৃথিবীতে এসেছিলেন। এবার তিনি প্রখ্যাত অভিজাত "দি ফর্টনাইট রিভিউ" পত্রিকার সম্পাদক হলেন। অবশ্য এ চাকরি তাঁর কয়েক বছর পরেই গেল। এরপর ফ্রাঙ্ক যথাক্রমে "দি ক্যানডিড ফ্রেণ্ড", "অটোমোবাইল রিভিউ", 'মর্ডান সোসাইটি" প্রভৃতি পত্রিকা সম্পাদনা করেন। শেষে "স্ট্যাণ্ডার্ড রিভিউ" পত্রিকার স্বত্ত্ব কিনে ফেললেন। কিন্তু অস্থিরচিত্ত ফ্রাঙ্কের পক্ষে এই পত্রিকাটিও বেশীদিন চালানো সম্ভব হল না। চল্লিশ হাজার পাউণ্ডের বিনিময়ে তিনি পত্রিকার স্বত্ত্ব সিসিল রোডসকে বিক্রী করে দিলেন। টাকা হাতে পাবার পর বিশেষ কিছু করবার ছিল না বোধহয়, তাই একটি আইরিশ সুন্দরীকে নিয়ে সরে পড়লেন। এই লেলী ও'হারার সঙ্গে তাঁর জীবনের শেষ ক'টা বছর কেটে ছিল।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের অন্যতম উপন্যাস "দিবস্ব", বিশ্ব সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। "মাই লাইফ অ্যাণ্ড লাভ"—তাঁর আত্মজীবনী। অন্যমনস্কতার ভাণ করে অন্তরঙ্গ-অশ্লীল কাহিনীগুলি একের পর এক লিখে দু'টি খণ্ড পূর্ণ করেছেন। তা সত্ত্বেও জীবনী-সাহিত্যে "মাই লাইফ অ্যাণ্ড লাভ"—একটি উল্লেখযোগ্য সংযোজন।

যদিও অস্কার ওয়াইল্ড বলেছেন, Haris is asked every where—once।

তবুও সকলে একবাক্যে স্বীকার করেছেন, যে কোন মজলিশে, যে কোন সমাবেশে মধ্যমণি হয়ে থাকার যোগ্যতা ফ্রাঙ্কের পূর্ণমাত্রায় ছিল। তিনি পরিহাসপ্রিয় ছিলেন। চটুল ভাষায় কথা বলতেন। এমনকি এডওয়ার্ড সেভেন্থের সঙ্গে তাঁর বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জন্মেছিল। তাঁকে ফ্র্যাঙ্ক মজার মজার গল্প বলে চমৎকৃত করতেন।

ফ্রাঙ্ক হ্যারিসের অসংখ্য প্রেম কাহিনী বর্ণনা করবার মত স্থান এই প্রবন্ধে নেই। অবশ্য উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কাহিনী বর্ণনা করতে বাধা নেই। চিকাগোর "কেণ্ডাপিকস্" হোটেলে কাজ নিয়ে নিউইয়র্ক থেকে এখানে এসেছিলেন হ্যারিস। কিছুদিন হোটেলে চাকরি করবার পর এক মিলিওনিয়ার পশু ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হল। চাকরি ছেড়ে দিয়ে তিনি টেকসাসে চলে এলেন পশু ব্যবসায়ীর সঙ্গে। করিতকর্মা ব্যক্তি হ্যারিস। ওখান থেকে ক্যানসাসে গিয়ে এক প্রভাবশালী ব্যক্তির স্ত্রীর প্রেমে পড়লেন। উদ্দাম প্রেমলীলা চলল কিছুদিন। এই সঙ্গে চাকরি ও লেখাপড়া দুই চলতে লাগল। ক্যানসাস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ওকালতিও পাশ করলেন যথা সময়ে। ইতিমধ্যে তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ত্রাস সৃষ্টিকারী গুণ্ডা ওয়াইল্ড বিলের। শোনা যায় বিলের ঘোড়ার জিনে স্যার ষ্টুয়াট মিলের গ্রন্থাবলী বাঁধা থাকত।

হ্যারিস বেশ কিছু টাকা জমিয়ে ফেলেছিলেন। সুতরাং খেয়াল খুশীমতো কিছুদিন কাটাতে বাধা নেই। ব্যাপটিষ্ট ধর্মযাজক গ্রেগারীর বাড়িতে এসে উঠলেন পেয়িংগেষ্ট হিসেবে। সপ্তাহে চার ডলার দিতে হবে খাওয়া থাকার বিনিময়ে। মিষ্টার গ্রেগারী চার্চের কাজ নিয়ে সব সময় ব্যস্ত থাকেন। তার সঙ্গে বিশেষ দেখা হয়না ফ্র্যাঙ্কের। বাড়িতে তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে আছে, তারাই সমস্ত কিছু সামলায়।

গ্রেগারীর মেয়ে কেটকে পরমা সুন্দরী বলা চলে না। মাঝারি উচ্চতা, লালচে রং। চমৎকার স্বাস্থ্য ও শরীরের গড়ন। সব মিলিয়ে ভালই লাগে। কেট সব সময় গম্ভীর থাকে। স্মিথ তাকে ভালবাসে। আলাপ করবার ইচ্ছে থাকলেও কেটের গাম্ভীর্যর জন্য তাকে এড়িয়ে চলেন হ্যারিস। হ্যারিস পড়াশুনা ও রাজনীতি করে দিন কাটাচ্ছিলেন। হঠাৎ কেটের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা জন্মে গেল।

ঘটনাটা ঘটল বেশ নাটকীয় ভাবেই।

সেদিন কেটকে নিজের ঘরে ঝাড়া-পোঁছা করতে দেখে ঘরে প্রবেশ করে বেরিয়ে আসছিলেন হ্যারিস। কেট তাকে দেখতে পেয়ে অভাবনীয় ভাবে বলল, আপনি আমাকে এড়িয়ে চলেন কেন?

—কই নাতো?

—চলেন বইকি। আমার সঙ্গে কথা পর্যন্ত বলেন না।

—তোমার গাম্ভীর্যকে সমীহ করি, আর কিছু নয়।

—আপনি আমার মনোভাব বুঝতে পারেন নি!

হ্যারিস চঞ্চল হয়ে উঠলেন। কেট কি তাঁকে সেই সমস্ত কথার ইঙ্গিত করছে যা তিনি পছন্দ করেন, যা তিনি শুনতে ভালবাসেন! নিশ্চয় তাই।

তিনি কেটের কাছে গেলেন। অনেক কাছে।

বললেন অন্তরঙ্গ সুরে, আমি নিজের মনকে কিন্তু ঠিকই বুঝেছি। তুমি কি ভাবতে পারো না, আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি।

কেট এত পরিষ্কার কথা আশা করেনি। সে একটু চুপ করে থাকার পর ধীর গলায় বলল, তাই যদি হবে তবে মনের ভাব প্রকাশ করেননি কেন?

—সঙ্কোচে। কি ভাবে বুঝবো তুমি ভালবাসার প্রতিদান দেবে?

—এখন তার প্রমাণ পাওয়া গেছে কি?

এরপর আর কি বলার থাকতে পারে? সাহসী হ্যারিস সবলে জড়িয়ে ধরলেন কেটকে। তার নরম গালে ডুবিয়ে দিলেন নিজের তৃষিত ঠোঁট। দু'জনের নিবিড় অন্তরঙ্গতার এখানেই সূত্রপাত। এরপর উদ্দামগতিতে প্রেম এগিয়ে চলল।

সেদিন বাড়িরই এক নির্জন স্থানে দুজনের দেখা।

হ্যারিস আবেগভরে বললেন, এভাবে নয়। তোমাকে আরো কাছে পেতে চাই, কেট!

—আরো কাছে?

—হ্যাঁ। আমি তোমাকে সম্পূর্ণভাবে পেতে চাই।

লজ্জানম্র গলায় কেট বলল, তোমার কথা আমার ভাল লাগছে, হ্যারিস। তোমার কথা আমি রাখব। আজ রাত্রে ঘরের দরজা খোলা রেখো।

এতটা আশা করেননি হ্যারিস। তবু বললেন, তোমার ভয় করবে না?

কেট মৃদু হাসল।

প্রশ্নটাকে পাশ কাটিয়ে বলল, কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উঠলে কোন শব্দ হয় না। কারুর জানতে পারার সম্ভাবনা নেই। তুমি শুধু ঘুমিয়ে পড়ো না।

কেট তার কথা রেখেছিল। মাঝরাত্রে হ্যারিসের ঘরে এসে নতুন পাঠ গ্রহণ করেছিল। এই আসাই তার শেষ আসা নয়। সকলের চোখ বাঁচিয়ে নিয়মিত তাদের নর্মলীলা চলত। এদিকে দিন গড়িয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হ্যারিসের টাকাটাও শেষ হয়ে এল। এত তাড়াতাড়ি সমস্ত ফুরিয়ে যাবার কথা নয়। তাঁর ভাই এক হাজার ডলার ধার নিয়েছিল। সে ডলার না দেওয়ায় এই অবতারণা তার হয়েছে।

অগত্যা হ্যারিসকে চাকরি নিতে হল। ফ্রাংকো-জার্মান যুদ্ধের জন্য দেশের অবস্থা ভাল নয়। ইউরোপের যে অর্থ আমেরিকায় খাটছিল যুদ্ধের জন্য সমস্ত মারা গেল। অর্থনৈতিক চাপ এসে পড়ায় দেশে হাহাকার পড়ে গেছে।

সুতরাং ভাল চাকরি হ্যারিস সংগ্রহ করতে পারলেন না। কাজ পেলেন সামান্য ওয়েটারের।

হ্যারিস ওয়েটারের কাজ করছেন জানতে পেরে বিলক্ষণ ক্রুদ্ধ হলেন মিসেস গ্রেগারী। তিনি বোধহয় মেয়ের মনের খবর জানতে পেরেছিলেন। সামান্য একজন ওয়েটারের সঙ্গে মেয়েকে আর মিশতে দিতে রাজি হলেন না। কেটকে আগলে বেড়াতে লাগলেন। এদিকে কেট তাঁর সঙ্গ পাবার জন্য আগেকার মত ব্যগ্র। পরিষ্কারভাবে কিছু বলতে মিসেস গ্রেগারীর আভিজাত্যে বাধে। অগত্যা বাধ্য হয়ে তিনি কেটকে সরিয়ে দিলেন অন্যত্র।

কেটের আগেকার প্রেমিক স্মিথ হ্যারিসের সঙ্গে বন্ধুর মত ব্যবহার করে। সেও হ্যারিসের ওয়েটারের কাজ করাটা পছন্দ করল না। প্রস্তাব করল তার সঙ্গে ফিলেডেলফিয়া যাওয়ার। সেখানে একটা ভাল কাজ সংগ্রহ করে দেবে। হ্যারিসের সঙ্গে কেটের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছে একথা বোধহয় স্মিথের জানা ছিল। জানা থাকলেও সে কেন হ্যারিসের শুভচিন্তক হয়ে উঠেছিল তা সঠিকভাবে বলা যায় না।

কেট কাছে না থাকায় হ্যারিসেরও এখানে মন লাগছিল না। তিনি কালবিলম্ব না করে ফিলাডেলফিয়া যাত্রা করলেন। ওখানে এক নতুন জীবন আরম্ভ হল তাঁর। লিখতে আরম্ভ করলেন। আইন ব্যবসায়ী হিসেবে যোগ দিলেন কোর্টে। অবসর সময় তিনি লিবার্টি হলে যাওয়া আসা করেন। একদিন সেখানে রোজের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। এই সুন্দরী তরুণীর কথা স্মিথের মুখে আগেই শুনেছিলেন হ্যারিস। নিয়মিত সাক্ষাতে দু'জনের আলাপ ক্রমে গভীর হতে থাকে। হ্যারিস যথানিয়মে উপযুক্ত অবসরে বলেন, আমি—আমি তোমায় ভালবাসি, রোজ।

এই কথা যে পূর্বে আরো অনেককে বলেছেন এখন তাঁর স্মরণ হয় না। কেটের স্মৃতি যে এখনও দগদগে—তার মত মেয়ে তিনি দেখেন নি, তাকে ছাড়া তাঁর জীবন কাটতে পারে না ইত্যাদি যে সমস্ত মিষ্টি কথা বলেছিলেন তা এখন সম্পূর্ণ ভুলে যেতে চান হ্যারিস। অতীতের চেয়ে বর্তমান অনেক ভাল।

রোজ মৃদু গলায় বলল, পুরুষরা চমৎকার ভাবে ভালবাসার ফাঁকা বুলি আওড়াতে পারে।

তুমি আমার আন্তরিকতাকে অবিশ্বাস করছো?

—চর্তুদিকে যা দেখছি তাই বললাম।

—সমস্ত পুরুষ এক রকম হয় না। কেউ যদি তোমাকে বঞ্চনা করে থাকে সে জন্য আমি মর্মাহত। আমার উপর অবিচার করো না।

সুচতুর বাকপটু হ্যারিসের সঙ্গে রোজের পেরে ওঠার কথা নয়। শেষ পর্যন্ত

নিজের সংযম বজায় রাখতে পারল না রোজ। তার যৌবন নিয়ে খেলা করলেন হ্যারিস। তবে একথা তিনি বুঝেছিলেন, জেসি বা কেটের মত রোজ সাধারণ মেয়ে নয়। তাকে নিয়ে দিনের পর দিন খেলা করা চলবে না, তার আন্তরিক ভালবাসার প্রতিদান দিতে হবে।

রোজের মত স্ত্রী পাওয়া ভাগ্যের কথা। তাকে বিয়ে করে সহজেই তিনি আর দশজনের মত চমৎকারভাবে জীবন কাটাতে পারতেন। কিন্তু হ্যারিসের সদা অস্থির মন এতে সায় দেয়নি। তিনি রোজকে হতবাক করে দিয়ে একদিন ইউরোপের পথে পাড়ি জমালেন।

এবার লণ্ডনে—

হ্যারিসের ভাগ্য ভাল। লণ্ডনে আসার পরই 'ফর্ট নাইটলি' পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লেন এবং এখানে কাজ করার সূত্রেই একটি নারীরত্নের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হল। সেই কথাতেই এবার আসা যাক।

একজন মহিলা লেখিকার সঙ্গে পত্রিকার পক্ষ থেকে সাক্ষাৎ করা প্রয়োজন ছিল। হ্যারিস গেলেন। পরিচারিকা তাকে ড্রইংরুমে বসাল। সেখানে একটি তরুণীও গৃহকর্ত্রীর অপেক্ষায় বসেছিল। হ্যারিস ভাল করে তাকে দেখেন। যৌবনের ভারে ফেটে পড়ছে যেন। অপূর্ব সুন্দর মুখ। পোশাক-পরিচ্ছদ শালীনতার পরিচায়ক।

হ্যারিস আলাপ করবার জন্য অতিমাত্রায় ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মেয়েটি নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে রয়েছে। অগত্যা প্রচলিত নিয়মেই আলাপের সূত্রপাত করতে অগ্রসর হলেন হ্যারিস।

—এইভাবে অপেক্ষা করাটা বিরক্তিকর, কি বলেন?

চমকে ওঠে মেয়েটি। তারপর অল্প একটু হেসে বলে, অপেক্ষার পাত্রটি কেমন তার উপরই সমস্ত কিছু নির্ভর করে।

—তা বটে। আচ্ছা আপনি কি ইংরাজ?

—খাঁটি নই। অর্দ্ধেক আইরিশ।

—আমাকে অর্ধেক ওয়েলস্ বলতে পারেন। আমার নাম ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস। আপনার— ?

—লরা।

কথা চলতে থাকে। হ্যারিস ক্রমে জানতে পারেন, লরার বাবা একজন ব্রোকার। তারা গাওয়ার স্ট্রীটে থাকে। সে নিজের সৌন্দর্য সম্পর্কে সম্পূর্ণ সচেতন। অভিনেত্রী হয়ে ষ্টেজে দেখা দিতে পারলে নাম করতে পারবে। কিন্তু বাবা-মার রক্ষণশীলতার জন্য তার ইচ্ছা পূর্ণ হচ্ছে না। শেষে সে নিজেদের বাড়িতে হ্যারিসকে আমন্ত্রণ জানাল।

হ্যারিস এই তো চান। আবহমান নারীঘটিত ব্যাপারে তিনি যা চেয়েছেন তাই হয়েছে—ভগবানের বিচিত্র আশীর্বাদ। নির্দিষ্ট দিনে লরাদের বাড়ি গেলেন হ্যারিস। সকলের সঙ্গে পরিচয় হল। তারপর নিয়মিত যাওয়া আসা আরম্ভ করেন। লরাকে থিয়েটার দেখালেন। লরার বাবা প্রস্তাব করলেন ক্রিসমাস ব্রাইটনে কাটান যাক।

এই প্রস্তাব গ্রহণ করলেন হ্যারিস। লণ্ডনের এই জনবহুল পরিবেশ ছেড়ে ওখানকার খোলামেলায় আরো অন্তরঙ্গ হতে পারবেন লরার। সুতরাং এই প্রস্তাব গ্রহণ করা নিশ্চিতভাবে বুদ্ধিমানের কাজ। সকলে ব্রাইটনে এলেন। এখানকার চমৎকার পরিবেশ সকলকে উল্লসিত করে তুলল।

হ্যারিস বললেন, তোমার মত সুন্দর মেয়ে এর আগে আর দেখিনি।

লরার লাল গণ্ডদু'টি আরো লাল হল।

—এ তোমার মনের কথা নয়।

—সম্পূর্ণ মনের কথা। তোমার মুখশ্রী, তোমার পুরন্ত দেহ আমাকে পাগল করে তুলেছে। লরা বুঝতে চাইল হ্যারিস কি বলতে চাইছেন। সে তটস্থ হয়ে ওঠে। নিজেকে গুটিয়ে নেয়। অন্য কথার অবতারণা করে।

আবার আসে সুযোগ। সস্ত্রীক মিস্টার ক্ল্যাপটন বেরিয়েছেন বাড়িতে আর কেউ নেই।

হ্যারিস আবেগভরে বললেন, তুমি কি বুঝতে পারছো না, আমি তোমায় কত ভালবাসি। তোমাকে সম্পূর্ণ করে পেতে চাই।

হ্যারিস জাপটে ধরলেন লরাকে। তাঁর উত্তপ্ত ওষ্ঠ স্পর্শ করতে লাগল লরার মসৃণ গাল ও ঠোঁট। লরা সরে আসবার চেষ্টা করে।

—না—না—

—না,—কেন—?

—কিন্তু—

হ্যারিস সরে আসে!

—তোমার মনের ভাব বুঝতে পারছি। অর্থ ও প্রতিষ্ঠা অর্জন করবার জন্য তুমি আমাকে একটা বছর সময় দাও। বল, তারপর আমায় বিয়ে করবে তো?

লরা বলল, আমি তোমায় ভালবাসি। অপেক্ষা করব তোমার জন্য।

এতদিনে হ্যারিস বুঝি সত্যি কাউকে ভালবেসেছেন। লরাকে বিয়ে করে ঘর বাঁধার স্বপ্নও তিনি দেখেছেন। নিষ্ঠার সঙ্গে কাজকর্ম করে এবার কিছু অর্থ সঞ্চয় করতে হবে। ওখানে কয়েকদিন থাকার পর সকলে লণ্ডনে ফিরে এলেন। ব্রাইটনের সমস্ত ব্যয়ভার হ্যারিসই বহন করলেন। লণ্ডনে এসে এক মারাত্মক কথা বললেন মিস্টার ক্ল্যাপটন, তোমার উদারতার জন্য প্রশংসা করতে হয়, হ্যারিস। ব্রাইটনের সমস্ত খরচ তুমিই দিলে। আরেকটা কথা বলার ছিল—

—সঙ্কোচ করবেন না। বলুন—

বর্তমানে আমার অবস্থা ভাল নয়। বিশেষ প্রয়োজনে কিছু অর্থ সাহায্য করতে হবে আমাকে। এই ধর—

অর্থের অঙ্ক বললেন, মিস্টার ক্ল্যাপটন। অত্যন্ত আতান্তরে পড়লেন হ্যারিস। বর্তমানে অত অর্থ তিনি কোথা থেকে পাবেন? অথচ লরাকে পেতে গেলে তার বাবাকে অসুখী করা চলতে পারে না। যা ছিল দিয়ে দিলেন। নিজের অবস্থা কপর্দকশূন্য হয়ে পড়ল। আপ্রাণভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন অর্থ সংগ্রহের। প্রচুর অর্থ হাতে আসবার পর বিয়ে করবেন লরাকে। সময় মাত্র একবছর।

দ্রুতগতিতে সময় কেটে চলল।

লিসিয়াম থিয়েটারে আরভিং-এর কি একটা নাটক চলছে। অসম্ভব ভিড়। হ্যারিস গিয়েছিলেন ওখানে। হঠাৎ তিনি দেখলেন, একটা গাড়ি থেকে লরা নামছে। লরার সঙ্গী একজন সম্ভ্রান্ত চেহারা ও পোশাকে সজ্জিত যুবক। দু'জনে অন্তরঙ্গভাবে কথা বলতে বলতে হলে ঢুকে গেল। স্তব্ধ হয়ে দেখলেন হ্যারিস।

লরার মনে নতুন করে রঙ ধরে। তিনি এখন অতীত। আত্মধিক্কারে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করল। যার জন্য তিনি অর্থের উপর কোন মায়া মমতা প্রকাশ করেন নি—লরা তাঁর মহত্ত্বের কথা চিন্তা না করে অন্যের প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছে।

আর নয়, আর লরার কথা ভাববেন না তিনি।

এরপর কেটে গেছে অনেকদিন। হঠাৎ আবার লরার সঙ্গে দেখা। দেখা সেই সিলিয়ান থিয়েটারের সামনেই। এবার সঙ্গে তার কেতাদুরস্ত সেই যুবক নেই। হ্যারিস এড়িয়ে চলে যেতেই চাইছিলেন, লরা তাঁর পথ রোধ করল।

বলল অনুযোগ ভরা গলায়, কোথায় থাক আজকাল? আমার সঙ্গে দেখা করার কি বিন্দুমাত্র ইচ্ছে করে না?

এই কথার উত্তরে অনেক কিছুই বলার ছিল হ্যারিসের। তা তিনি বললেন। না বলে কি হবে? শুধু মিথ্যার জাল বুনে যাবে লরা।

—ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলাম। তারপর—

অনেক কথা হল দু'জনের এই ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়েই। হ্যারিস 'ক্রাইটেরিয়ান কাফে'তে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানালেন ওকে। 'ক্রাইটেরিয়ানে" আহার চমৎকার পরিবেশে উত্তীর্ণ হয়। হ্যারিস পরের দিন দুপুরে আবার ওকে আহ্বান জানালেন। আহারের পর হোটেলের নিভৃত কক্ষে পৌঁছালেন দু'জনে। হ্যারিস দরজা বন্ধ করে দিলেন।

কক্ষে তখন দু'টি একান্ত মিলনউৎসুক নর-নারী।

হ্যারিস সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, লরার আগেকার সেই আড়ষ্ট ভাব আর নেই।

লরা নিঃসংকোচে এগিয়ে আসে তাঁর কাছে—অনেক কাছে। নিবিড়ভাবে ওকে বাহুবন্ধনে গ্রহণ করলেন হ্যারিস। চুম্বনেতে ভরিয়ে দেন ওর সমস্ত মুখ। তারপর দু'জনে এগিয়ে চলেন বিছানার দিকে। হ্যারিসের অনেক দিনের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়।

দিনের পর দিন কেটে চলে।

হ্যারিস প্রাণভরে পান করতে থাকেন লরাকে। বিয়ের কথা আর বলেন না। বলতে ইচ্ছা করে না। এখন তিনি বুঝতে পারেন আগের মত লরার মধ্যে আর সে উত্তাপ নেই। অনেক পুরুষের কাছেই সে নিজেকে প্রকট করেছে। এ মেয়েকে বিয়ে করে লাভ কি? ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াল যে লরার প্রতি আকর্ষণ হারালেন হ্যারিস। লরা সহজেই তাঁর মনের অবস্থা বুঝতে পারল।

অনন্যোপায় হয়ে ওকে বলতে হল, তুমি আমাকে আর চাও না বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। কিন্তু আমাকে চাইবার লোকের অভাব নেই। মিস্টার হজ আমাকে ভালবাসেন, তিনি আমাকে বিয়ে করতে চান। তাঁর অনেক টাকা আছে।

হ্যারিস কিছু বলেন না। সিগারেটের ধোঁয়ার মত সমস্ত কিছু উড়িয়ে দিতে চান। লরার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শেষ হয়। এতে তিনি বিন্দুমাত্র দুঃখিত নন।

এর পর তাঁর জীবনে এল হন এডিথ। এই তরুণী বিধবা এবং ধনবতী। এডিথের কাছে বাঁধা পড়লেন হ্যারিস। তাঁদের বিয়ে হয়ে গেল।

এরপর আর দশজনের মত যে স্ত্রীর প্রতি একাগ্রচিত্ত হয়ে রইলেন, তা নয়। প্রাথমিক মোহ কেটে যাবার পর আবার উদ্দাম হয়ে উঠলেন। পরবর্তী জীবনে আরো অসংখ্য মেয়ের ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে এসেছিলেন হ্যারিস। ১৯০৭ সাল থেকে ১৯১০ সাল পর্যন্ত লণ্ডনের বিদগ্ধ সমাজ তাঁকে নিয়ে হৈ হৈ করলেন। এই সময় রাশিয়ার এক নর্তকী সম্পর্কে মন্তব্য করায় তাঁর একমাস জেল হল। জেল থেকে বেরিয়েই তিনি লিলি ল্যাংট্রির কিছু গোপনীয় কাগজপত্র নিয়ে আমেরিকায় পাড়ি জমালেন। সেখান থেকে লিলিকে ব্ল্যাকমেল করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু কোন ফল হল না।

১৯২২ সালে হ্যারিস লীসে এসে বসবাস আরম্ভ করলেন। এখানে তাঁর বিখ্যাত অশ্লীল আত্মজীবনী "মাই লাইফ অ্যাণ্ড লাভ" শেষ করেন। তাঁর জীবনের শেষ দিন ঘনিয়ে আসবার সময় তিনি বার্ণাড শ'র জীবনী লিখছিলেন। শেষ করে যেতে পারেন নি। শেষ করেছেন স্বয়ং শ।

ইংরাজী সাহিত্যের এই বহু বিতর্কিত চরিত্র ফ্রাঙ্ক হ্যারিস আজীবন বহুনারীকে প্রেমের খেলায় মাতিয়ে ১৯৩১ সালে ইহলোক ত্যাগ করেন।

সংগ্রামী প্রেমিক গোর্কী

কয়েকদিন থেকেই প্রাকৃতিক অবস্থা ভাল নেই। ভল্‌গার উত্তাল তরঙ্গ কেমন নিস্তেজ হয়ে পড়েছে। কালো জল আরো কালো, আরো গাঢ় হয়ে উঠেছে। প্রচণ্ড দুর্যোগের ইশারা। সন্ধ্যা হতে না হতেই তুষার ঝঞ্ঝা আরম্ভ হল।

রাশিয়ার একটি ক্ষুদ্র জনপদ ডবরিঙ্কা।

রক্তজমাট করা এই ঠাণ্ডায় ডবরিঙ্কার প্রতিটি মানুষ নিজের গৃহের জ্বলন্ত চুল্লী ঘিরে বসে আছে। তরুণ আলেকসির কিন্তু নিজের দেহকে উষ্ণ করার কোন সুবিধা নেই। তাকে দীর্ঘ ভয়াবহ রাত রেলের গুদাম পাহারা দিয়ে কাটাতে হবে। আগে নিজেদের গ্রামে থেকেই এটা ওটা কাজ করতো। ভাল লাগত না এই জীবন। খামারের মজুর বারিনভের মনের অবস্থা তারই মত। সে একদিন বলল, আর এখানে নয়, চল বেরিয়ে পড়া যাক।

আলেকসির মনোগত ইচ্ছাও তাই, একজন সঙ্গী পেলেই অনির্দিষ্টের পথে বেরিয়ে পড়বে। দু'জনে একদিন এস্ত্রাখান. যাত্রী স্টীমারে চেপে বসল। সামরায় আসার পর বারিনভের সঙ্গে আর থাকতে মন চাইল না আলেকসির। সে ঘুরতে ঘুরতে একাই একদিন পৌঁছাল ভল্‌গা প্রান্তীয় ব্রাঞ্চ রেলওয়ে স্টেশন ডবরিঙ্কায়।

অল্প বয়স ও বিশাল চেহারা দেখে স্টেশন মাস্টার তাঁকে রেলওয়ে গুদামের পাহারাওয়ালার পদে বহাল করলেন। আরেকটি বিষয় তাঁকে আকৃষ্ট করেছিল, আলেকসি চমৎকার গান গাইতে পারে। স্টেশন ছোট হলেও, গুদামে প্রচুর মাল জমা রাখতে হত। বিশেষ করে ময়দা। স্থানীয় কসাকরা ময়দার বস্তা চুরি করতে ওস্তাদ। তাই বিশেষ পাহারার ব্যবস্থা করতে হয়। তবু চুরি বন্ধ হয় না।

কসাকরা অত্যন্ত ধূর্ত। তারা নিজেরা চুরি করতে আসে না। তারা পাঠায় সুন্দরী যুবতী লিওস্কাকে। পূর্ণ যৌবনা লিওস্কা নির্লজ্জভাবে নিজের দেহের সৌন্দর্যকে অনাবৃত করে পাহারাওয়ালাদের সামনে। তাদের প্রলুব্ধ করে কামনার স্রোতে ঝাঁপ দিতে। অনেকেই এই দুরন্ত প্রলোভন উপেক্ষা করতে পারে না। বিনিময়ে লিওস্কা পায় ময়দার বস্তা। আলেকসি মেয়েটির কথা ভাবে। তাকে সে কোনদিন একলা পায়নি। রাতের ডিউটি তার কম। কি জঘন্য জীবন মেয়েটির। অবশ্য শুধু ওকে দোষ দেওয়া যায় না। এখানকার সামাজিক পরিবেশ যেন নোংরা আঁচল দিয়ে মোড়া।

তার পরিচয় সে এখানে পা দেবার দ্বিতীয় দিনেই পেয়েছে। সন্ধ্যার পর স্টেশন মাস্টার ডেকে পাঠালেন। তাঁর বাড়িতে প্রায়ই এক বিচিত্র আসর বসে। উপস্থিত থাকেন দারোগা, পাদ্রী, আরো অনেকে। কয়েকজন নারীও। আজকের এই আসরে আলেকসিকে গান গাইতে হবে। গান আরম্ভ হল, সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হল উদ্দাম নৃত্য। তারপর এক অবিশ্বাস্য ঘটনা ঘটল, অবশ্য আলেকসি না দেখলেও নিয়মিত এই রকমই ঘটে থাকে। হঠাৎ নাচ থেমে গেল। স্টেশন মাস্টারের আদেশে একজন পুরুষ নারীদের বিবস্ত্র করে ফেলল। আলেকসির মনে হল, উলঙ্গ নারী দেহগুলিকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলবার জন্য হিসহিসিয়ে উঠেছে সমবেত আদিম পুরুষরা। সে পালিয়ে এল ওখান থেকে। বাসায় ফিরে সেই আলেকসির মনে হল, পালিয়ে আসা উচিত হয়নি। এর চেয়েও নগ্নচিত্র দেখার অবকাশ তো সে পেয়েছে। সে দেখেছে, তার মা ভার্ভারা হাসি মুখে দেহদান করছে পরপুরুষকে।

ওভারকোটের কলার ভাল করে তুলে দিল আলেকসি। শীতে সমস্ত শরীর দুমড়ে আসছে। আজ যদি লিওস্কা আসে ভাল হয়। এই ঘৃণ্যচরিত্রের মেয়েটির উপর কেমন দুর্বলতা এসে গেছে আলেকসির। সঙ্গদোষে খারাপ হয়ে গেছে। এখনও পথ দেখালে ভাল হতে পারে। ছোটবেলা থেকেই আলেকসি নিজের চতুর্দিকে অজস্র নারীঘটিত ব্যাপার লক্ষ্য করেছে. কিন্তু জড়িয়ে পড়েনি। তাছাড়া একমুঠো অন্নের চিন্তায় তাকে এত ব্যস্ত থাকতে হয়েছে যে, অন্য কিছুর উপর লোভ করবার অবকাশ তার ছিল না। তাছাড়া কোন মেয়ে এগিয়েও আসেনি তার দিকে।

এখন অন্নচিন্তা সম্পর্কে অনেকটা নিশ্চিন্ত হওয়ায় মন অনেক হাল্কা হয়েছে। আর দশজনের মত নানা চিন্তা করবার অবকাশ এসেছে। লিওস্কার কথা প্রায়ই শোনে। শুনতে শুনতে তার উপর আকর্ষণ এসে পড়া অস্বাভাবিক নয়। নষ্ট চরিত্র লিওস্কাকে সুযোগ দিলে সে নিশ্চিতভাবে তার যোগ্য হয়ে উঠবে, এ বিশ্বাস আলেকসির আছে।

রাত আরো গভীর হল। আলেকসি লক্ষ্য করল সন্তর্পণে গেটের একধারে এসে দাঁড়াল লিওস্কা। দু'জনে মুখোমুখি হল। একজন নতুন লোককে দেখে লিওস্কা একটু ঘুরে ঘাবড়াল, কিন্তু এই ভাব তাঁর এক মিনিটের বেশি স্থায়ী হল না। আস্তে আস্তে নিজের ছলাকলা আরম্ভ করল। ঘনিষ্ট হয়ে এল আলেকসির।

দু'পা পেছিয়ে গিয়ে আলেকসি বলল, তোমার কথা আমি অনেক শুনেছি। সত্যি কথা বলতে কি, এই ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ রাতে তোমার অপেক্ষাতেই ছিলাম।

বিচিত্র হাসি দেখা দিল লিওস্কার ঠোঁটে।

—বয়স তো তোমার খুবই অল্প দেখছি। এই ঠাণ্ডায় আমাকে আর অপেক্ষা

করিও না। নিজের মন তাড়াতাড়ি ভরিয়ে নিয়ে ময়দার বস্তা বার করে দাও।

—এই কদর্য জীবন তোমার ভাল লাগে?

—আর কথা বাড়িও না। যা করবার তাড়াতাড়ি কর।

ভেবে দেখেছো কি, নিজের জীবনটাকে নষ্ট করে ফেলেছো। একবারও কি তোমার মনে হয়েছে যে, আমার মত তরুণকে বিয়ে করে তুমি অনেক সুখে থাকতে পার, অনেক শান্তি পেতে পার।

চোখ নাচিয়ে লিওস্কা বলল, তোমার তো সাহস কম নয়, আমায় বিয়ে করতে চাও? নিজের স্বাধীনতা খুইয়ে সতী সাধ্বী নারী হওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আচ্ছা গোলমালে পড়া গেল তো। পুরানো পাহারাওলারা সব গেল কোথায়?

আলেকসির সমস্ত কল্পনা ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। সে নিজের করে কাছে টেনে নিতে চাইছিল। যে ভাল হবে না বলে বদ্ধপরিকর তাকে কি কখনও ভাল করা যায়। চাকরিও তার আর ভাল লাগল না। লিওস্কার কাছ থেকে শুধু যে দূরে থাকতে চায় তাই নয়। স্টেশন মাস্টারের আয়োজিত উৎকট কুরুচিপূর্ণ মজলিসে বারবার আহ্বানকেও এড়াতে চায়। মাস কয়েক কাজ করার পর সত্যি আলেকসি কাজে ইস্তফা দিয়ে ডবরিঙ্কা ত্যাগ করল।

এইভাবে ম্যাক্সিম গোর্কীর প্রথম প্রেমের স্বপ্ন মিলিয়ে গেল।

ম্যাক্সিম পিয়েশকভ ও ভার্ভারা প্রেম করে বিয়ে করেছিলেন। তাঁদের প্রেমের মিলিত কুসুম সর্বকালের অন্যতম কথাশিল্পী ম্যাক্সিম গোর্কী জন্মগ্রহণ করেন ১৮৬৮ সালের ১৪ই মার্চ। আলেকসি তাঁর প্রকৃত নাম—'গোর্কী' ছদ্মনামে তিনি নিজের লেখক জীবন আরম্ভ করেন। অল্প বয়সেই পিয়েশকভ মারা গেলেন। ভার্ভারা চার দেওয়ালের মধ্যে বন্দী থাকা পছন্দ করলেন না। ছেলেকে তার দিদিমার হাতে সঁপে দিয়ে স্রোতের টানে গা ভাসিয়ে দিলেন। অচিরেই হয়ে উঠলেন বহুবল্লভা। অবস্থাহীন দাদামশায়ের বাড়িতে গোর্কীর দিন অতিবাহিত হতে লাগল। নিশ্চিন্তে নয়, মামা ও মামাতো ভাইদের অত্যাচার তাঁকে সহ্য করতে হত। লেখাপড়ায় তাঁর মেধা কেমন ছিল, তা জানবার উপায় নেই আজ। কারণ তিনি তখন পড়াশুনার সুযোগ পাননি। আট বছর বয়স থেকেই তাঁকে রোজগারের ধান্দায় ঘুরতে হত। ক্রমে দাদামশাইও গোর্কীর উপর বিরক্ত হয়ে উঠলেন। তাঁকে বাড়ি থেকে বার করে দিতে পারলে বাঁচেন।

এই সময় কোথা থেকে ফিরে এলেন ভার্ভারা। এক নাগাড়ে উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করায় বোধহয় শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। ম্যাক্সিমভ ছাড়া আর কারুর সঙ্গে মিশতে চান না। দু'জনের বিয়ে হয়ে গেল একদিন। সৎবাবা ও মার সঙ্গে গোর্কী

দাদামশায়ের ওখান থেকে নতুন বাড়িতে উঠে এলেন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। এবার নিশ্চিন্ত মনে পড়াশুনা আরম্ভ করতে পারবেন। কিন্তু তাঁর এই আশা শূন্যে মিলিয়ে গেল অল্প দিনের মধ্যেই। সৎবাবা ম্যাক্সিমভ গালাগালি ও প্রহারে তাঁকে ব্যতিব্যস্ত রাখেন। স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যেকার সম্পর্কেরও দ্রুত অবনতি ঘটতে লাগল। ম্যাক্সিমভ একদিন নির্দয়ভাবে ভার্ভারাকে প্রহার করছেন দেখে গোর্কী আর স্থির থাকতে পারলেন না, ছুরি নিয়ে আক্রমণ করলেন সৎবাবাকে। সেদিন রক্তারক্তি ঘটে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। ভার্ভারাই ছেলের হাত থেকে কোন রকমে বাঁচালেন স্বামীকে। তাঁর শরীর ভেঙ্গে পড়েছিল। এই ঘটনার কিছুদিন পরেই তিনি মারা গেলেন। মাতৃ বিয়োগের পর গোর্কীর আর কোন বন্ধন রইল না। মুক্ত আকাশের নিচে তিনি এসে দাঁড়ালেন। বেঁচে থাকার জন্য আরম্ভ হল কঠিন সংগ্রাম। এক টুকরো রুটির জন্য তিনি কি করেন নি? ক্ষেতের মজুর থেকে আরম্ভ করে, জঙ্গল থেকে পাখি ধরে এনে বিক্রী পর্যন্ত তাঁকে করতে হয়েছে। তখন তাঁর সেই বয়স যে বয়সে আমাদের ঘরের ছেলেমেয়েরা ঠাকুরমার কাছ থেকে রূপকথা শুনে থাকে। পৃথিবীতে নিশ্চিন্তে বেঁচে থাকা কত কঠিন, প্রথম জীবনের অভিজ্ঞতা থেকে তা মর্মে মর্মে উপলব্ধি করেছিলেন গোর্কী। বয়স ক্রমে তাঁর বেড়েছে। অভিজ্ঞতাও বেড়েছে। অনেক ঘাটের জল খেয়েই তিনি পৌঁছেছিলেন ডবরিঙ্কায়? ওখানকার চাকরি ছেড়ে দিয়ে অনেক পথ মাড়িয়ে আবার চাকরির সন্ধান পেলেন গোর্কী। এবারকার চাকরি বেশ উন্নত ধরনেরই বলা চলে। ললিন একজন এটর্নী। তাঁর কেরানি। অত্যন্ত সাদা মনের মানুষ লনিন। অল্পদিনের মধ্যেই কর্মচারীকে ভালবেসে ফেললেন। গোর্কীও মন প্রাণ ঢেলে কাজ করেন। কেটে গেছে কয়েক মাস। একদিন একটা দরকারী কাগজ এগিয়ে ধরে লনিন বললেন, একি করেছো?

সবিস্ময়ে গোর্কী দেখলেন, আদালতের কাগজের উপর তিনি কবিতা লিখেছেন। সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারেই লিখে ফেলেছেন। আজকাল লেখার প্রেরণা পান। মাঝে মাঝে লেখেন তাই বলে আদালতের কাগজের উপর।

সসঙ্কোচে বললেন, অন্যায় হয়ে গেছে, স্যার।

—তোমার আজকাল কি হয়েছে বলতো? অত্যন্ত অন্যমনস্ক থাক। কোন মেয়ের প্রেমে পড়ে গেলে নাকি?

প্রেম! গোর্কী চমকে উঠলেন। কোন মেয়েকে আন্তরিকভাবে পেতেই তো তিনি চান। কিন্তু কেউ তো এগিয়ে আসে না। তাঁর আর্থিক অসচ্ছলতাই এর জন্য দায়ী। বললেন, শরীর বিশেষ সুস্থ নেই। রাতে ঘুম হয় না।

গোর্কী আর আগেকার মত একা একা থাকতে চান না। একটি দলে তিনি যোগ দিয়েছেন। সেখানে অনেকের সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে উঠেছে। একদিন স্থির হল সকলে

মিলে ওকা নদীতে বোটিং করবেন। ওই সঙ্গে আরও স্থির হল, ফ্রান্স প্রত্যাগত রাজনৈতিক কারণে প্রবাসী পোলাণ্ডের বোলেশ্লাভকে সস্ত্রীক আমন্ত্রণ করা হবে। গোর্কীর উপর ভার পড়ল তাঁদের আমন্ত্রণ জানিয়ে আসার।

গোর্কী সেই বিদেশী ভদ্রলোকের বাড়িতে গেলেন। দরজায় করাঘাত করে ভিতরে ঢুকতেই দাড়ি-গোঁফে আচ্ছন্ন এক মধ্যবয়সী ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি কর্কশ গলায় প্রশ্ন করলেন, কি চাই আপনার?

গোর্কী নিজের পরিচয় দিলেন।

এই সময় একটি তরুণী পিছন থেকে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

—আপনার এমন বিচিত্র বেশ কেন?

গোর্কীর সাজ-পোশাকে কিছু বৈচিত্র্য ছিল বৈকি। পরনে নীল রঙ-এর ট্রাউজার। গায়ে হোটেলের বয়েদের মত সাদা জ্যাকেট কোট। পায়ে শিকারীদের বুট। মাথায় ইতালিয়ান টুপি।

—আমার পোশাক কি আপনার অদ্ভুত লাগছে?

আবার একচোট হেসে নিয়ে তরুণী বলল, তা লাগছে বই কি।

গৃহস্বামী বোলেশ্লাভের শ্মশ্রুল মুখের দিকে তাকিয়ে গোর্কী প্রশ্ন করলেন, ইনি-কি আপনার বাবা, না বড়ভাই?

গম্ভীরভাবে বোলেশ্বাভ বললেন, স্বামী।

—মাপ করবেন।

আর এখানে অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করলেন না গোর্কী। নিমন্ত্রণের কথা জানিয়ে ওখান থেকে বিদায় নিলেন। চলে এলেন বটে, কিন্তু মন পড়ে রইল ওখানেই। তরুণীটিকে দেখামাত্রই হৃদয় হারিয়েছেন গোর্কী। তাঁর হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে সমাহিত হয়েছে তার প্রাণখোলা হাসি। তার জীবনে এইরকম অনাবিল হাসিরই প্রয়োজন। সমস্ত রাত পায়চারি করেই কেটে গেল। গোর্কীর মন বারংবার সমবেদনায় ভরে উঠতে লাগল। এই অনিন্দ্যসুন্দরী তরুণীটিকে একজন নিরস প্রৌঢ় করায়ত্ব করে রয়েছে।

এরপর এল সেই মধুর দিনটি। অনেকগুলি নৌকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। বোলেশ্লাভ কয়েকজনের সঙ্গে উঠলেন একটি নৌকায়। ওলগার (বোলেশ্লাভের স্ত্রী) সঙ্গে অন্য একটি নৌকায় উঠলেন গোর্কী। এগিয়ে চলল নৌকা। চতুর্দিকে জল আর জল। নৌকার মধ্যে শুধু ওঁরা দু'জন। এত আনন্দ জীবনে আর কখনও পাননি গোর্কী। অজস্র পুলকে তিনি পাগল হয়ে যাবার উপক্রম হলেন।

নৌকা অপর পারে পৌঁছাল। পাড় কাদায় ভর্তি। পিছলে পড়ার সম্ভাবনা থাকায়

ওলগা নামতে পারল না। গোর্কী নেমে দাঁড়িয়ে বললেন, নৌকায় বসে থাকলে তো হবে না। নামতে তো হবেই।

ওলগা কিছু বলল না। শুধু নিজের দু'হাত বাড়াল।

এত বড় সৌভাগ্য গোর্কী আশা করেন নি। একটু ইতঃস্তত করে ওলগার নরম দেহ তিনি কোলে তুলে নিলেন। নামিয়ে দিলেন নিরাপদ জায়গায়।

হাসিমুখে ওলগা বলল, আপনি শক্তিমান পুরুষ।

—আপনাকে এইভাবে নিয়ে আমি মাইল সাতেক অবলীলাক্রমে যেতে পারি।

সমস্ত দিন কাটালেন গোর্কী আচ্ছন্ন ভাব নিয়ে। নারীর এই ঘনিষ্ঠ স্পর্শ তাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করল। ওলগার মনেও প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছে। এই আশ্চর্য যুবককে সে গভীরভাবে জানতে চায়। পিকনিকের পরেও নিয়মিত দু'জনের দেখা হতে লাগল। ক্রমে গোর্কী জানতে পারলেন ওলগা শিক্ষিতা মেয়ে। প্যারিসে সে অঙ্কন কলা ও ধাত্রী-বিজ্ঞান অধ্যায়ন করেছে। বয়সেও তাঁর চেয়ে বেশ কয়েক বছরের বড়।

গোর্কী সঙ্কুচিত হলেন। বয়সের ব্যবধান তেমন নয়। তবে—। তাঁকে শিক্ষিত বলা চলে না। উঁচু মহলের লোক তো ননই। এক্ষেত্রে ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করা কি বাঞ্ছনীয়? হয়তো ওলগার মনে তাঁর প্রতি কোন দুর্বলতাই নেই। একজন সাধারণ সঙ্গী হিসেবে সে হয়তো নিজের পাশে তাঁকে জায়গা দিয়েছে।

এইরকম যখন মনের অবস্থা, ঠিক সেই সময়ে একটা দুর্ঘটনায় পড়লেন গোর্কী। নদীতে স্নান করতে গিয়েছিলেন, উপর থেকে লাফ দিয়ে জলে পড়বার সময় বুকে আঘাত লাগল। তাঁকে যেতে হল হাসপাতালে। তিনি কল্পনা করতে পারেননি ওলগা তাঁকে দেখতে আসবে। বাস্তবে তাই ঘটল। ওলগা এল হাসপাতালে।

বুভুক্ষুর মত তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলেন গোর্কী। তাঁর চোখের ভাষা কি পড়তে পারছে ওলগা? কুশল বিনিময় হল। ওলগা বলে চলল কত কথা। গোর্কী শুধু তাকে দেখতে থাকলেন।

—কি দেখছো এত?

—তোমাকে দেখছি। একটা কথা শুনবে?

—বলো?

সুস্থ থাকলে বলতে পারতেন কিনা সন্দেহ।

তবু সঙ্কোচকে সম্পূর্ণ এড়িয়ে যেতে পারলেন না। বাধ বাধ গলায় বললেন, বেশ কয়েক দিন থেকে বলব বলব করেও বলতে পারিনি। আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা কোরো! আমি তোমায় ভালবেসে ফেলেছি।

ওলগা মাথা নত করল।

—তুমি আঘাত পেলে?

—না।

—আমার ওপর তোমার কি কোন রকম দুর্বলতা নেই, ওলগা?

ওলগা মৃদু হেসে সমর্থন জানায়। গোর্কীর বুকের উপর থেকে পাষাণ ভার নেমে যায়। এই প্রথম তিনি অনুভব করলেন, ক্ষেত্র বিশেষে তাঁর ভাগ্যও সুপ্রসন্ন হতে পারে। অনেক কথা হল দু'জনের মধ্যে।

শেষে গোর্কী চরম প্রশ্নটি উচ্চারণ করলেন, আমাকে বিয়ে করবে?

—বিয়ে! এই ধরনের প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে ওলগা ভাবতে পারেনি।

—আমি তোমার চেয়ে অনেক বড় আলেকসি। আমাকে তোমার বিয়ে করা উচিত নয়। তাছাড়া আমার দু'টো বাচ্চা আছে। এই অল্প বয়সে এত দায়িত্ব তুমি কেন নিতে যাবে?

—দায়িত্ব পালনে আমি কুণ্ঠিত নই। তুমি শুধু কথা দাও।

গোর্কীর কথা শুনে ওলগার চোখ থেকে জল গড়িয়ে পড়ল।

—আমাদের মিলন কিভাবে সম্ভব আমি বুঝতে পাচ্ছি না আলেকসি, স্বামীর প্রতিও একটা কর্তব্য রয়েছে।

তোমার কথা মানলাম। সে ভদ্রলোকও কি সমস্ত কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন? তোমরা দু'জনে কি সুখে আছো?

ওলগা নীরব রইল।

আবেগভরে গোর্কী আবার বললেন, আমার প্রতিও কি তোমার কোন কর্তব্য নেই?

ওলগার মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলছিল। সে বলল, শেষপর্যন্ত কোন কিছুই চাপা থাকবে না। জানাজানি হবার আগেই আমি স্বামীকে বলব সমস্ত কথা।

ওলগার সঙ্গে আবার দেখা হল পরের দিন।

সে স্বামীকে বলেছিল সমস্ত কথা। তিনি মর্মাহত হয়েছেন। তবুও স্ত্রীকে ত্যাগ করার কোন যুক্তি তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। এমন কি এই শহর থেকে বাস তুলে, রাশিয়া ছেড়ে চলে যেতে চাইছেন ফ্রান্সে।

হতাশায় গোর্কী ভেঙ্গে পড়লেন।

—আমার কথা একটুও চিন্তা করবে না?

—আমি নিরুপায়। স্বামী ব্যথা পাবেন।

—আমিও তো ব্যথা পাচ্ছি, ওলগা।

—তুমি যুবক। তোমার সামনে পড়ে আছে বিরাট জীবন। এই ব্যথা সইবার শক্তি তোমার আছে, একথা আমি জানি, আলেকসি।

ওলগা চলে গেল। গোর্কীর হৃদয়কে সম্পূর্ণ শূন্য করেই চলে গেল সে। কাজে আর মন বসল না। আনমনা হয়ে ঘুরে রেড়াতে লাগলেন। যেদিন শুনলেন ওরা প্যারিসের পথে যাত্রা করেছে। তিনিও আর নিজনীতে অপেক্ষা করলেন না। শহর ত্যাগ করে উদ্দেশ্যহীন ভাবে ভলগার তটভাগ দিয়ে এগিয়ে চললেন। পৌঁছালেন জারিটাসন। ওখানে কয়েক মাস থেকে এলেন ডন নদীর দেশে। মনের অবস্থা শোচনীয়। করতে ইচ্ছা করে না কিছু। তবে পেট মানতে চাইবে কেন? পেটের দায়ে নানা ধরনের চাকরি করতে হয়। এইভাবে দু'বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে তিনি বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এসেছেন। কোন কোন কমিউনেও যোগ দিয়েছেন।

১৮৯২ সাল।

গোর্কীর জীবনের স্মরণীয় বছর। তখন তিনি তফলিস শহরে। ওখানকার একজন বিপ্লবী আলেকজাণ্ডার কালিয়জুনীর বাড়িতে আছেন। আলেকজাণ্ডার সাইবেরিয়ায় ছ'বছর সশ্রম কারাদণ্ড খেটে মুক্তি পাবার পর তফলিসে নির্বাসিত হয়েছেন। আলেকজাণ্ডার গল্প লেখার উৎসাহ দিতে থাকেন গোর্কীকে। গোর্কী মুখে মুখে একদিন একটা গল্প বললেন। আলেকজাণ্ডার জোর করে লিখিয়ে নিলেন তাঁর কাছ থেকে। গল্পটি প্রকাশিত হল, স্থানীয় দৈনিকপত্র "ককেশাসে"। গল্পের শেষে আলেকসি পিয়াস্কভ বলে সই করেন নি লেখক। নিজেকে আড়াল করে নিয়েছিলেন "ম্যাক্সিম গোর্কী" ছদ্মনামে। "গোর্কী" শব্দের অর্থ হল "অভাগা"। নিজের জীবনের সঙ্গে খাপ খাইয়েই বোধহয় আলেকসি ছদ্মনামকরণ করলেন "গোর্কী"।

গোর্কীর লেখক জীবনের সূত্রপাত হল। আজ বিশ্ববাসী আলেকজাণ্ডার কালিয়জুনীর কাছে কৃতজ্ঞ। তিনি গল্প লিখতে বিশেষ অনুরোধ না করলে এবং সেই গল্পপ্রকাশের ব্যবস্থা করে না দিলে, গোর্কী হয়তো কোনদিনই লেখক হতে পারতেন না। একথা কোন দিনই ভুলে যাননি লেখক। পরবর্তী জীবনে তিনি আলেকজাণ্ডারকে বন্ধু ও শিক্ষক সম্বোধন করে লিখেছেন "একথা অস্বীকার করলে চলবে না যে, আপনিই সর্বপ্রথম আমাকে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হতে শিখিয়েছেন। গত ত্রিশবছর ধরে সাহিত্যের যে সেবা করে চলেছি, আপনার অনুপ্রেরণার কাছে সে জন্য আমি বিশেষভাবে ঋণী।"

ভাগ্যের বিচিত্র লীলা। একদিন হঠাৎ গোর্কী জানতে পারলেন, ওলগা তফলিসেই রয়েছে। এই সংবাদে তিনি আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠলেন। যার সঙ্গে জীবনে আর কোনদিন দেখা হবে না ভেবেছিলেন, তাঁর সেই প্রিয়তমা এখানেই রয়েছে! ওলগা তার মেয়েকে নিয়ে এখানে এসেছে। ফ্রান্সেই স্বামী রয়ে গেছেন।

প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে। মেঘের গর্জনে চতুর্দিক প্রকম্পিত। দুর্যোগকে ভ্রূক্ষেপ না করে গোর্কী এলেন ওলগার কাছে। তাঁকে সে সাদরে অভ্যর্থনা করল। তেইশ বছরের

গোর্কী খুঁটিয়ে দেখলেন তেত্রিশ বছরের ওলগাকে। চোহারার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। মুখ আগেকার মতই সুন্দর আছে। সলজ্জ হাসিটুকুও বজায় আছে ঠোঁঠের আগায়।

ওলগাই প্রথম কথা বলল, তুমি কি এখনও আমায় ভালবাস?

—এখনও।

—এখনও! তোমাকে দেখে মনে হয় অনেক বদলে গেছো। এখানে এসে পর্যন্ত তোমার কথা অনেক শুনেছি। কবে এলে এখানে? কি করছো এখন?

গোর্কী বললেন, সমস্ত।

—তোমার কথা আমি অনেক ভেবেছি। অনেক কষ্ট পেয়েছো তুমি আমার জন্যে।

—তুমি এসেছো আমার কোন দুঃখ নেই। বল ওলগা, আমার হয়ে থাকবে?

মৃদু গলায় ওলগা বলল, আমায় আর কিছু সময় দাও।

এখনও অপেক্ষা করতে হবে?

—তুমি নিজনীতে ফিরে যাও। আমি তোমাকে চিঠি লিখে জানাব।

সৌভাগ্যক্রমে এই সময় নিজনী থেকে লেনিন টেলিগ্রাম করে গোর্কীকে ডেকে পাঠালেন তাঁর সেক্রেটারি পদটি নেবার জন্য। কালবিলম্ব না করে গোর্কী যাত্রা করলেন। বেশিদিন অপেক্ষা করতে হল না, শীতের প্রারম্ভেই ওলগা চলে এল নিজনী। তাকে সম্পূর্ণ নিজের করে পেয়ে গোর্কী অত্যন্ত সুখী হলেন।

দিন কেটে চলল।

গোর্কী ধীরে ধীরে বুঝতে পারলেন, মানসিক গঠনের দিকে থেকে তাঁর ও ওলগার মধ্যে পার্থক্য অনেক। সে শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, চতুরা, রসিকা—তাঁর গুণ অনেক। অভাবও অনেক। সহৃদয়তা ও পরদুঃখকাতরতা তার মধ্যে নেই। যা গোর্কী অত্যন্ত অপছন্দ করেন, তাছাড়া নিজেকে দশজনের চোখের সামনে তুলে ধরার চেষ্টায় সে সবসময় ব্যস্ত।

গোর্কীর আজকাল ব্যস্ততা বাড়ছে "ভলগা বার্তাবহ" তে লিখছেন নিয়মিত। আয় হচ্ছে মোটামুটি। লাইন প্রতি দু'কপোক পাওয়া যায়। ওলগা চুপচাপ দিন কাটাবার মেয়ে নয়। অনেক বন্ধু-বান্ধব জুটিয়েছে সে। অতীত জীবন তার কেটেছে বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে। সতীত্বকে সে গুরুত্ব দেয়নি কোনদিন। সময় সময় নিঃসঙ্কোচে তার প্যারিসের অবৈধ জীবনের কাহিনী শোনায়। গোর্কী সংস্কারমুক্ত, তবু এসমস্ত ভাল লাগে না তাঁর। অগত্যা তিনি বলেন, প্রেমের আদর্শের কথা। অভিমান জমা হয়ে থাকে মনের কোণে।

গোর্কীর মনের অবস্থা ওলগা বুঝতে পারে। ছলছলে চোখে বলে, আমার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলা বুদ্ধিমানের কাজ হয়নি। তোমার উচিত ছিল কোন সমবয়সী মেয়েকে বিয়ে করা। আমি যদি আজ কিশোরী হতাম।

—তবু কি বুঝতে পার না, তোমাকে ভালবেসে আমি কত সুখী? সমস্ত অভিমান ভেসে যায়। গোর্কী কাছে টেনে নেন ওলগাকে। এই ভাবেই দিন কাটে। বাড়িতে প্রায়ই অতিথি আসে খাওয়া-দাওয়া চলতে থাকে। আয় সঞ্চয়ের রূপ না নিয়ে এইভাবেই ব্যয় হয়ে যায়। গোর্কীর সে জন্য চিন্তা নেই। তিনি চিরকালই অদৃষ্টবাদী।

ওলগা অতিথিদের সঙ্গে রঙ্গরস করে। তার ভাবভঙ্গীতে পুরুষদের বিহ্বল হওয়া বিচিত্র নয়। তারা প্রেমপত্র লেখে। কাউকে আবার বিশেষভাবে নাচিয়ে আনন্দ পায় ওলগা। হাসতে হাসতে বলে গোর্কীকে, তোমার হিংসা হচ্ছে নাকি? দিন দিন বাড়িতে হট্টগোল, নিরিবিলিতে লিখবেন তার উপায় নেই। ওলগাকেও কাছে পাওয়া যায় না। তাকে ঘিরে আছে অনেক পুরুষ। গোর্কী ধৈর্যের শেষ সীমায় এসে পৌছান। তাঁর পারিবারিক জীবন নিয়ে চতুর্দিকে আলোচনা হচ্ছে। শুভাকাঙ্ক্ষীরাও এ সম্পর্কে ইঙ্গিত করছেন, সতর্ক করে দিচ্ছেন ভবিষ্যতের বিষময় ফল সম্পর্কে।

গোর্কী রেগে কিছু বলতে পারেন না ওলগাকে। রাগারাগি করা তাঁর স্বভাব বিরুদ্ধ। বুঝিয়ে বলার চেষ্টা করেন। এইভাবে চলতে থাকলে পারিবারিক সুখশান্তি সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে যাবে তাও বললেন। ওলগা হেসে সমস্ত বিষয়টাকে হাল্কা করে দেবার চেষ্টা করে। কিম্বা বলে, নিজের স্বভাবকে সংযত করবে। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় স্বভাবের বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি।

কোনরকমে দু'বছর কেটে গেল।

আশানুরূপ লেখার অগ্রগতি হয় না গোর্কীর। বলা বাহুল্য পারিবারিক অশান্তিই এর প্রধান কারণ। গোর্কীর কত স্বপ্ন ছিল। ওলগার ভালবাসায় অনুপ্রাণিত হয়ে একান্তে বসে তিনি লিখবেন। ছোট্ট সুখের সংসারে আনন্দের জোয়ার বইতে থাকবে। ক্রমেই তিনি প্রতিষ্ঠিত হবেন নামী লেখক হিসেবে। সমস্ত ধুলিসাৎ হয়ে গেছে। এখন দিন কাটানই দায়।

গোর্কী বুঝতে পেরেছেন, এভাবে দু'জনের আর একত্রে থাকা চলতে পারে না। তাঁর আদর্শ, তাঁর লেখক হবার ঐকান্তিকতা হাতের মুঠোর বাইরে চলে যাবে। এই সময় তাঁর প্রসিদ্ধ গল্প "চেলকাশ" রুশ সম্পদ পত্রিকায় প্রকাশিত হল। ঐ পত্রিকার অন্যতম সম্পাদক করোলেঙ্কো এই ধরনের আরো গল্প লেখবার অনুরোধ করলেন। গোর্কীকে বলতে হল, নিজের শোচনীয় পারিবারিক অবস্থার কথা। ঐ পরিস্থিতির মধ্যে থেকে তাঁর বোধহয় পর পর ভাল গল্প লেখা সম্ভব নয়।

শুনে দ্রুত গলায় করোলেঙ্কো বললেন, সেকি! না, না এজীবন তোমার জন্যে নয়। তুমি বরং এখান থেকে চলে যাও। জীবনের ধারা তোমাকে বদলাতেই হবে পিয়াস্কভ।

করোলেঙ্কো তাঁর মনের কথাই বলেছেন। জীবনের ধারা তাঁকে বদলাতেই হবে। মন থেকে সমস্ত ভাবাবেগকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য গোর্কী তৈরি হলেন। ওলগাকে তার পুরুষ বন্ধুদের মধ্যে থেকে উদ্ধার করে নিয়ে এলেন পাশের ঘরে। বললেন ধীর গলায়, আমরা দু'জনেই দু'জনের কাছ থেকে সরে যাচ্ছি লক্ষ্য করেছো কি? ওলগা বিস্মিত হল না। সে জানে, এই ধরনের প্রশ্ন একদিন পিয়াস্কভ তুলবেই। বাস্তবকে চোখে ধরা যায় না। কাজেই দেবার মত উত্তরও কিছু নেই।

গোর্কী আবার বললেন, পরিকল্পনা করে আমরা ঘর বেঁধেছিলাম তা সফল হয়নি। পরিস্থিতি ক্রমেই ক্লান্তিকর হয়ে উঠছে। একই সঙ্গে বোধহয় আমাদের আর দিন কাটান উচিত নয়। তুমি কি বল?

ওলগা এখন বুঝতে পেরেছে গোর্কীকে আর ধরে রাখা যাবে না।

শান্ত গলায় বলল, তোমার মতের সঙ্গে আমি একমত।

—এখানকার সমস্ত কিছু ছেড়ে আমার চলে যাওয়াই ভাল।

—ঠিকই বলেছো, এজীবন তোমার জন্যে নয়।

দু'জনের মন বিষণ্ণ হয়ে উঠল। কিন্তু উপায় কি? ভালবাসা দু'জনকে একসূত্রে বাঁধতে পারল না। দু'জনের আদর্শ আলাদা। সুতরাং এই বিচ্ছেদকে হাসিমুখে স্বীকার করে নিতেই হবে। ফেব্রুয়ারি মাসের প্রচণ্ড শীতের মধ্যে গোর্কী যাত্রা করলেন সামরা। ওখানে যাতে লেখকের কিছু সুবিধা হয় তার ব্যবস্থা করোলেঙ্কো করে রেখেছিলেন। ওলগা থিয়েটারে যোগ দিল।

গন্তব্যস্থলে পৌঁছে গোর্কী "সামরা গেজেটে" চাকরি পেলেন।

ওলগার কথা মনে পড়তে থাকলেও, মানসিক অবস্থার অনেক উন্নতি হল তাঁর। এখন লেখার উৎসাহ পান। অল্প দিনের মধ্যেই গোটাকুড়িক গল্প লেখা হয়ে গেল তাঁর। পত্র পত্রিকায় প্রকাশিতও হল একে একে। তাঁর রচনা অনেকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। পাঠকসম্প্রদায় তাঁর রচনার আলোচনাচক্র বসান। সামাজিক মর্যাদাও বেড়েছে অনেক।

এখানকার ইহুদি জজ ইয়াকভ টাইটেলের বাড়িতে লেখক ও চিন্তাশীল ব্যক্তিরা আসর বসান। গোর্কীও এখানে আসেন। বুদ্ধিজীবিদের তর্ক-বিতর্ক মন দিয়ে শোনেন। এই সমস্ত পরিবেশ তাঁর ভাল লাগে। সামরায় এসে বেঁচে গেছেন গোর্কী।

এই সামরাতেই একদিন নাটকীয়ভাবে আলাপ হল কাটেরিনা পাভলোভনা ভালজিনার সঙ্গে। সুন্দরী ভালজিনা ভদ্রবংশীয়া এবং শিক্ষিত। কথা প্রসঙ্গে জানা গেল সে সামরা গেজেটেই চাকরি করে।

আলাপ ঘনিষ্টতায় পরিণত হতে বিশেষ সময় নিল না। ওলগার সঙ্গে পরিচিত হবার পর যে তীব্র অনুভূতি তাঁকে উতলা করে তুলেছিল—এবারও তার ব্যতিক্রম দেখা গেল না। তিনি গভীর ভাবে ভালবেসে ফেললেন ভালজিনাকে। ওপক্ষের আগ্রহও কম নয়। এই প্রতিভাধর যুবককে ঘিরে ভালজিনার অনেক স্বপ্ন।

নিয়মিত দেখা সাক্ষাৎ হয় দু'জনের । নিভৃতে কথাবার্তা হয়। পরিচিত মহলে দু'জনের সম্পর্কের কথা অজানা নেই। অনেকে প্রকাশ্যে উৎসাহ দেন। বলেন গোর্কীকে, আর একা থাকা কেন? ওকে ঘরে আনলেই তো পার। আর একা থেকে যে লাভ নেই, একথা গোর্কীও ভেবে দেখেছেন। ওলগা পারেনি কিন্তু ভালজিনা তাঁকে প্রেরণা জোগাবে এবিষয়ে তিনি নিশ্চিত।

সেদিন ভালজিনার সঙ্গে সাক্ষাৎ হতেই কোন রকম ভূমিকা না করে গোর্কী বললেন, কাটেরিনা, বিয়ে করবে আমাকে?

হঠাৎ এই ধরনের প্রশ্ন আশা করেনি ভালজিনা। তবে এই মানুষটির সমস্ত কিছুই বিচিত্র। যত দেখছে ততোই অবাক হচ্ছে। বিয়ে! নিজের সমস্ত কিছু সঁপে দিয়েছে যার হাতে, তাকে বিয়ে করতে বাধা কোথায়? সলজ্জ হেসে নিজের সম্মতি জানাল ভালজিনা।

আনুষ্ঠানিক ভাবে বিয়ে হয়ে গেল। সালটা ১৮৯৬।

প্রথম কিছুদিন উদ্দামগতিতে জীবন অতিবাহিত হল দু'জনের। উৎসাহের সঙ্গে গোর্কী প্রচুর লেখা লিখলেন। রুশ সাহিত্য তাঁর আসন ক্রমেই স্থায়িত্বের দিকে অগ্রসর হচ্ছে. কিন্তু—! তাঁর অভিশপ্ত জীবন, ঘর বেঁধে থাকার দায়িত্ব তাঁর কোথায়? ভালজিনাও ওলগার পথ ধরেছে। তার আগেকার আদর্শ এখন আর নেই। স্বামীকে প্রেরণা দেওয়া, উৎসাহ দেওয়ার পরিবর্তে সোসাইটিতে প্রতিপত্তি বিস্তার করার দিকেই এখন তার দৃষ্টি বেশি।

মান-অভিমান অনেক আগেই বিদায় নিয়েছে। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে এখন অবিরত কথা কাটাকাটি হয়। হয় তীব্র বাক-বিতণ্ডা। গোর্কী ভেবে পান না, কেন এমন হয়? তাঁর পরিচিতদের মধ্যে অধিকাংশই তো কেমন সুষ্ঠু বিবাহিত জীবন যাপন করছেন। অথচ—ওলগাকে তিনি প্রাণ দিয়ে ভালবেসেছিলেন, সেও তাঁকে ভালবেসেছিল। কিন্তু তাঁর কার্যকলাপের দরুণই শেষ রক্ষা হল না। ভালজিনাও তাঁকে হতবাক করে দিয়ে ওলগার পথ অনুসরণ করল। তিনি ব্যাকুল হয়ে প্রশ্ন তোলেন, কেন তাঁর জীবনে বারবার এইরকম ঘটছে?

বৃহত্তর কর্মকেন্দ্রে প্রবেশ করবার সময় গোর্কীর এসে গিয়েছিল। মস্কোর হাতছানি তিনি উপেক্ষা করতে পারলেন না। গোর্কী সামরা থেকে বিদায় নিলেন। ভালজিনা কিন্তু এখানেই রয়ে গেল। লেখকের জীবনে তার ভূমিকা এখানেই শেষ হল। অল্পদিনের মধ্যেই আইন সঙ্গতভাবে দু'জনের ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল।

পরবর্তী জীবনে গোর্কী আর বিয়ে করেন নি। তবে নারীসঙ্গ সম্পূর্ণ পরিহার করেছিলেন তাও নয়। অভিনেত্রী মারিয়া আন্দ্রেয়েভনার সঙ্গে মস্কোতে তাঁর পরিচয় হয় এবং অচিরেই সেই পরিচয় অন্তরঙ্গতায় পরিণত হয়। বিয়ে না করলেও মারিয়াকে স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে তিনি নিজের কাছে রেখেছিলেন।

এই অবৈধ জীবনযাত্রার জন্য গোর্কীকে স্বদেশে ও বিদেশে অনেক অসুবিধার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছিল।

নারীসঙ্গ সুখী নেপোলিয়ান

নেপোলিয়ান এমন একটি বিস্ময়কর চরিত্র যাঁর তুলনা ইতিহাসে বিরল। এই অনুচ্চ সুন্দর পুরুষটি ফ্রান্সকে গর্বোদ্ধতভাবে মাথা তুলে দাঁড়াবার অভূতপূর্ব সুযোগ এনে দিয়েছিলেন। একের পর এক যুদ্ধে একের পর এক দেশ যিনি অবজ্ঞাভরে জয় করেছিলেন, চেঙ্গিস বা তাইমুরের মত রক্তলোলুপদের সঙ্গে এক সারিতে তাঁর স্থান নির্দিষ্ট নয়। আলেকজাণ্ডার ও হ্যানিবলের মত দিগ্বিজয়ীদের আধুনিক সংস্করণ হলেন নেপোলিয়ান বোনাপার্ট। এই বীর নিজের জীবনে সমস্ত কিছু পেয়েছিলেন, তবু তাঁর মন অতৃপ্ত ছিল। কারণ পারিবারিক জীবনে তিনি সুখী ছিলেন না।

তিনি চেয়েছিলেন একটি নারী আন্তরিকভাবে আজীবন তাঁকে ভালবাসুক। রণক্লান্ত হয়ে গৃহে ফিরে তিনি যাতে পরিপূর্ণ তৃপ্তির স্বাদ গ্রহণ করতে পারেন। কিন্তু তা হয়নি, ভাগ্যের এই দিকটা তাঁর তেমন সরল ছিল না। যে সমস্ত নারীকে নেপোলিয়ান ঘনিষ্ঠভাবে কাছে পেয়েছিলেন, রোজ জোসেফাইন হল তাদের মধ্যমণি।

সেই জোসেফাইন! সে কাহিনী পরের। আগে বোনাপার্টের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে নেওয়া যাক।

কর্শিকা ফরাসি উপকূল থেকে শ'খানেক মাইল দূরে অবস্থিত। প্রকৃতির লীলা নিকেতন এই দ্বীপটি আগে ইতালির অধিকারে ছিল। কাজেই এখানকার ভাষা ও এখানকার সংস্কৃতির উপর ইতালির প্রভাব অনস্বীকার্য। ১৭৬৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসি সৈন্য আচম্বিতে কর্শিকা আক্রমণ করল। দীর্ঘদিন ধরে প্রবল যুদ্ধ চলার পর এই দ্বীপটি ফরাসিদের অধিকারভুক্ত হল।

চার্লস বোনাপার্ট একজন ইতালিয়ান। কর্শিকায় তিনি আইন ব্যবসা করতেন। সুপুরুষ সদালাপী এই ব্যক্তিটির দক্ষ আইনজ্ঞ হিসেবে সুনাম ছিল। ১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ১৬ই আগস্ট চার্লসের স্ত্রী লেটিসিয়া একটি সুন্দর শিশুর মা হন। চার্লস সেদিন কল্পনাও করতে পারেননি, আগামী দিনে এই শিশু বিশ্বের বিস্ময় হয়ে উঠবে। এগারোটি ভাইবোনের মধ্যে নেপোলিয়ান ছিলেন দ্বিতীয়। কৈশোরে পা দেবার

পূর্বেই তাঁকে প্রবল অভাব-অনটনের মুখোমুখি দাঁড়াতে হল। চার্লস অকালে মারা যাওয়ায় বোনাপার্ট পরিবারের সমৃদ্ধি নষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

যা হোক, দিন কোনরকমে গড়িয়ে চলল। এই সময় বোনাপার্ট পরিবার একজন প্রকৃত বন্ধু লাভ করলেন। এই ব্যক্তিটি হলেন, কর্শিকা দ্বীপের ফরাসি শাসনকর্তা কাউন্ট মার্বো। নেপোলিয়ানের যখন মাত্র দশ বছর বয়স সেই সময় কাউন্ট মার্বো প্যারিসের নিকটবর্তী সামরিক বিদ্যালয়ে তাঁর শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিলেন। এই দয়ালু ভদ্রলোকের সহযোগিতা না পেলে নেপোলিয়ান ইতিহাসের পাতায় স্থান পেতেন কিনা সন্দেহ।

১৭৮৫ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সামরিক বিদ্যালয়ে পড়াশুনা করেছেন। এর পরের বছর সৈন্য বিভাগে প্রবেশ করবার জন্য তাঁকে পরীক্ষার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। বলা বাহুল্য পরীক্ষায় তিনি সসম্মানেই উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। প্রধান পরীক্ষক মন্তব্য করেছিলেন, "এই যুবক, চরিত্রে এই বংশে কার্শিকাবাসী। ভাগ্য প্রসন্ন থাকলে বিশ্বজোড়া নাম হবার সম্ভাবনা।"

সৈন্যদলে প্রবেশ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ভাগ্যোদয় হয়েছিল একথা বলা চলে না। তবে সৌভাগ্যের সূচনা হয়েছিল এসম্পর্কে কোন দ্বিমত নেই। ফ্রান্সের রাজনৈতিক অবস্থা তখন শোচনীয়। গৃহ-বিপ্লবকে ঠেকিয়ে রাখা গেল না। ইতিহাসে স্মরণীয়ভাবে চিহ্নিত হয়ে আছে যা ফরাসি-বিপ্লব নামে। বিপ্লবের পর ধাপে ধাপে উপরে উঠতে লাগলেন নেপোলিয়ান। সেই সমস্ত ইতিহাস বর্ণনা করা এই স্বল্প পরিসর প্রবন্ধে সম্ভব নয়। তবে একথা বললেই যথেষ্ট বলা হবে, মাত্র চব্বিশ বছর বয়সের মধ্যেই তিনি একজন প্রথম শ্রেণির সেনাপতি হিসেবে গণ-সম্বর্ধনা লাভ করলেন।

এরপর আসছে জোসেফাইনের প্রসঙ্গ।

নেপোলিয়ানের নিবিড়ভাবে চাওয়া প্রথম নারী-কথা।

১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ঘটনাপঞ্জী।

জাতীয় সভার অনুজ্ঞা অনুসারে নেপোলিয়ান প্যারিসবাদীদের উচ্ছৃঙ্খলতা দমনের জন্য সকলকে নিরস্ত্র করার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। যথাসময় ভাইকাউন্ট-বোহার্ণের তরবারিটিও হস্তগত করা হল। রাজতন্ত্রের কালে বোহার্ণ সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। বিপ্লবের সময় অন্যান্য রাজপুরুষের মত তাঁকেও নিষ্ঠুরভাবে সাধারণ মানুষ হত্যা করেছিল।

কয়েকদিন পরে একটি বালক নেপোলিয়ানের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করল। তার প্রার্থনা মঞ্জুর করে তিনি জানতে পারলেন, বালক ইউজিনের জনক ছিলেন ভাইকাউন্ট বোহার্ণ। রোরুদ্যমান ইউজিন জানাল, ভাইকাউন্টের তরবারি ফিরিয়ে দিলে সে কৃতজ্ঞ থাকবে। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তরবারিটি সে রেখে দিতে চায়।

পিতার প্রতি পুত্রের শ্রদ্ধাভাব দেখে নেপোলিয়ান মুগ্ধ হলেন। ওই সঙ্গে চিন্তা করতে লাগলেন, বালকটির জননীর সুশিক্ষার কথা। তাঁর নিজের শৈশবের কথা মনে পড়ল। তাঁর চরিত্র গঠনে, তাঁর জননীর দান অস্বীকার করবার কোন উপায় আছে কি ? নেপোলিয়ান বোহার্ণের বিধবা স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য কেমন ব্যস্ততা বোধ করতে লাগলেন।

পরে অনুসন্ধান করে জানতে পারলেন, এই রমণী প্যারিসের বিত্তশালী সমাজের অতি পরিচিতা। রোজ জোসেফাইনই হলেন, ভাইকাউন্ট বোহার্ণের বিধবা স্ত্রী। এই সুরসিকা মহিলার সুরম্য গৃহে জাতীয় সভার প্রধানদেরও যাতায়াত।

নাটকীয়ভাবে সাক্ষাৎ হয়ে গেল দু'জনের।

নেপোলিয়ান সৌন্দর্যের ছটায় স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলেন প্রথমে। তারপর সম্বিত ফিরে পাবার পর খুঁটিয়ে দেখলেন জোসেফাইনকে, গোলাপের আভাযুক্ত নয়নরঞ্জক গায়ের রং। দীঘল নাসা। ভাসা ভাসা দু'টি চোখ। ঘন রেশমের মত চুল লীলায়িত ভঙ্গীতে নেমে এসেছে। একহারা ছিপছিপে আকর্ষণীয় দেহ। কে বলবে ইউজিনের মত বার বছরের ছেলে আছে এই নারীর।

ছাব্বিশ বছরের নেপোলিয়ান মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকলেন আঠাশ বছর বয়স্কা জোসেফাইনকে। সুন্দরী নারী দেখেছেন অসংখ্য। তবে এত সুন্দরী বোধহয় এই প্রথম দেখলেন। জোসেফাইনও কিন্তু তাকিয়ে থাকতে পারেনি, একবার দৃষ্টি তুলেই নামিয়ে নিয়েছিল। তার মন বারংবার বলছিল, এই সেই সেনাপতি যাঁর খ্যাতিতে সমস্ত ফ্রান্স মুখর।

নেপোলিয়ানই পত্রালাপের সূত্রপাত করলেন। ইউজিনের পিতৃভক্তি নিয়েই কথা আরম্ভ হল। অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা চলল দু'জনের। জোসেফাইন মনে মনে স্বীকার করল, এত সুন্দরভাবে, এমন সুরেলা গলায় কোন পুরুষ এর আগে তার সঙ্গে কথা বলেনি। ওই সঙ্গে কিছু গর্বও ছিল। তার বুঝতে কষ্ট হয়নি, নেপোলিয়ানকে সে আকর্ষণ করতে পেরেছে।

অবশেষে বিদায়ের সময় এল। হৃদয় হারিয়ে স্বপ্নাচ্ছন্ন অবস্থায় ফরাসি সেনাপতি নিজের আবাসে ফিরলেন। পরের দিন জোসেফাইন সম্পর্কে আরো কিছু অনুসন্ধান চালালেন তিনি। জানা গেল, পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের অন্তর্গত মার্টিনিকোতে এক অবস্থাপন্ন পরিবারে জোসেফাইনের জন্ম হয়। পরে এই পরিবারটিকে নানা কারণে ফ্রান্সে চলে আসতে হয়। যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ভাইকাউন্ট বোহার্ণ জোসেফাইনকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন।

বিধবা হবার পর জোসেফাইনের দরজা অভিজাত পুরুষদের জন্য খুলে যায়। নেপোলিয়ান এতে কিছু দোষের দেখলেন না। কয়েকজন নারী-পুরুষ যদি এক

সঙ্গে সাহিত্যচর্চা বা রাজনৈতিক আলোচনা করে তাতে দোষের কি থাকতে পারে? কিন্তু এখানে স্বীকার করতেই হবে, নেপোলিয়ানের মত তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন সেনাপতিও ভুল করেছিলেন। তিনি বুঝতে পারেননি, যুদ্ধক্ষেত্র এবং প্রেমের ক্ষেত্র, এক দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করা যায় না। একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করলেই তিনি বুঝতে পারতেন হাজারো সুন্দরী হলেও এই তরল চরিত্রের নারীর প্রণয় পাত্র হওয়া তাঁর উচিত নয়।

নিয়তিকে খণ্ডাবার উপায় নেই। ঘন ঘন সাক্ষাৎ হতে লাগল দু'জনের। ধাপে, ধাপে প্রেম গভীর হল। নেপোলিয়ান নিজের দুই বাহুর মধ্যে জোসেফাইনকে পেতে অভ্যস্ত হয়ে পড়লেন। এই সময় বোধহয় তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, যে সমস্ত পুরুষ তাঁর প্রণয়িনীর কাছে আসে, অধিকাংশই তার প্রণয়প্রার্থী! জোসেফাইনও কাউকে কাউকে প্রশ্রয় দিয়েছে।

কিন্তু আর পিছিয়ে পড়বার উপায় নেই। দুর্বার হৃদয়াবেগকে দমন করা সাধ্যাতীত। তাই এই সময় একটি চিঠিতে নেপোলিয়ান জোসেফাইনকে লিখেছিলেন, "যে সমস্ত উপাদানে তুমি তিল তিল করে বেড়ে উঠেছো, তার সমস্ত কিছুকেই আমি অন্তর দিয়ে ভালবাসি।"

তাঁদের গুপ্তপ্রণয় আর গুপ্ত রইল না। অভিজাত মহলে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠল। এই আলোচনাকে আর বাড়তে দিতে চাইলেন না নেপোলিয়ান। জোসেফাইনের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনার পর বিবাহ সম্পর্কে স্থির নিশ্চিন্ত হলেন। ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ রেজিষ্ট্রি করে তাঁদের বিবাহ হয়ে গেল। এই সময় ফ্রান্সে বিবাহের ব্যাপারে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তাকে গ্রাহ্য করা হত না। জীবনযাত্রার প্রয়োজনে নারী-পুরুষের বন্ধন আবশ্যক—রেজিষ্ট্রারের সাহায্যেই তা সম্পন্ন হত। বিপ্লবোত্তর কালেই ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে বর্জন করা হয়েছিল।

বিবাহের পরের দিনই তিনি ইতালি অভিযানের প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হলেন। মাত্র দু'টি রাত্রি পূর্ণভাবে তিনি অবগাহন করলেন জোসেফাইনের রূপসাগরে। তারপরই তাঁকে ইতালি যাত্রা করতে হল। এই অভিযানে ফরাসি বাহিনীর অধিনায়কত্ব করার আকাঙ্খা তাঁর অনেক দিনের। তবু যাত্রার সময় গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হল তাঁকে। অৰ্দ্ধেক মন রেখে গেলেন জোসেফাইনের কাছেই।

ত্রাসের সৃষ্টি করতে করতে ফরাসি বাহিনী এগিয়ে চলল। তাদের অধিনায়ক অসংখ্য চিন্তায় জর্জরিত। বিপক্ষকে কিভাবে পর্যুদস্ত করবেন তার পরিকল্পনা মনের মধ্যে আসছে আবার ভেঙ্গে যাচ্ছে। তবু জোসেফাইন মনের মধ্যে সজীব হয়ে রয়েছে। ইতালি পৌঁছাবার আগেই পথ থেকে নেপোলিয়ান চিঠি লিখলেন, নিজের

প্রিয়তমাকে। অনেক কথার পর তিনি লিখলেন, "প্রতিটি মুহূর্ত যেন আমাকে তোমার কাছ থেকে অনেক দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং প্রতি মুহূর্ত তোমার কাছ থেকে দূরে সরে যাওয়ায় আমি যেন ক্রমেই নিজের উপর আস্থা হারিয়ে ফেলছি।— বিদায়, বিদায়! তোমাকে ছাড়াই আজ আমি শয্যা গ্রহণ করবো, তুমি কাছে থাকবে না তবু আমি ঘুমিয়ে পড়বো, আমায় ক্ষমা করো!"

রণক্ষেত্রে পৌঁছাবার পর আবার তিনি লিখলেন—"গত কয়েক রাত সুখস্বপ্নে আমার দুইবাহুর মধ্যে তোমাকে বার বার অনুভব করেছি। আরেকবার যে মজার স্বপ্ন দেখেছিলাম তাকি তোমার মনে আছে? যে স্বপ্নে তোমার জুতো খুলে দিলাম, তোমার অঙ্গাভরণ সরিয়ে তোমাকে বুকে টেনে নিলাম!"

প্রতিদিনই যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রেমপূর্ণ চিঠি পেতে লাগল জোসেফাইন। কিন্তু এই আন্তরিক ভালবাসার প্রতিদান দেবার মত মানসিক অবস্থা তার ছিল না। জোসেফাইন চেয়েছিল নিজের একটা সম্মানজনক পরিচয়। নেপোলিয়ান তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করবার পরই তার সে আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়েছিল। আবার সে ফিরে গেল তার পুরানো স্বভাবে। স্বামী ফরাসিদের গৌরব বৃদ্ধি করার জন্য যুদ্ধযাত্রা করলেন, আর জোসেফাইনও চার্লসের শয্যাসঙ্গিনী হল।

হিপোপোলাইট চার্লস একজন পদস্থ সামরিক কর্মচারী। বয়সে তরুণ। জোসেফাইন তাঁর বহুদিনের নর্মসহচরী। অসংখ্য রাত দু'জনের কেটেছে অবৈধ কার্যকলাপে। বিবাহের পর এই ধারা রোধ হবে জোসেফাইন চিন্তাও করতে পারেননি। চার্লসকে নিয়ে উন্মত্ত রইল। নেপোলিয়নের চিঠির উত্তর দিয়ে যেতে লাগল তাল রেখে।

এদিকে একের পর এক যুদ্ধে সাফল্য লাভ করে চলেছেন নেপোলিয়ান। সম্পূর্ণ ইতালি পদানত হতে আর বিশেষ বিলম্ব নেই। হঠাৎ রণক্লান্ত সেনাপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল লা গ্রাসিনির। বিখ্যাত অপেরা গায়িকা সুন্দরী লা গ্রাসিনি নেপোলিয়ানের বীরত্বে মুগ্ধ। সে তার প্রেমে পড়ে গেল। দেহ দিতেও বিমুখ নয়।

নেপোলিয়ান তার হৃদয়াবেগকে উপেক্ষা করলেন। বললেন, আমি বিবাহিত এবং স্ত্রীকে ভালবাসি। এইসময় জোসেফাইনের এক চিঠিতে তিনি জানতে পারলেন, সে মা হতে চলেছে। অবশ্য সংবাদটি মিথ্যা। তাঁকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্যই এই কথার অবতারণা! নেপোলিয়ান ফাঁকি ধরতে পারলেন না। আনন্দে আত্মহারা হয়ে লিখলেন, তোমার এখনকার রূপ দেখবার জন্য আমি ব্যাকুল হয়ে উঠেছি। তুমি নিশ্চয় এখন অনিন্দ্যসুন্দরী হয়ে উঠেছ? তোমাকে কাছে পেলে কি আনন্দ হত আমার! এই সঙ্গে তিনি লিখলেন ফরাসি সরকারকে—ভাইকে, বন্ধু-বান্ধবদের, তাঁর স্ত্রী যেন সমস্ত রকম সাহায্য পান সে দিকে পূর্ণ দৃষ্টি রাখার জন্য। কিম্বা

স্ত্রীকে যেন তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সকলে এই ব্যবস্থাকে সঙ্গত মনে করলেন। জোসেফাইনকে ইতালি যাত্রা করতে হল। এরপর কয়েকমাস নেপোলিয়ানের কাটল স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে।

বীর সেনাপতি অজস্র সম্পদ আর বৈভব নিয়ে ফিরে এলেন প্যারিসে। জনসাধারণ তাঁকে নিয়ে উল্লাসের চূড়ান্ত করল। এবার তাঁকে মিশর যেতে হবে। প্রাচ্যের এই ঐতিহ্যশালী দেশকে অধিকারভুক্ত করা চাই। আবার ছাড়াছাড়ি হল দু'জনের। শোচনীয় মনের অবস্থা নিয়ে নেপোলিয়ান মিশর যাত্রা করলেন। আর জোসেফাইন —তার মনে কোন বিচার নেই। চার্লস তাকে সঙ্গ দেবেন। প্যারিসের অভিজাত পুরুষরাও তার সঙ্গ পাবার জন্য লালায়িত।

মিশরে সাফল্যের পথে প্রচুর বাধা ছিল। একাধিক প্রতিপক্ষকে নিজের বিপক্ষে নেপোলিয়ান দণ্ডায়মান দেখলেন। অসংখ্য খণ্ড যুদ্ধে তারা তাঁকে বিপর্যস্ত করে তুলল। সুনিপুণ সেনাপতি শেষপর্যন্ত বিপদ কাটিয়ে মিশরের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সৈন্য পরিচালনা করলেন। এই সময় তিনি সংবাদ পেলেন, ইতালি ফ্রান্সের অধীনতা অস্বীকার করেছে।

সুতরাং মিশরে থাকার প্রয়োজনীয়তা ফুরাল। ইতালিয়ানদের শিক্ষা দেবার জন্য তাঁকে অবিলম্বে ইউরোপ প্রত্যাবর্তন করতে হবে। এই সময় আরো একটি সংবাদ তাঁকে অত্যন্ত বিচলিত করে তুলল। প্যারিস থেকে সদ্য আগত বন্ধু জুনো নানা সংবাদ দিচ্ছিলেন তাঁকে।

নেপোলিয়ান এক সময় জোসেফাইনের বিষয় প্রশ্ন করলেন। একটু চুপ করে থেকে জুনো বললেন। একে একে সমস্ত বললেন, জোসেফাইন একাধিক পুরুষের সঙ্গে কি খেলা চালিয়ে যাচ্ছে। স্তম্ভিত হয়ে গেলেন নেপোলিয়ান। জোসেফাইনের চরিত্র সম্পর্কে একটা ধোঁয়াটে সন্দেহ কিছুদিন তাঁর মনে বাসা বেঁধেছিল এটা ঠিক—তবে, তা যে এইভাবে নির্মম সত্যের রূপ নিয়েছে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি।

স্তম্ভিতভাব কেটে যাবার পরই তাঁর মন ভরে উঠল তীব্র অভিমানে। এই নারীকে তিনি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসেন। নিজের চরিত্রকে কঠিন শাসনে রেখেছেন। দীর্ঘ এক পত্র অবিলম্বে লিখলেন স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে! যার প্রথম লাইন হল, "তুমি যে অর্দ্ধেক পৃথিবীর লোকের সঙ্গে প্রেম চালিয়ে চলেছো, তা আমি জানতে পেরেছি!"

নিজের উপর কিম্বা জোসেফাইনের উপর প্রতিশোধ নেবার জন্যই যেন এবার নেপোলিয়ান স্রোতের মুখে গা ভাসিয়ে দিলেন। সার্কাসের এক তরুণীর সঙ্গে প্রথম তাঁকে দেখা গেল। কয়েকদিন তাকে নিয়েই মেতে রইলেন। তারপর তাঁর দৃষ্টি

পড়ল তাঁরই অধীনস্থ্ এক অফিসারের স্ত্রীর উপর। নিজের পদমর্যাদার কথা ভুলে গিয়ে তাকে নিয়ে নেপোলিয়ান একদিন অদৃশ্য হলেন। কয়েকদিন সকলের চোখের অন্তরালে থাকবার পর ফিরে এসেই তাঁর দৃষ্টি পড়ল পলিনের উপর।

পলিনকে দেখেই তাঁর মন রসসিক্ত হয়ে উঠল। যেন একেই খুঁজছিলেন। উত্তর ফ্রান্সের বাইশ বছরের পলিন লেফটেন্যান্ট ফুর‍্যাঁর স্ত্রী। সুতরাং স্বামীটিকে কৌশলে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করতে হল নেপোলিয়ানকে। সামরিক কাজেই তাকে বাইরে পাঠালেন। ভাগ্য সুপ্রসন্ন। ফুর‍্যাঁ ধরা পড়লেন ইংরাজদের হাতে।

এদিকে সেইদিনই এক ডিনার পার্টিতে অনেকের সঙ্গে পলিনকেও আমন্ত্রণ জানালেন। হঠাৎ তাঁর গেলাস থেকে একঝলক পানীয় পলিনের গায়ে পড়ল। এটা যে ইচ্ছাকৃত ঘটনা কারুর পক্ষেই বোঝা তা সম্ভব ছিল না। পোশাক যাতে নষ্ট না হয়ে যায় সেই চেষ্টা করার অজুহাতে তিনি পলিনকে সঙ্গে নিয়ে পাশের ঘরে গেলেন। বলা বাহুল্য দরজা বন্ধ হয়ে গেল, অবশ্য এরপরের দিন থেকে আর কোন সঙ্কোচকে প্রশ্রয় দেননি নেপোলিয়ান। প্রকাশ্যে পলিনের প্রতি ঘনিষ্ঠতা প্রকাশ করতে লাগলেন।

এইভাবে কিছুদিন চলবার পর নেপোলিয়ান স্থির করলেন, জোসেফাইনকে ডিভোর্স করে পলিনকে ঘরে আনবেন। কয়েকদিন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার পর তিনি বুঝতে পেরেছেন পলিন তাঁর বিশ্বস্ত থাকবে। সুতরাং এবার প্যারিসে ফেরা প্রয়োজন। ফ্রান্সের রাজধানীতে তাঁর আগমন সংবাদ পৌঁছাল। আনন্দের বন্যা বইতে লাগল। বীর সেনাপতিকে বিপুলভাবে সম্বর্দ্ধনা জানাবার আয়োজন চলতে লাগল।

জোসেফাইনও শুনল স্বামী আসছেন। তার ভাগ্যাকাশে যে কালো মেঘ জমা হয়েছে এবং তা আর যে অপসারিত হবে না তাও বুঝতে পারল। তবু একবার শেষ চেষ্টা করে দেখবে জোসেফাইন। প্যারিসে পা দেবার আগেই, মাঝপথে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে হাস্যে লাস্যে তাঁর মন ভোলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

দুর্ভাগ্যই বলতে হবে। মাঝপথে সাক্ষাৎ হল না। সমস্ত পরিকল্পনাই বানচাল হয়ে গেল। নেপোলিয়ান প্যারিসে এলেন অন্য পথ দিয়ে। ব্যর্থ জোসেফাইন যখন রাজধানীতে ফিরল তখন নেপোলিয়ানের আসার দিন কয়েক হয়ে গেছে। স্বামীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েও বাধাপ্রাপ্ত হল।

বিনীতভাবে ভ্যালে জানাল, প্রভুর আদেশ কেউ যেন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ না করে। আপনিও না।

অপমানিত বোধ করলেও কিছু বলার নেই। এখন গরজ জোসেফাইনের। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাকুতি-মিনতি করতে লাগল। এইভাবে কেটে চলল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। তারপর দরজা খুলে গেল। নেপোলিয়ান বেরিয়ে এলেন। তাঁর সাজ

পোশাকে পারিপাট্য নেই চুল অবিন্যস্ত। দু'চোখ লাল। দেখে মনে হয় যেন কাঁদছিলেন! হেরে যাওয়ার ভঙ্গীতে জোসেফাইনের দিকে তাকালেন। তারপর নিবিড় বাহুবন্ধনে কাছে টেনে নিলেন তাকে। মিষ্টি কথা আর আগুনের মত রূপের আবার জয় হল।

তখনকার পৃথিবীর প্রত্যেক রাজনৈতিক চেতনা সম্পন্ন মানুষ স্বীকার করলেন নেপোলিয়ানের তুঙ্গে বৃহস্পতির স্থান। ফ্রান্সের রাজনৈতিক পটপরিবর্তন হয়ে চলল। ডিক্টেটরি ব্যবস্থা আর রইল না। যে তিনজনের হাতে শাসনের ভার এল নেপোলিয়ান তাঁদের মধ্যে একজন হলেন। ক্রমে সেই অকল্পনীয় অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবার সময় এল। নেপোলিয়ান হলেন ফ্রান্সের সম্রাট—জোসেফাইন সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা পেল।

তবে আগেকার সেই একাগ্রতা আর জোসেফাইনের প্রতি নেই। নেপোলিয়ানের অধিকাংশ রাত তাঁর অতিবাহিত হয় অন্য নারীর সঙ্গে। প্যারিসের সুন্দরী তরুণীরা সম্রাটের সঙ্গে গোপনে সঙ্গলাভ করবার জন্য উতলা। ইতালির অপেরা গায়িকা লা গ্রাসিনির কথাও তিনি ভুলে যাননি। আল্পস্ পেরিয়ে বেড়াতে গিয়ে প্রথমেই আহ্বান করলেন গ্রাসিনিকে। জোসেফাইনের চোখের সামনেই তাকে নিয়ে গেলেন শয়নকক্ষে।

বারংবার চোখের উপর এই ঘটনা ঘটল। অথচ প্রতিবাদ করবার সাহস নেই জোসেফাইনের । নিজের জালেই সে নিজে জড়িয়ে পড়েছে। তবে সান্ত্বনাও আছে। সে যা চেয়েছিল—বিরাট বৈভব, বিরাট সম্মান, তা পূর্ণভাবে উপভোগ করার সুযোগ নেপোলিয়ান তাকে দিয়েছেন।

এরপর নেপোলিয়ানের জীবনের উল্লেখযোগ্য নারী হল অভিনেত্রী মাদদোয়াজেল জর্জ। তার বয়স মাত্র ষোল বছর। দেখতে অপূর্ব সুন্দরী। বেশকয়েক মাস তাকে নিয়ে উন্মত্ত হয়ে রইলেন বোনাপার্ট। জর্জ নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলেছিল তার এক বান্ধবীকে।

সেই লীলাখেলার সমস্ত কথা বর্ণনা করা যায় না। তবে—নেপোলিয়ানের শয়নকক্ষে পৌঁছাবার পর জর্জের অনুরোধে প্রথম রাত্রি নাকি তিনি তাকে স্পর্শ করেন নি। দ্বিতীয় রাত্রে ওই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটেছিল। তৃতীয় রাত্রে জর্জ তাঁর মনস্কামনা পূর্ণ করেছিল। দু'টি নারী-পুরুষ কামনার গভীর সাগরে ডুব দিয়েছিল কয়েক ঘণ্টা।

প্রত্যহই নাকি নেপোলিয়ান অত্যন্ত সৌজন্য বোধের পরিচয় দিতেন। সকাল হবার সঙ্গে সঙ্গে জর্জকে পোশাক পরিয়ে দিতেন। দ্রুত হাতে বিছানা ঠিক করে

দিতেন। যাতে মনে না হয় এই বিছানাতেই উৎকট বাসনার চরম প্রকাশ ঘটেছিল। মাঝে মাঝে জর্জের সঙ্গে খেলা করেছেন নেপোলিয়ান। আলমারির পিছনে বা অন্য কোথাও গিয়ে লুকিয়েছেন। জর্জ তাঁকে খুঁজে বার করেছে। হেরে যাওয়ার আনন্দে প্রাণ ভরে হেসেছিলেন সম্রাট। সবল বাহু দিয়ে টেনে নিয়েছিলেন সুন্দরী জর্জকে নিজের বুকের উপর।

এত ভালবাসা তবু জর্জ তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। একদিন ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল। এর জন্য দায়ী অবশ্য জর্জ নিজেই। একদিন মাঝরাতের ঘটনা। জর্জকে নিয়ে নেপোলিয়ান বিছানায় শুয়ে আছেন। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লেন। অসুস্থতা তাঁর ক্রমে বেড়ে চলল। আতঙ্কে জর্জ চিৎকার করে উঠল। চিৎকারের শব্দ এত তীব হয়েছিল যে সমস্ত প্রাসাদ সচকিত হয়ে উঠল। চাকররা দরজার সামনে এসে জড় হল। নিজের বিছানা ছেড়ে উঠে এল জোসেফাইন।

এই গুপ্ত প্রেমের কাহিনী পরের দিন ছড়িয়ে পড়ল রাজধানীতে। নেপোলিয়ান কি ভেবে যেন জর্জের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করলেন। আরেকটি বিষয় তাঁর মনকে নাড়া দিল। এই কেচ্ছা প্রকাশিত হবার পর জোসেফাইনের মুখে বাঁকা হাসি লক্ষ্য করেছেন তিনি। সমস্ত পরিস্থিতিটা এবার বাস্তব দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করলেন। জোসেফাইনের সঙ্গে যখন হৃদয়ের সম্পর্ক আর নেই তখন তাকে টেনে বেড়িয়ে লাভ কি?

তবু অজুহাতের আশ্রয় নিলেন নেপোলিয়ান। তিনি অমর নন। একদিন যখন মারা যাবেন তখন তাঁর উত্তরাধিকারী হিসেবে কে বসবে সিংহাসনে? তাঁর ঔরসে জোসেফাইনের কোন সন্তান হয়নি। ইউজিন তাঁর উত্তরাধিকারী হতে পারে না। সুতরাং তিনি দ্বিতীয়বার বিবাহ করতে চান। এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে দ্বিতীয়বার বিবাহ করা সম্ভব নয়। একদিন জোসেফাইনকে সমস্ত বুঝিয়ে বললেন। জোসেফাইন জানে তাকে মেনে নিতে হবে। এতেই মঙ্গল। নইলে কারা-প্রাচীরের অন্তরালে চলে যাওয়া অসম্ভব নয়।

বিবাহ বিচ্ছেদ ঘটে গেল। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দের ১৫ই ডিসেম্বর।

১৮১০ খৃষ্টাব্দের ২১শে জানুয়ারি রাজপ্রাসাদে এক বিশেষ সভা আহ্বান করা হল। আলোচনার একটিমাত্র বিষয় ছিল—সম্রাট এবার কাকে রাণী হিসেবে গ্রহণ করবেন। রাজপুরুষরা একবাক্যে মত দিলেন অস্ট্রিয়ার রাজকুমারীর পক্ষে। নেপোলিয়ান এই প্রস্তাব মেনে নিলেন।

অষ্টাদশ বর্ষীয়া অস্ট্রিয়ার রাজকুমারী সুন্দরী হিসেবে খ্যাত ছিল। বিবাহের প্রস্তাব পেয়ে অস্ট্রিয়ার সম্রাট আনন্দে মত দিলেন। নেপোলিয়নের মত বীরকে জামাতা হিসেবে পাওয়া ভাগ্যের কথা। রাজকুমারী মেরিয়া লুইসারেরও বিশেষ আপত্তি দেখা

গেল না। ইউরোপে তখন বোধহয় এমন একটিও নারী ছিল না যে নেপোলিয়ানের বীরত্বে মুগ্ধ নয়।

১৮১০ খৃষ্টাব্দের ১১ই মে ভিয়েনায় বিবাহ অনুষ্ঠান শেষ হল। অবশ্য নেপোলিয়ান উপস্থিত ছিল না। পাত্রের অনুপস্থিতি রাজকীয় বিবাহে বিশেষ বাধা নয়। স্থির ছিল সপার্ষদ রাজপ্রাসাদ নেপোলিয়ান ও সম্রাজ্ঞীকে অভ্যর্থনা করবেন। কিন্তু চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হওয়ায় তিনি আর প্যারিসে অপেক্ষা করতে পারলেন না। মাঝপথেই সাক্ষাৎ করলেন মেরিয়া লুইসার সঙ্গে। দু'জনেই দু'জনকে আগে দেখেননি। মুখোমুখি হতেই মেরিয়ার সৌন্দর্য দেখে স্তব্ধ হয়ে গেলেন নেপোলিয়ান। মেরিয়াও স্বামীর দেহে এতটা তারুণ্য আশা করেননি।

তিনি মৃদু গলায় বললেন, আমি আপনার যে চিত্র দেখেছি তাতে আপনার চেহারা সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয়নি।

নেপোলিয়ান অল্প হেসে বললেন, সে অপরাধ কিন্তু চিত্রকরের।

মেরিয়াকে নেপোলিয়ান ভালবেসে ছিলেন।

হিটলারের প্রণয়লীলা

বিংশ শতাব্দীর সর্বাপ্রেক্ষা ঘৃণিত পুরুষ আডলফ হিটলার অর্দ্ধেক পৃথিবীকে রক্তে স্নান করিয়ে যখন শ্রান্ত, ক্লান্ত ও পরাজিত হয়ে মর্মন্তুদ মৃত্যুবরণ করলেন—সেই ১৯৪৫ সাল কোটি কোটি মানুষের স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার বছর।

অথচ এই হিটলার জার্মানিকে অন্ধকারের মধ্যে থেকে আলোর রাজ্যে নিয়ে এসেছিলেন। একটি মাত্র মানুষ যে কি অসাধ্যসাধন করতে পারে, তার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে বিশ্ববাসীকে স্তম্ভিত করে দিয়েছিলেন। সেদিন ঘুণাক্ষরেও কেউ কল্পনা করতে পারেনি, এই মানুষ একদিন নরখাদক শার্দুলের চেয়েও রক্তলোলুপ হয়ে উঠবে।

প্রথম মহাযুদ্ধে বিধ্বস্ত জার্মানির এক নগণ্য সৈনিক আডলফ হিটলার। ছবি আঁকতে ভালবাসেন। ছবি আঁকা ও ভবঘুরে স্বভাবের আড়ালে যে তিনি নাৎসি পার্টি গঠনে আত্মনিয়োগ করেছিলেন, তখন অধিকাংশ জার্মানের তা জানবার কথা নয়। হিটলার স্থির নিশ্চিত হয়েছিলেন, রাজতন্ত্র দেশের আর কোন উপকারে লাগতে পারে না। এখন প্রয়োজন ডিক্টেটারশিপ।

নাৎসি নায়ক থার্ড রাইখ ফুয়েরার অল্প সময়ের মধ্যেই সমস্ত জার্মানিকে নিজের অনুগামী করলেন। প্রকৃতপক্ষে তাঁর এই বিজয়কেতন উড়েছিল ১৯৪৪ সালের ১৯শে জুলাই পর্যন্ত। যদিও তখন জার্মানির সম্পূর্ণ পতন হতে বা হিটলারের মৃত্যু হতে বছর খানেক বাকি। ১৯৪৪ সালের ২০শে জুলাই ফুয়েরারকে হত্যা করার এক ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল, ষড়যন্ত্র করেছিল তাঁরই আস্থাভাজন কয়েকজন। টাইম বোমার হাত থেকে রক্ষা পেলেও সেদিন হিটলার নিশ্চয় হৃদয়ঙ্গম করেছিলেন, জার্মানির পতন আরম্ভ হয়ে গেছে। এই কারণেই বোধহয় এরপর ক্ষুব্ধ হিটলার সকলের চোখের আড়ালে চলে গেলেন। এমনকি তখন রটে গিয়েছিল তিনি আর বেঁচে নেই।

দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ক্ষতবিক্ষত মনের অধিকারী চেঙ্গিস্ তাইমুরের উত্তরসুরী হিটলারের এই সময় শোচনীয় দিন কেটেছে একমাত্র এভা ব্রাউনকে অবলম্বন করেই। এভা তাঁর তখন একমাত্র বিশ্বাসভাজন, সান্ত্বনার স্থল। হিটলার কখনও করুণ কণ্ঠে বলতেন, "এভা আর ব্লন্ডিই (তাঁর আদরের কুকুর) শেষ পর্যন্ত আমার বিশ্বস্ত থাকবে।"

হিটলারের একথা অক্ষরে অক্ষরে ফলেছিল।

তাঁর মত দুর্বার ও জঙ্গী মানুষের প্রণয়িনী হতে গেলে যে সমস্ত গুণাবলী থাকা দরকার এভার মধ্যে তা ছিল না। তবে এভা সুন্দরী ছিল। তার চলনে বলনে মাদকতা ছিল। তবু তাকে প্রাণোচ্ছল লাস্যময়ী তরুণীদের পর্যায়ে ফেলা চলে না। একটু গম্ভীর—একটু সংযত। সে অপূর্ব সুন্দরী ছিল বলেই হিটলার তার জন্য আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন একথা মেনে নেওয়ার মধ্যেও কিন্তু কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। কারণ এভার সঙ্গে তাঁর যখন সাক্ষাৎ হয় তখন সুন্দরী নারীর জন্য উন্মত্ত হওয়ার মত মনের অবস্থা ও অবসর তাঁর নেই। তবে তার কি দেখে যে তিনি আকৃষ্ট হয়েছিলেন তা তখন অনুমান করা কঠিন।

হিটলারের প্রণয় সম্পর্কে কিছু উল্লেখ করতে গেলেই প্রথমে এভার কথা সকলের মনে হয়। এবং এই থেকে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে যাতে মনে হয়, তাঁর বুঝি আর কোন প্রণয়িনী ছিল না। প্রকৃত ব্যাপার কিন্তু তা নয়। চ্যান্সেলার হবার আগে একাধিক প্রেমিকা তাঁর ছিল। সত্যি কথা বলতে কি, এই সমস্ত প্রেমিকাদের মধ্যে জনা দুই অকাতরে অর্থ সাহায্য করে তাঁকে জার্মানিকে সর্বময় কর্তার পদে আসীন হবার প্রাথমিক সম্ভাবনাকে সফল করে দিয়েছিল।

এভা ব্রাউনের কথা বলার পূর্বে সেই সমস্ত স্বপ্লালোচিত প্রেমিকাদের সম্পর্কে আলোচনার সূত্রপাত করাই বাঞ্ছনীয়। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের কথা মানুষের কল্পনাতেও আসেনি। প্রথম মহাযুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি কাটিয়ে সবে ইউরোপের মানুষ উঠে দাঁড়িয়েছে। হিটলার অবশ্য রাষ্ট্রবিপ্লবে জয়ী হয়ে তখন জার্মানিকে আবার সাহসী করে তুলছে।

এই সময় প্যারিসের এক সংবাদপত্রে বড় বড় অক্ষরে বিজ্ঞাপন দেওয়া হল, “আগামীকাল জার্মানির চ্যান্সলার অ্যাডলফ হিটলারের প্রণয়লীলার উপর একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হবে।” এই বিজ্ঞাপনটি জার্মান কনসোলেট অফিসে বিশেষ আলোড়ন তুলল। রাষ্ট্রদূত ফরাসি সরকারের কাছে কড়া প্রতিবাদ জানালেন। এবং সতর্ক করে দিলেন, প্রবন্ধটি প্রকাশিত হলে জার্মান সরকার এবং সাধারণ মানুষ অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হবে।

ফরাসি গোয়েন্দা পুলিশ ছুটল সেই দৈনিক পত্রিকার অফিসে। প্রবন্ধটি যাতে সাধারণের কাছে প্রকাশিত না হয় সে জন্য দৈনিকের প্রতিটি খণ্ড বাজেয়াপ্ত করা হল। এত কাণ্ডের পরও দৈনিকের সম্পাদক কাগজে লিখলেন, “এতে আমাদের অপরাধ কোথায় বুঝলাম না। আমাদের মনোভাব জলের মত পরিষ্কার। আমরা তো বিশ্বের সামনে হের হিটলারকে মানুষ হিসেবে প্রতিভাত করতে চেয়েছিলাম। তাঁর জীবনে প্রেম ছিল এবং সেই প্রেমের অভাবেই তিনি একাকিত্ব বোধ করছেন।”

ইতিমধ্যে অবশ্য এই প্রবন্ধ গোপনে ইংল্যাণ্ডে গিয়ে পৌঁছেছিল। আগাম কোন

সূচনা না দিয়েই ইংরাজিতে অনুদিত হয়ে এই প্রবন্ধ আচমকা ওখানে প্রকাশিত হল। এই তথ্যবহুল ও নির্ভরযোগ্যতা প্রবন্ধ থেকে জানা যায়, হিটলারের প্রথম প্রণয় পাত্রী হল একজন ইহুদি তরুণী। হিটলার তখন ভিয়েনায় অবস্থান করছেন। তাঁকে তখন কেউ চেনে না। অতি সাধারণ একজন মানুষ তিনি। দৈবাৎ সাক্ষাৎ হয়ে গেল দু'জনের। হিটলারের তরুণ মন রঙ্গীন হয়ে উঠল। তিনি যেন এই রকম একজন সাথীর অপেক্ষায় ছিলেন।

তরুণীটি একজন ধনী ব্যবসাদারের কন্যা। সেও হিটলারকে মনে স্থান দিতে কার্পণ্য করেনি। ধাপে ধাপে দু'জনের ভালবাসা গভীর থেকে গভীরতর হয়ে চলল। শেষে দু'জনে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবার জন্য স্থির নিশ্চিত হলেন। কিন্তু এই পরিকল্পনায় বাদ সাধলেন তরুণীর ব্যবসাদার জনক। তিনি পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিলেন, তাঁর মেয়ে নিম্নবিত্তের কোন লোকের সঙ্গে জীবন কাটাবে তা তিনি কল্পনাও করতে পারেন না। সে ধনীর গৃহে সুখ-স্বাচ্ছন্দের মধ্যে দিন কাটাবে এই তিনি চান। এবং সে ব্যবস্থাও করছেন।

হিটলার অত্যন্ত হতাশ হলেন। তিনি এরকম অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবেন ভাবতে পারেন নি। মেয়েটিকে নিয়ে যে অন্যত্র কোথাও পালিয়ে যাবেন তারও উপায় নেই। কারণ এই ঘটনার পরই সে আর তাঁর সঙ্গে দেখা করেনি। হতাশা কাটিয়ে ওঠবার পরই দুরন্ত অপমানবোধ হিটলারকে পেয়ে বসল। সেদিন তাঁর হাতে ক্ষমতা থাকলে ইহুদি ব্যবসাদারের নিস্তার ছিল না। অনেকে বলেন তাঁর জীবনব্যাপী ইহুদি বিদ্বেষের কারণগুলির মধ্যে এই কারণটি মূল নাহলেও অন্যতম।

এইভাবে হিটলারের প্রথম প্রেম শেষ হল।

১৯২২ সাল। হিটলার তখন মিউনিখে। আসন্ন রাষ্ট্রবিপ্লবের ধোঁয়া উঠতে আরম্ভ করেছে। তিনি এরই সুযোগে রাজনৈতিক অবস্থাকে উন্নত করতে তৎপর। বিশেষ চিন্তার মধ্যে দিয়ে দিন কাটছিল হিটলারের। জেনি হগের সঙ্গে তাঁর দেখা হল দৈবাৎ এই সময়।

তেইশ বছরের অপূর্ব সুন্দরী জেনি তাঁর ড্রাইভারের বোন। দু'জনের দেখা আরো আগে হওয়া উচিত ছিল কিন্তু পরিস্থিতি প্রতিকূল হওয়ায় তা হয়নি। যা হোক, প্রথম দর্শনেই হিটলার তার প্রেমে পড়ে গেলেন। জেনিরও ওই এক অবস্থা। হিটলার সুদর্শন ছিলেন না, এমনকি মিষ্টভাষী যে ছিলেন তাও নয়, তবে তাঁর চেহারার মধ্যে একটা আকর্ষণীয় শক্তি ছিল যার জন্য মুগ্ধ পতঙ্গের মত মেয়েরা তাঁর কণ্ঠলগ্ন হয়েছে।

দু'জনে স্বপ্নের তুলিতে প্রেমের ছবি এঁকে চললেন দিনের পর দিন ধরে। অবস্থা এমন দাঁড়াল যে মিউনিখে তাঁরা আলোচনার বিষয়-বস্তু হয়ে দাঁড়ালেন। ঘনিষ্ঠ

অবস্থায় শহরের যত্রতত্র প্রেমিক যুগলকে দেখা যেতে লাগল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত এই প্রচণ্ড প্রেম সুষ্ঠ পরিণতিতে পৌছাল না। না পৌঁছাবার দু'টি সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যায়। এই দুটির মধ্যে একটি হল নিশ্চিতভাবে প্রকৃত কারণ।

প্রথমত এই সময় হিটলারের উচ্চকাঙ্ক্ষা মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল। উঁচু মহলে বিরাগভাজন হওয়ার সম্ভাবনা না থাকায় সামান্য ড্রাইভারের বোনকে বিয়ে করতে তিনি রাজি হননি। দ্বিতীয়ত ১৯২৯ সালে বিদ্রোহ করার অপরাধে তিনি গ্রেপ্তার হন। এবং জেলে চলে যাওয়ার দরুণ স্বাভাবিক ভাবে প্রেমের উপর যবনিকা পাত হয়।

এরপর আসছে উইনফ্রেড ওয়াগনারের কথা। হিটলার জেল থেকে বেরুবার পর এই জার্মান সুন্দরীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। প্রকৃতপক্ষে উইনফ্রেডই রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে পরিপূর্ণ অবতরণ করার সুযোগ তাঁকে করে দিয়েছিল। উইনফ্রেডের ধারণা ছিল, আবহমানের জন্য রাজতন্ত্র সুপ্রতিষ্ঠ থাকলেই দেশের মঙ্গল হবে। এবং এই ব্যবস্থাকে সুদৃঢ় করতে পারেন, একমাত্র হিটলার ও তাঁর নব প্রবর্তিত নাৎসি দল। সে ঘুণাক্ষরেও বুঝতে পারেনি, হিটলার রাজতন্ত্র বিরোধী এবং জার্মানির সিংহাসন দখল করে দেশে ডিক্টেটরশিপ প্রবর্তনের মনস্থ করেছেন। তাঁর এই উৎকট আকাঙ্ক্ষার কথা তখন কারুরই জানবার কথা ছিল না। এমন কি নাৎসি সদস্যদের কাছেও তিনি নিজের মন পরিষ্কার করেন নি।

ফ্রাউ উইনফ্রেড নবযৌবনা নয়। যৌবনের মধ্যগগনে হলেও অপূর্ব সৌন্দর্য ও সুন্দর দৈহিক গঠনের জন্য তাকে নবযৌবনা বলে ভ্রম হত। অচিরেই দু'জনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠল। সে সময় হিটলারের আর্থিক অবস্থা শোচনীয় অথচ নাৎসি দলের জন্য প্রচুর অর্থের প্রয়োজন। এই অভাব অনেকাংশে পূর্ণ করেছিল ফ্রাউ উইনফ্রেড। হিটলার ফ্রাউকে আন্তরিকভাবে ভালবেসেছিলেন একথা বলা চলে না। অর্থের প্রয়োজনেই তিনি ভালবাসার অভিনয় করেছিলেন। ফ্রাউ তাঁকে আন্তরিকভাবে ভালবেসেছিলেন। শুধু তাই নয় তার নাৎসি দল যাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারে, সেজন্য তার চেষ্টার বিরাম ছিল না। পার্টির জন্য লক্ষ লক্ষ মার্কের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেই সে হিটলারের সঙ্গে প্রিন্সেস মেরি এডলেডের পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল।

সুন্দর মুখের অধিকারিণী মধ্যযৌবনা প্রিন্সেস মেরি কামাতুর মহিলা ছিলেন। তিনবার তিনি স্বামী বদল করেছিলেন। এছাড়া অসংখ্য গুপ্ত প্রণয়। অবশ্য অপর্যাপ্ত অর্থ থাকার দরুণই জীবনকে তারিয়ে তারিয়ে উপভোগ করবার সুযোগ পেয়েছিলেন। হিটলারকে তিনি সাদরে গ্রহণ করলেন।

আরম্ভ হল উদ্দাম প্রেমলীলা। নাৎসি দল সংগঠনের ব্যাপারে মেরি প্রচুর অর্থ দিয়েছিলেন হিটলারকে। এই প্রেম দীর্ঘস্থায়ী হবার আগেই তাঁর সঙ্গে আলাপ

হল প্রিন্সেস সিসিলির। প্রিন্সেস সিসিলি ছিলেন কাইজার উইলিয়ামের মেয়ে। রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে যাবার পর তিনি একান্তে জীবন অতিবাহিত করছিলেন। ফ্রাউ উইফ্রেডের মত তাঁর ধারণা ছিল, একমাত্র রাজতন্ত্রেই জার্মানির মঙ্গল হতে পারে। হিটলারের সঙ্গে পরিচিত হবার পর তিনি উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন। উইনফ্রেড যে ভুল করেছিল তিনিও সেই ভুল করে বসলেন। তাঁর দৃঢ় ধারণা হল, হিটলার ও তাঁর নাৎসি দল রাজতন্ত্রকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। একথা উল্লেখ না করে উপায় নেই যে, নারী-পুরুষ নির্বিচারে নিজের দিকে আকর্ষণ করবার ঐশ্বরিক ক্ষমতা হিটলারের ছিল।

অবস্থা এমন দাঁড়াল যে, ব্ল্যাঙ্ক চেকে স্বাক্ষর করে প্রিন্সেস সিসিলি হিটলারের হাতে তুলে দিতে লাগলেন। নাৎসি দল আর গুপ্ত সমিতি রইল না, ফুলে ফেঁপে উঠল। নানা শহরে দলের শাখা বিস্তার লাভ করল। অন্ধকার হাতড়ে আর হিটলারকে বেড়াতে হল না, তিনি আলোর উপকূলে এসে পৌঁছালেন। এই দুই রাজকুমারীর কাছ থেকে অপর্যাপ্ত সাহায্য না পেলে, পরবর্তী জীবনে হিটলার সমস্ত বিশ্বকে হুমকি দেওয়া দূরের কথা—জার্মানির চ্যান্সলারের পদটিও করায়ত্ত করতে পারতেন না।

তাঁর এই ধারাবাহিক প্রেম নিষ্কাম ছিল একথা বলা চলে না। তিনি দুই রাজকুমারীর উষ্ণ দৈহিক স্পর্শে বারংবার অনুভব করেছেন এ সম্পর্কে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই। এই সময় আরো দুটি নারী হিটলারের জীবন খণ্ডে প্রবেশ করল। তাদের মধ্যে একজন হ'ল মার্গারেট শ্লেজক। ভিয়েনার এই সুন্দরীকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে হিটলার মজলেন। অল্প সময়ের মধ্যে দু'জনের গাঢ় সম্পর্ক গড়ে উঠল। মার্গারেটকে বিয়ে করার জন্য তৎপর হলেন হিটলার। কিন্তু বিয়ে হল না। বুদ্ধিমতী মার্গারেট জানাল, এই সময় বিয়ে হলে হিটলারের রাজনৈতিক জীবনের বিশেষ ক্ষতি হবে। সুতরাং সে তাঁর কাছ থেকে সরে দাঁড়াতে চায়।

দ্বিতীয়া হল সে কালের আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্না চিত্রাভিনেত্রী লেনি রিফেন্সটল। সে সময় তার বয়স ছিল আটাশ বছর। নাটকীয়ভাবেই হিটলারের সঙ্গে লেনির পরিচয় হয়ে যায়। ১৯২৩ সালে সে মিউনিকের এক ব্যালে গ্রুপের সদস্যা হিসাবে নিজের কর্মজীবন আরম্ভ করে। তারপর উন্নতির সোপান দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে ১৯৩০ সালে প্রখ্যাতা চিত্রাভিনেত্রী হিসেবে খ্যাতি অর্জন করে। দু'জনের সম্পর্ক গভীর হবার পর হিটলার লেনিকে "জার্মান ফিল্ম সিণ্ডিকেটের" প্রধান পদে বসিয়ে দিলেন এবং "ন্যাশন্যাল সোসালিষ্ট কংগ্রেস" সম্পর্কিত যে চিত্রটি তোলার পরিকল্পনা হয়েছিল—তা পরিচালনা করবার ভার তাকে দিলেন।

লেনির সঙ্গে বেশ কিছুদিন ঘনিষ্ঠ ছিলেন হিটলার। তারপর যথা নিয়মে তাঁর

স্বভাবসিদ্ধ রীতিতে তার কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন। অনেকে মনে করেন এভা ব্রাউনের সঙ্গে পরিচয় হওয়ার দরুণ তিনি লেনির কাছ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন। এভার কথা পরে আসছে। তার আগে হিটলারের বংশ পরিচয় সম্পর্কে কিছু আলোচনা করে নেওয়া যেতে পারে।

হিটলারের জন্ম হয়েছিল ১৮৮৯ সালে।

বিচিত্র তাঁর পারিবারিক ইতিহাস। এবং একথা শুনলে বিস্মিত হতে হয় যে, প্রচণ্ড ইহুদিবিদ্বেষী হিটলারের শরীরে ইহুদি রক্ত ছিল। তাঁর জীবদ্দশায় একথা প্রকাশ পায়নি। তখন এমন কারুর সাহস ছিল না থার্ড রাইখের ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যথাযথ কথা লিখতে পারে। নাৎসি জার্মানিতে যে সমস্ত জীবনী প্রকাশিত হয়েছিল, সেগুলি তাঁর স্তুতিগান ছাড়া আর কিছুই নয়। এমন কি হিটলার নিজের প্রখ্যাত আত্মজীবনী "মেইন ক্যাথে" তে যা কিছু লিখেছেন তার অধিকাংশ কল্পনার মহাসমুদ্র ছাড়া আর কিছুই নয়, তা নির্দ্বিধায় প্রমাণিত হয়েছে।

১৯৩০ সাল পর্যন্ত নিজের বংশ পরিচয় সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন না। যেদিন জানতে পারলেন তাঁর শরীরে ইহুদি রক্ত বইছে, সেদিন তাঁর মনোভাব কল্পনা করার মত। যে ইহুদিদের বিরুদ্ধে তিনি বিষ উগরে চলেছেন, যাদের সমূলে উচ্ছেদ করতে তৎপর, তাঁর দেহে সেই রক্ত। গবেষকরা বলেন, হিটলার বিভীষিকা দেখতে আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু তাঁর ইহুদি-বিদ্বেষী মনোভাব আরো প্রচণ্ডতর হয়ে উঠেছিল।

কিন্তু এভাবে তিনি জানতে পারলেন, তাঁর বংশে ইহুদি রক্ত প্রবেশ করেছে। এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই হ্যান্স ফ্রাঙ্কের লেখা "এ্যাট দি প্যালেস ফুট অ্যান ইণ্টরপ্রিটেশন অফ হিটলার অ্যাণ্ড হিজ এজ" নামে বইটির কথা তুলতে হবে। হ্যান্স ফ্র্যাঙ্ক ছিলেন হিটলারের বিচার বিভাগীয় মন্ত্রী। যুদ্ধের শেষে তাঁর মৃত্যুদণ্ড হয়েছিল। মৃত্যু পূর্বে জেলে বসে তিনি বইখানি লেখা শেষ করেন। হিটলারের জীবনের অনেক অজানা কথা এই বই থেকে জানা যায়। আর জানা যায় রাইখের শরীরে ইহুদি রক্ত থাকার কথা।

১৯৩০ সাল শেষ হয়ে আসছে। হিটলার একটি চিঠি পেলেন। চিঠি পড়ে হতভম্ব হয়ে গেলেন তিনি, তারপর শরীরের সমস্ত রক্ত মাথায় গিয়ে জমা হতে লাগল। ক্রমে তিনি স্থির নিশ্চিন্ত হলেন, তাঁর বংশ পরিচয়ে গলদ আছে, একথা লিখে পত্রলেখক তাঁকে ভয় দেখাবার চেষ্টা করেছেন। তাঁর সৎভাই এ্যলয়ের ছেলে একাজ করেছে বলে তাঁর ধারণা হল। সে যা লিখেছে, তার সারমর্ম হল— "হিটলার সংবাদপত্রে ইহুদিদের বিরুদ্ধে ঘৃণা ও কুৎসাপূর্ণ বিবৃতি দিয়ে থাকেন, কিন্তু তাঁর

শরীরেই যখন ইহুদি রক্ত প্রবাহিত তখন এই ধরনের বিবৃতি প্রচার করা তাঁর শোভা পায় না।"

চেষ্টা করেও এই প্রসঙ্গ ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না হিটলার। নিজের সম্পর্কে কৌতূহল জাগ্রত হল। হ্যান্স ফ্র্যাঙ্ককে ডেকে পাঠিয়ে চিঠিটা পড়তে দিলেন এবং বললেন, নিকট আত্মীয়রা এই ধরনের বিশ্রী প্রচারে নামুক তা আমি চাই না। আপনি ব্যাপারটা অনুসন্ধান করে দেখুন।

অনুসন্ধানের কাজে উঠে পড়ে লাগলেন হ্যান্স। কয়েক মাসের মধ্যে যে তথ্য সংগৃহীত হ'ল তাতে পত্রলেখকের উক্তির সমর্থন পাওয়া গেল। হিটলারের ঠাকুরমা আন্না মারিয়া ভিয়েনার ফ্র্যাঙ্কিন বেরগার পরিবারে রান্নাবান্নার কাজ করতেন। এই পরিবারটি ইহুদি। মারিয়ার তখন যৌবনকাল। বহু বছর পরে তিনি যখন ফিরে এলেন তখন গ্রামের লোকেরা দেখল, কুমারী মারিয়া সন্তান-সম্ভবা। বাড়িতে তাঁর স্থান হল না। সন্তান জন্মগ্রহণ করল ধর্মীয় আতুর আশ্রমে। সন্দেহ করা হল, এই অবৈধ সন্তানের জনক ওই ইহুদি পরিবারের একটি তরুণ। এই সন্দেহ দৃঢ় হবার কারণ হল, চাকরি ছেড়ে দেবার পরও ইহুদি পরিবারের কর্তা দীর্ঘ চৌদ্দ বছর ধরে মারিয়াকে অর্থ সাহায্য করেছেন।

যথাসময়ে এই রিপোর্ট হ্যান্স পেশ করলেন হিটলারের কাছে। হিটলার সমস্ত পড়বার পর মন্তব্য পেশ করলেন, আমি নিশ্চিতভাবে জানি আমার বাবা গ্রাৎসের কোন ইহুদির ঔরশজাত নন। একথা আমি শুনেছি ঠাকুরমা ও বাবার মুখ থেকে। কুমারী অবস্থায় ঠাকুরমার সঙ্গে যার অন্তরঙ্গতা হয়েছিল তিনি পরে তাকে বিয়ে করেছিলেন।

বলা বাহুল্য হিটলার এই কথাগুলি বলে মিথ্যার আবরণ দিয়ে সত্যকে ঢাকবার চেষ্টা করেছিলেন। কারণ ঠাকুরমার মুখ থেকে তাঁর কোন কথা শোনবার উপায় ছিল না। তাঁর জন্মের পর প্রায় চল্লিশ বছরের কিছু আগে মারিয়া মারা গিয়েছিলেন। দ্বিতীয়ত ১৯০৩ সালে হিটলারের বাবা যখন মারা যান তখন হিটলারের বয়স মাত্র চৌদ্দ বছর। কোন বাপ নিজের গর্ভধারিণীর কলঙ্ক-কাহিনী নিয়ে অল্প বয়সী ছেলের সঙ্গে আলোচনা করবেন একথা বিশ্বাস করা যায় না। তবু এই কথা নিজের কাজ দিয়ে আপ্রাণভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন হিটলার। মৃত্যু পর্যন্ত নির্মম হাতে ইহুদিদের সংহার করে তিনি সকলকে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন যে, তিনি ইহুদি ছিলেন না। তাঁর অত্যাচার মধ্যযুগীয় বর্বরতাকেও লজ্জা দিয়েছে।

এভা ব্রাউন।

হিটলারের জীবনের একমাত্র উজ্জ্বল নক্ষত্র।

এভার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের কথা ভাবলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়। মনে পড়ে যায় হিটলারের জীবনের বিপর্যস্ত শেষ দশ দিনের কথা। যেদিন লাল ফৌজের প্রচণ্ড গোলা বর্ষণে চূর্ণ-বিচূর্ণ বার্লিন। পথে পথে অলিন্দে-অলিন্দে সম্মুখ যুদ্ধে হাজার হাজার জার্মান প্রাণ দিচ্ছে। হিমলার, গোয়েরিং এর মত বিশ্বস্ত অনুচরেরা তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে—সেদিন, এভা মনের কোণেও স্থান দিতে পারেন নি যে, অসহায় ফুয়েরারকে ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যাবেন। বরং হিটলারই তাঁকে বাঙ্কার থেকে সরিয়ে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তরিত করবার ব্যবস্থা করেছিলেন। এভা যায় নি, দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ করেছিলেন।

হিটলার নিজের জীবনের শেষ বারটা বছর অন্তরঙ্গভাবে ছিলেন এভার সঙ্গে। তিনি আর কাউকে এত ভালবাসতে পারেন নি। পূর্বে যে সমস্ত নারী তাঁর জীবনে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কেউই তাঁকে এভার মত ভালবাসতে পারেনি। কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য নিয়ে হিটলারের জীবনে আসেন নি এভা। তাঁর আকাশ ছোঁয়া পদ-মর্যাদায় দিশেহারা হয়ে পড়ে নি। তাঁর ব্যক্তিত্বকে ভাল লেগেছিল, তাই প্রাণ দিয়ে ভালবেসে ফেলেছিলেন আগামী দিনের বিশ্ব-ত্রাস ফুয়েরারকে।

এভার পারিবারিক ইতিহাস পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা যায় না। গ্রেটেল তাঁর বোন। গ্রেটেলের স্বামী হারমান ফেগেলাইন জার্মান সরকারের কর্মচারী ছিলেন। পরবর্তী জীবনে হিটলার এভার অনুরোধে ফেগেলাইনকে উচ্চ সামরিক পদে নিযুক্ত করেন।

দুই প্রেমিকের পরিচয়ের প্রথম সেদিনগুলির কথা একরকম কুয়াশাছন্ন। হিটলারের কোন অন্তরঙ্গ অনুচর এভার সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দেন। সেই হল আগামী বার বছরের প্রগাঢ় প্রেমের সূত্রপাত। যদিও দু'জনের বিয়ে হয়েছিল মৃত্যুর ঠিক পূর্ব দিনে। তবু এভা বারটা বছর স্ত্রীর কর্তব্যই পালন করে গেছেন।

হিটলারের এই প্রণয়লীলা তখনকার জার্মানির অন্যতম গোপন কাহিনী। তিনি অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে এভাকে গোপন করে রাখতে পেরেছিলেন, লক্ষ লক্ষ জার্মানের রসাল আলোচনার বিষয় থেকে। শুধু এভার কথা জানা ছিল, তাঁর অন্তরঙ্গ অনুচর ও ব্যক্তিগত ভৃত্যদের। এবং কড়া হুকুম দেওয়া ছিল, একথা যেন কোন মতে প্রকাশ না পায়। এমনকি এভাকে সঙ্গে নিয়ে একটি ছবিও তিনি তোলেননি।

এভা ব্রাউন গম্ভীর প্রকৃতির মেয়ে ছিলেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে কখনও তিনি হস্তক্ষেপ করেননি। ও সম্পর্কে কোন মন্তব্য বা কোন আলোচনা পর্যন্ত তিনি কখনও করেননি হিটলারের সঙ্গে। অবসর কাটত তাঁর বই নিয়ে। রাজনৈতিক খচাখচির মধ্যে থাকলেও চিত্রকলা সম্বন্ধে হিটলারের আগ্রহ কোনদিন কমেনি। এভা এই চিত্র নির্বাচনের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করতেন। ফুয়েরার এভার মনের গতি গভীরভাবে

লক্ষ্য করেছিলেন। রাজনৈতিক ব্যাপারে তাঁকে প্রভাবিত করবার সমস্ত রকম সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সে পথ বেছে নেননি বা তাঁর ব্যবস্থাভাজন বোরমানকে তিনি পছন্দ করতেন না, তবু, কখনও কোন অভিযোগ উত্থাপন করেননি। এসমস্তই জানতেন হিটলার। প্রেমিকার প্রতি শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভাব পোষণ করতেন।

এভার স্বাচ্ছন্দ ও নিরাপত্তার উপর হিটলারের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। তাঁকে প্লেনে চড়তে দিতেন না দুর্ঘটনার সম্ভাবনায়। ওই একই কারণে চল্লিশ মাইল স্পিডের বেশি মোটর তাঁকে চালাতে দেওয়া হত না। ভৃত্যরা যাতে তাঁর নাম ধরে ডাকতে না পারে সে ব্যবস্থাও তিনি করেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে কিছু বলতে গেলে ই, বি, বলে উল্লেখ করতো। যে প্রণয়িনীর জন্য এত সতর্কতা, এত উৎকণ্ঠা তাঁকে কেন বিয়ে না করে সামাজিক পরিচয় থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিলেন, তা অনুমান করা যায় না। হিটলার নিজের উইলে এভা সম্পর্কে বলেছেন, "দীর্ঘকালের সত্যিকারের বন্ধু।"

এঁদের দু'জনের প্রেমের শেষ পরিণতি দেখতে হলে আমাদের ফিরে যেতে হবে রক্তস্নাত বার্লিনের শেষ দিনগুলিতে—নামতে হবে রাইখ চ্যান্সলারের পঞ্চাশ ফুট মাটির নিচেকার বাঙ্কারে। যুদ্ধ যে শেষ হয়ে যাচ্ছে, সমস্ত রণাঙ্গনে নাৎসি বাহিনী যে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেছে একথা বুঝেও বুঝতে চাইছেন না হিটলার। বাঙ্কারের মন্ত্রণাকক্ষে সেনাপতিদের নিয়ে ঘন ঘন আলোচনা করেছেন, এখনও তাঁর আশা আছে—অনেক আশা।

১৯৪৫ সালের ২৯শে এপ্রিল।

তখনও কেউ জানে না হিটলারের জীবনের উপর যবনিকা পড়তে আর একদিন মাত্র বাকি! থমথমে ভাব বিরাজ করছে রাইখ চ্যান্সলারের বাঙ্কারে। গত কয়েক দিনে অবিশ্বাস্য গোটা কয়েক ঘটনা ঘটে যাওয়ায় হিটলার দিশেহারা। তিনি জানতে পেরেছেন. তাঁর শেষ ভরসা স্টেইনের সৈন্য বাহিনী বিধ্বস্ত। হিমলার তাঁর সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। মিত্র পক্ষের কাছে তিনি আত্মসমর্পণের প্রস্তাব পাঠিয়েছেন সুইজারল্যাণ্ডের মাধ্যমে। স্বীকার না করলেও তিনি জেনেছেন, এভার ভগ্নীপতি ফেগেলাইনও ওই দলে আছেন। তাঁকে বাঙ্কারেই বন্দী করে রাখা হয়েছে।

এইরকম শোচনীয় অবস্থার মধ্যে হিটলার এভাকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দেননি। তাঁর নিরাপত্তার কথা তিনি সবচেয়ে আগে চিন্তা করেছেন। ব্যক্তিগত কাগজপত্র নষ্ট করে ফেলবার আদেশ দেবার পর তিনি এভাকে কাছে ডেকে বললেন, তৈরি হয়ে নাও এখান থেকে যাবার জন্য। ঘণ্টা দু'য়েকের মধ্যেই প্লেন ছাড়বে, দেরি করলে এই বেড়াজাল থেকে বেরুতে পারবে না। আমি এখানেই মরবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছি।

এটা কিন্তু ২৯ শে এপ্রিলের ঘটনা নয়। দিন সাতেক আগেকার ব্যাপার। এই কথার তীব্র আপত্তি জানালেন এভা। বলতে গেলে এই প্রথমবার তিনি প্রিয়তমার কথার প্রতিবাদ করলেন। বললেন, আমি যে যেতে পারি না তা তো তুমি জানো। আমি তোমার কাছে থাকব বলেই তো এখানে এসেছি।

হিটলার তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি রাজি হলেন না।

তারপর ভয়ঙ্কর রূপে দেখা দিল ২৯শে এপ্রিলের এই দিনটি। তাঁর অতিপ্রিয় গোয়েরিং টেলিগ্রাম করে জানিয়েছেন, কয়েক ঘণ্টার মধ্যে স্বেচ্ছায় সরে না দাঁড়ালে বাধ্য হয়ে তিনি চ্যান্সলারের পদ অধিকার করবেন।

চিৎকার করে উঠলেন হিটলার, বেইমান—বিশ্বাসঘাতক!

এ যে কল্পনার অতীত। যাদের তিনি নিজের হাতে গড়েছেন তারাই তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে। আর সন্দেহ নেই, ভাগ্যের চাকা অনেকখানি ঘুরে গেছে। তাঁকে সচেতন করবার জন্যই যেন লাল ফৌজের প্রচণ্ড বোমা বর্ষণ কানে এসে আঘাত করছে। তিনি মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছেন দাউ দাউ করে পুড়ছে বার্লিন।

আশা নেই!। আর আশা নেই!!

হিটলার অসীম বলে নিজেকে সংযত করলেন। বিশ্বাসঘাতকদের মধ্যে অন্যতম বন্দী ফেগেলাইনকে গুলি করে মারার আদেশ দিলেন তিনি। তারপর চলে গেলেন এভার কাছে। কথা প্রসঙ্গে জানালেন, আহত সেনাপতি গ্রাইসের বার্লিনের বাইরে যাচ্ছে, কাউকে চিঠি দেবার ইচ্ছে থাকলে দেওয়া যেতে পারে। এভা লিখলেন গ্রেটেলকে। অবশ্য ভগ্নীপতির শোচনীয় মৃত্যুর কথা জানালেন না তাকে।

এরপর দু'জনের মধ্যে কি কথা হয়েছিল জানা যায় না। তবে ঘটনা পরম্পরায় কথাটা চিন্তা করলে অনুমান করে নেওয়া যায়। জীবনের শেষ মুহূর্তে বিয়ের প্রস্তাব করেছিলেন হিটলার। বলা বাহুল্য এভা অমত প্রকাশ করেন নি। কারণ এভার মত ব্যক্তিত্বসম্পন্না নারীর পক্ষে সামাজিক পরিচয়হীন অবস্থায় দিন অতিবাহিত করা বেদনাদায়ক ছিল। সামাজিক প্রতিষ্ঠা আসার পর তাঁর মৃত্যু হোক এই ইচ্ছা প্রবল থাকার দরুণই হিটলারকে ছেড়ে যেতে চাননি।

তাঁদের বিয়ের কথা প্রচারিত হল বাঙ্কারে। সকলেই উৎসুক। এই চরম বিপর্যয়ের দিনে এরকম সম্ভাবনার কথা কারুর মনে হয়নি। ওয়াল্টার ভাগনার বিয়ের পৌরোহিত্য করলেন। এভা প্রচলিত নিয়মকে উপেক্ষা করে কালো পোশাক পড়েছিলেন। সংক্ষিপ্ত আচারের মধ্যে অনুষ্ঠান শেষ হল। ম্যারেজ রেজিস্ট্রারের খাতাতে এভা লিখলেন, "এভা বি"। তারপর নিজের ভুল বুঝতে পেরে "বি"টা কেটে লিখলেন,' "এভা হিটলার, লী ব্রাউন"।

অনুষ্ঠানের শেষে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার সময় পরিচারকদের দিকে তাকিয়ে

বললেন, এবার তোমরা আমাকে ফ্রাউ হিটলার বলে ডাকতে পার।

বিয়ের পর কনফারেন্স গ্যালারিতে এসে গোয়েবলস, বোরম্যান ও অন্যান্য অনুচরদের সঙ্গে শ্যাম্পেন পান করলেন হিটলার। তারপর পাশের ঘরে চলে গেলেন সেক্রেটারিকে সঙ্গে নিয়ে। নিজের দু'টি উইল ডিক্টেশন দিলেন। একটি রাজনৈতিক, অন্যটি ব্যক্তিগত। রাজনৈতিক দলিলে দায়ী করলেন ইহুদিদের। ব্যক্তিগত উইলে তিনি এভা ব্রাউনের প্রশংসা করলেন। সম্পত্তি দিয়ে গেলেন পার্টিকে।

দুপুরের দিকে অনুচরদের বললেন, আমাদের সম্মানে যেন হানি ঘটাতে না পারে শত্রুপক্ষ। আমার ও এভার দেহ এমনভাবে পোড়ান হবে যাতে শরীরে চিহ্নমাত্র না থাকে।

আরেকটি দিন গড়িয়ে গেল। এল ৩০শে এপ্রিল। বাঙ্কারের চতুর্দিকে বিরামহীন-ভাবে বোমাবর্ষণ হচ্ছে। দ্বিপ্রহরের আহারের পর অনুচরদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন হিটলার। এভাকে সঙ্গে নিয়ে শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন। বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হল না কাউকে। গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল। গোয়েবলস ও অন্যান্যরা দ্রুত পায়ে হিটলারের ঘরে প্রবেশ করলেন। রক্তাক্ত মুখে ফুয়েরার স্পন্দনহীন হয়ে পড়ে আছে সোফায়। মুখের মধ্যে রিভলবারের নল ঢুকিয়ে গুলি করেছিলেন। এভা শুয়ে রয়েছেন আরেকটি সোফায়। তিনি বিষ খেয়েছেন।

বিশ্বত্রাস হিটলার নাটকীয়ভাবেই বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে। যাবার সময় কম চমক রেখে গেলেন না। সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন, প্রেমিকা এভাকে। জীবনে অসংখ্য ভুল করেছিলেন, অপরিণামদর্শিতার চরম নিদর্শন রেখেছেন, দাম্ভিকতার শেষ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছেন, শেষ সময় সমস্তই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন। আত্মধিক্কারে মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে করেছিল হয়তো। তবে একটা বিষয়ে নিশ্চয় তাঁর নিজের কোন আক্ষেপ ছিল না, এভাকে নির্বাচন। এভার একনিষ্ঠ প্রেম বারটা বছর তাঁকে সহস্র প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও সজীব রেখেছে। এই ভালবাসার তুলনা হয় না। হিটলারও এই ভালবাসার আন্তরিক প্রতিদান দিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে স্বার্থপরতার কথা তিনি ভাবতেও পারেন নি।

প্রেমিক যুগলের দেহ ভারি কম্বল দিয়ে ঢেকে ফেলা হল। সকলে মৃতদেহ বয়ে নিয়ে চললেন, চ্যান্সলারের বাগানে। এখানে পেট্রোল ছিটিয়ে পোড়ান হবে দু'জনকে। চতুর্দিকে আগুনের শিখায় লাল হয়ে উঠেছে। গোয়েবলস, বোরমান প্রমুখ সেনাপতিরা কামানের শব্দ ছাপিয়ে যেন শুনতে পাচ্ছেন লাল ফৌজের পদধ্বনি।

অষ্টম এডওয়ার্ডের রাজকীয় প্রেম

প্যারিসের একটি বিখ্যাত চিত্রগৃহ অন্যান্য দিনের মত আজ জনবহুল নয়। চিত্র প্রদর্শন যে বন্ধ আছে তাও নয়। 'এক সম্রাটের কাহিনী' নামে একটি চিত্র প্রদর্শিত হবে। তবে সাধারণ দর্শকের প্রবেশাধিকার নেই, দর্শক হিসেবে উপস্থিত হয়েছেন, বিশেষভাবে আমন্ত্রিত দু'শ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি।

দর্শকদের মধ্যে ইংল্যাণ্ডের প্রাক্তন সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড ও বর্তমানের ডিউক অব উইণ্ডসর সস্ত্রীক উপস্থিত রয়েছেন। প্রদর্শনী আরম্ভ হল। পর্দার উপর ভেসে উঠল সেই সমস্ত ঘটনা যা বাস্তবে ঘটেছিল। সেই অতুলনীয় ভালবাসা, সেই অবিস্মরণীয় সঙ্কল্প, সেই সিংহাসন ত্যাগ—সমস্তই একে একে প্রদর্শিত হল। অন্ধকারের মধ্যেই ডিউক অব উইণ্ডসর ডাচেসকে চুম্বন করলেন। আলো জ্বলে ওঠার পর আবার দু'জনের ওষ্ঠ নিবিড়ভাবে মিলিত হল?

তারপর বৃদ্ধ ডিউক পকেট থেকে রুমাল বার করে চোখের উপর বুলিয়ে নিয়ে ভেজা গলায় বললেন, "তোমরা আমায় ক্ষমা কর। আমার চোখে জল এসে যাচ্ছে।"

জীবনের প্রান্তসীমায় এসে, নিজের ফেলে আসা দিনের আলোছায়া চোখের উপর দেখে অভিভূত হয়ে যাওয়াই স্বাভাবিক। সে দিন তাঁকে নিয়ে রাজপরিবারে ও ইংল্যাণ্ডের রাজনৈতিক আকাশে মেঘের ঘনঘটা দেখা দিয়েছিল। একজন সাধারণ নাগরিক থেকে লর্ড প্রিভিসিল পর্যন্ত সকলের মনে একই প্রশ্ন জেগেছিল, একটি নারীর জন্য এতবড় স্বার্থত্যাগের নজীর সৃষ্টি করা বোকামি ছাড়া আর কি?

আজকের ডিউক অব উইণ্ডসর, সেদিনের অস্থায়ী সম্রাট অষ্টম এডওয়ার্ড তবু দৃঢ়তার সঙ্গে জানিয়েছেন, একটি নারীকে বিয়ের মত সামান্য ব্যক্তিগত ইচ্ছা পূরণ করার অধিকার যেখানে তাঁর নেই, সেখানে রাজা হয়ে থাকার মত হাস্যকর আর কি আছে!

সিংহাসন ত্যাগ করতে কৃতসঙ্কল্প তবু সমালোচনা থামতে চায় না। অনেকে পরোক্ষে সদম্ভ প্রশ্ন তোলেন, যে নারী দু'বার স্বামী পরিত্যাগ করতে পারে,

ভবিষ্যতে সে যে আবার সেই পন্থা অবলম্বন করবে না তার নিশ্চয়তা কোথায়? তখন দু'কূলই হারাবেন এডওয়ার্ড।

এডওয়ার্ড ভেবে কূল পাননি, কেন এত সহানুভূতি, কেন এত উপদেশ। তবে একটা বিষয়ে তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্র তাঁর বিরুদ্ধে কিছু লিখবে না। স্বেচ্ছায় যে তারা নিরস্ত রয়েছে তা নয়। এতবড় মুখোরোচক সংবাদকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে লেখার জন্য কলম নিসপিস করারই কথা। সংবাদপত্র জগতের একচ্ছত্র সম্রাট লর্ড বিভারব্রুক এডওয়ার্ডের বন্ধু। তিনি ফ্লিট স্ট্রীটকে স্তব্ধ করে রেখেছেন।

আমেরিকান প্রেস অবশ্য অনেক কথা লিখেছিল। তবে অধিকাংশ পত্র স্থায়ী রাজাকে সমর্থন করেছিল বলা চলে। "রেড বুক ম্যাগাজিনে" লেখা হল, "এডওয়ার্ড কেবল প্যালেসের কর্মচারী ও মন্ত্রীবর্গের সঙ্গে মিশতে পেতেন। তাঁর উপর সর্বদা দৃষ্টি রাখা হত। আহত হতে পারেন এই আশঙ্কায় তাঁকে খেলাধুলায় যোগ দিতে দেওয়া হত না। তিনি বিদেশ ভ্রমণের আনন্দ থেকেও বঞ্চিত ছিলেন। এই সমস্ত কারণে যৌবনের মধ্যদিন পর্যন্ত কোন ঘনিষ্ঠ সঙ্গী তিনি লাভ করতে পারেন নি। এই অবস্থায় তিনি যদি মিসেস সিম্পসনের মত কোমল হৃদয়া নারীর সঙ্গে পরিচিত হয়ে, তার প্রতি আকর্ষণ অনুভব করেন তাহলে বিস্ময়ের কোন কারণই থাকতে পারে না।"

তখনকার সুপ্রসিদ্ধ মার্কিন সাংবাদিক আর্থার ব্রিসবেন লিখলেন, "এডওয়ার্ড যদি সলোমানের বংশসম্ভূতা কোন অ্যাবিসিনিয়ান রাজকুমারীকে বিয়ে করতে চাইতেন তবে ইংরাজদের কোন আপত্তি দেখা যেত না। কারণ সে রাজকুলসম্ভবা। কোন আমেরিকান নারী নয়। ভুলে গেলে চলবে না, মিসেস সিম্পসন আমেরিকার নাগরিক।"

সজল চোখে আজ ডিউকের নিশ্চয় সেই সমস্ত দিনের কথা বেশি করে মনে পড়ে যাচ্ছে। মনে পড়ছে প্রিয়তমার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎকারের কথা।

সেদিন—১৯৩১ সালের শীতকাল। লিষ্টারশায়ারের এক বন্ধু প্রিন্স অব ওয়েলসকে আমন্ত্রণ জানালেন অবসর বিনোদনের জন্য। বৃটিশ সাম্রাজ্যের ভাবী উত্তরাধিকারীর আর কাজ কি? অখণ্ড অবসরের মধ্যেই তাঁর দিন অতিবাহিত হয়। অবসর বিনোদনের জন্যই বন্ধুর আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন এডওয়ার্ড। যথা সময় পৌঁছালেন বন্ধুগৃহে।

এডয়ার্ড একমাত্র আমন্ত্রিত ছিলেন না। এক মার্কিন দম্পতি আগেই সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। মিষ্টার সিম্পসন অমায়িক ভদ্রলোক। তাঁর স্ত্রী মনোহরা, রসিকা ও শান্তস্বভাবা। এক শীতের সন্ধ্যায় এঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল এডওয়ার্ডের।

ওয়ালিসকে দেখার সঙ্গে সঙ্গে যুবরাজের তন্ত্রীতে-তন্ত্রীতে ঝঙ্কার উঠল। দেখার অবকাশ তাঁর প্রচুর, দেখেছেনও তিনি চোখ ভরে, তবে প্রথম এমন ভাবে মনে সাড়া জাগাতে পারেনি কেউ।

ইংরাজদের স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে আলাপের সূত্রপাত করলেন যুবরাজ। জলহাওয়া ও টাই-এর রঙ নিয়ে আলাপ আরম্ভ করাই হল কেতা দুরস্ত রেওয়াজ। ওয়ালিস নারী, টাই ব্যবহার করেন না সুতরাং—

—শীতকালে এখানকার জল-হাওয়া শোচনীয় হয়ে ওঠে। বিশেষ করে বিদেশীদের কাছে অত্যন্ত বিরক্তিকর বলে মনে হয়। আপনার অসুবিধে হচ্ছে বুঝতে পারি।

বুদ্ধিমতী, রসিকা মার্কিন তরুণী হাসলেন। এই হাসি স্বাভাবিক ভাবেই এডওয়ার্ডের বুকে তুফান তুলল। এক লহমার মধ্যেই তিনি স্মৃত্যিচারণ করলেন, এমন হাসি আর কখনও দেখেন নি। এই প্রথম।

—আবহাওয়া নিয়ে আরম্ভ করা ইংল্যাণ্ডের রেওয়াজ লক্ষ্য করেছি। আপনি তার ব্যতিক্রম হবেন আশা করেছিলাম।

—প্রথমেই আপনাকে খুশি করতে না পারায় আমি মর্মাহত।

আলাপ আর বিশেষ অগ্রসর হল না। আরো অনেকে উপস্থিত ছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা দরকার। সে রাত এডওয়ার্ড বিক্ষিপ্ত মন নিয়েই কাটালেন। ওয়ালিসের আকর্ষণীয় চেহারা, পরিষ্কার কথা বলার ভঙ্গী তিনি কিছুতেই ভুলতে পারলেন না। অসংখ্য নারীর সংস্পর্শে স্বাভাবিকভাবেই এসেছেন, কিন্তু এমন নারীরত্নের সন্ধান তিনি কখনও আগে পান নি।

যৌবনে পদার্পনের পর রাণী মেরী পুত্রের বাকদান পর্ব ত্বরান্বিত করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। ভাবী সম্রাটের বিয়ের ব্যাপারে সম্রাট পঞ্চম জর্জেরও ব্যস্ততা ছিল। ভাল ঘরের মেয়ের অভাব হবে না। কিন্তু বাদ সেধেছিলেন পাত্র স্বয়ং। তিনি বিয়ে করতে অনিচ্ছুক। তবে আজীবন অবিবাহিত থাকবেন এমন কোন প্রতিজ্ঞা নেই। পরে একসময় করবেন।

তাঁর এই অনিচ্ছায় পরের ভাই অসুবিধায় যাতে না পড়েন সেদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। পরের জনের বিয়ে যাতে তাড়াতাড়ি সুসম্পন্ন হয় সে বিষয়ে তিনি সচেষ্ট হলেন। বিয়ে হলে গেল ষষ্ঠ জর্জের। তাঁর বিয়েতে অনিচ্ছার কথা প্রচারিত হবার পর ইংল্যাণ্ডের অনেক লর্ড ও ইউরোপের অনেক রাজা দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলেছিলেন সন্দেহ নেই। ঝোঁকের মাথায় ভাগ্যিস কিছু করে ফেলেননি, নইলে আজ আক্ষেপ হত। প্রথম দর্শনে প্রেম বোধহয় একেই বলে।

কিন্তু ওয়ালিস কি তাঁর ডাকে সাড়া দেবে?

তাছাড়া সে বিবাহিত। স্বামীর সঙ্গে তার গভীর প্রণয় থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। তবুও মনকে প্রবোধ দেওয়া গেল না। এখানে ওয়ালিস সিম্পসন সম্পর্কে গুটিকয়েক কথা বলে নেওয়া যেতে পারে। ১৮৯৬ সালের ১৯শে জুন তারিখে বেসী ওয়ালিস ওয়ারফিল্ডের জন্ম হয়। এই অপূর্ব সুন্দরী তরুণী যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই বহু যুবকের মনে আলোড়ন এনে দিয়েছিলেন। ১৯১৬ সালে লেফটেন্যান্ট স্পেন্সারকে স্বামীত্বে বরণ করে নেন। দু'জনের বিবাহিত জীবন দশ বছরের কিছু বেশি স্থায়ী হয়নি। অবশ্য আইনসিদ্ধভাবে বিচ্ছেদ কার্যকরী হবার পূর্বে দু'জনের ছাড়াছাড়ি হয়ে যায়। এই সময় ওয়ালিস মিষ্টার সিম্পসনের সঙ্গে পরিচিতা হন এবং ১৯২৭ সালের ২১শে জুলাই দু'জনের বিয়ে হয়।

পরিচয় ক্রমে ঘনিষ্ঠ হতে লাগল।

ওয়ালিসের অনুরাগের স্পর্শ পেলেন এডওয়ার্ড। ঘনিষ্ঠ সাহচর্যে দু'জনের সময় অতিবাহিত হতে লাগল। দু'বার বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করেও যে ওয়ালিস সুখী নন তা ক্রমে প্রমাণিত হল। এডওয়ার্ডের মনে যে দ্বন্দ্ব ছিল তা অবসান হল। এইভাবে কেটে গেল বেশ কিছুদিন। কিন্তু এরকম অনিশ্চয়তা নিয়ে আবহমান কাটান যেতে পারে না। পরিচিত মহলে গুঞ্জন আরম্ভ হয়েছে। সকলেই দু'জনের মধ্যেকার সম্পর্কের কথা পরিষ্কার জেনে ফেলেছেন। মিষ্টার সিম্পসনেরও অজানা নেই কিছু। স্ত্রীর মনের ভাব বুঝে তিনিও সরে দাঁড়িয়েছেন। একথাও বুঝেছেন, এখন বুদ্ধিমানের কাজ হবে বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য তৎপর হওয়া।

এর্ডওয়ার্ড স্থির নিশ্চিন্ত হলেন, ওয়ালিসকে আইনসঙ্গতভাবে গ্রহণ করবেন। তাঁকে অভিষিক্ত করবেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভাবী সম্রাজ্ঞীর আসনে। তাঁর এই ইচ্ছার বিরুদ্ধে যে প্রবল আপত্তি দেখা দেবে তা তিনি কল্পনা করতে পারেন নি। প্রথমে বাবাকে কথাটা জানানো বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। তিনি যখন স্যানড্রিংহাম প্রাসাদে গিয়ে পৌঁছালেন তখন সম্রাট পঞ্চম জর্জ অসুস্থ। বলা আর হল না, দীর্ঘ রোগ-ভোগের পর সকলকে কাঁদিয়ে সম্রাট বিদায় নিলেন।

পারলৌকিক পর্ব শেষ হবার পর এডওয়ার্ড ফোর্ট বেলভেডিয়ারে চলে গেলেন। লণ্ডন থেকে বেশকয়েক মাইল দূরে অবস্থিত এই প্রাসাদটি তাঁর ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ছ'মাস এখানে থাকবেন তিনি রাজপরিবারের প্রচলিত শোক পালন করবার জন্য। ওয়ালিসের সঙ্গে নিয়মিত সাক্ষাৎ হয়। ঘনিষ্ঠতার চরমে পৌঁছেছেন দু'জনে।

১৯৩৬ সালের ২২শে জানুয়ারি পার্লামেণ্ট বৃটিশ সাম্রাজ্যেব পরবর্তী সম্রাট হিসেবে এডওয়ার্ডের নাম উল্লেখ করলেন। এই অনুষ্ঠানের সময় এডওয়ার্ডের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন ওয়ালিস। প্রেস ফটোগ্রাফাররা তাঁদের ছবি তুললেও, সেই

ছবি সে সময় ইংল্যাণ্ডের কোন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়নি। সিংহাসন ত্যাগের পর এই ছবিগুলি প্রকাশিত হয়েছিল ঐতিহাসিক ফটো রেকর্ড হিসেবে।

অভিষেকের দিন কবে ধার্য হবে তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগল।

আগষ্ট মাসে সঙ্গী-সাথীদের নিয়ে সমুদ্র ভ্রমণে বেরুলেন এডওয়ার্ড। বলা বাহুল্য ওয়ালিসও তাঁর সঙ্গে রইলেন। এখন আর কারুর অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় না যে, দু'জনের সম্পর্ক নির্মল নেই। আমেরিকার সমস্ত পত্র-পত্রিকায় এই অবৈধ প্রণয় সম্পর্কে নানা সংবাদ নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। মিষ্টার সিম্পসনের সঙ্গে ডাইভোর্সের পর ইংল্যাণ্ডের রাজা যে ওয়ালিসকে বিয়ে করবেন এ সংবাদও নানা ছবির সঙ্গে প্রকাশিত হয়ে চলেছে।

এডওয়ার্ড চিন্তিত হলেন। এই সমস্ত সংবাদ রক্ষণশীল ইংরাজ জাতির মনে ঘা দেবে। তারা তাদের রাজাকে অন্য দৃষ্টিকোণ দিয়ে বিচার করতে আরম্ভ করবে। তারপর আছে পার্লামেণ্ট, আছে রাজপরিবার—এডওয়ার্ড পরিস্কার দেখতে পেলেন তাঁর আগামী দিনগুলি মেঘের ঘনঘটায় সমাচ্ছন্ন।

ওয়ালিস সহজেই পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করলেন।

বললেন নম্র গলায়, আমার চলে যাওয়াই উচিত। আমার জন্যই তুমি সংবাদপত্রের রসাল বিষয়বস্তু হয়ে উঠছো।

নরম গলায় প্রেমিক বললেন, আমাদের বিচ্ছেদের প্রশ্ন আর ওঠে না। ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রে যাতে কিছু লিখতে না পারে সে চেষ্টা আমি করব।

সমুদ্রভ্রমণ আশাতিরিক্তভাবে কাটল না। বিক্ষুব্ধ মন নিয়েই দুই প্রেমিক-প্রেমিকা ফিরে এলেন লণ্ডনে। ২০শে অক্টোবর ওয়ালিসের বিবাহ বিচ্ছেদের শুনানী আছে। সে সম্পর্কেও দু'জনের কম চিন্তা নেই।

বিবাহ-বিচ্ছেদের জন্য প্রমাণ সংগ্রহের ব্যাপারে মিষ্টার সিম্পসনই অগ্রণী হয়েছিলেন। কারণ তিনি রাজা-রাজড়ার কাণ্ডকারখানার মধ্যে থাকতে চাইলেন না। স্ত্রীর কাছে থেকেও এ জীবনে আর প্রেম ঘনিষ্ঠতা আশা করা আর মরীচিকার পিছনে ছুটে বেড়ান একই কথা। আমেরিকার ব্রে-শহরে এক অপরিচিতা কিশোরীকে জোর করে এক হোটেলে নিয়ে যান মিষ্টার সিম্পসন এবং তার সঙ্গে রাত্রি যাপন করেন। এইভাবে স্বেচ্ছায় তিনি নিজের ঘাড়ে কলঙ্কের বোঝা চাপিয়ে স্ত্রীকে মুক্তির পথ নির্দেশ করে দিলেন।

লণ্ডনে পৌঁছাবার পর এডওয়ার্ড ডেকে পাঠালেন, লর্ড বীভারব্রুক ও এডমণ্ড হার্মসওয়ার্থকে। "ডেলি এক্সপ্রেস", "ইভনিং ষ্ট্যাণ্ডার্ড", "ডেলি মেল" এবং "ইভনিং নিউজে'র মত বিখ্যাত সংবাদপত্রের এঁরা মালিক। এঁদের প্রতিপত্তি অসীম। দুজ'নেই ভাবি সম্রাটের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এডওয়ার্ড তাঁদের অনুরোধ জানালেন, তাঁকে

ও ওয়ালিসকে নিয়ে ইংল্যাণ্ডের কাগজ যেন মাতামাতি না করে। তাঁরা কথা দিলেন। বীভারব্রুকের চেষ্টাতেই ফ্লীট স্ট্রীট এডওয়ার্ডের সিংহাসন ত্যাগ না করা পর্যন্ত মুখ খোলেনি।

ইংল্যাণ্ডের সংবাদপত্রে এই প্রেম-কাহিনী প্রকাশিত না হলেও মন্ত্রীপরিষদের কাছে এই সংবাদ অজ্ঞাত ছিল না। গোঁড়া রক্ষণশীল প্রধানমন্ত্রী স্ট্যানলি বলডুইন এডওয়ার্ডের কার্যকলাপে বিশেষ ক্ষুব্ধ হলেন। রাজপরিবারের সম্মান নষ্ট করার অধিকার তিনি কোথা থেকে পেলেন? এডওয়ার্ড প্রচলিত অনেক নিয়মের অসারতা যুক্তি দিয়ে বোঝাবার চেষ্টা করতেন। কখনই মেনে চলতেন না সেগুলি। গির্জার উপরও বিশেষ আস্থা নেই। এই কারণে পার্লামেন্টের অধিকাংশ সদস্য তাঁর উপর খুশি ছিলেন না। এই ব্যাপারে তাঁরা আরো ক্রুদ্ধ হয়ে উঠলেন। এডওয়ার্ডের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ সর্বত্র আলোচিত হতে লাগল।

প্রথম—তিনি একজন সাধারণ আমেরিকান নারীকে বিয়ে করতে চান যা ইংরাজ রাজনীতিজ্ঞরা কখনই বরদাস্ত করতে পারেন না।

দ্বিতীয়—তিনি স্বাধীনভাবে মন্ত্রীদের কাজে মাথা গলান এবং জনসাধারণের সঙ্গে অবাধে মেলামেশা করেন। তাঁর এই সমস্ত ব্যবহার মন্ত্রীরা ভালো চোখে দেখছেন না।

তৃতীয়—তিনি যাঁকে বিয়ে করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, সেই আমেরিকান নারী দু'বার বিবাহিতা এবং তাঁর দুই স্বামীই জীবিত।

বলডুইন এডওয়ার্ডের সাক্ষাৎ প্রার্থনা করলেন। সম্রাট বুঝলেন এইবার প্রকৃত সঙ্কট আরম্ভ হচ্ছে। বলডুইন এলেন। শিষ্টাচার বিনিময়ের পর প্রধানমন্ত্রী বললেন, আগামী বছরের ১২ই মে অভিষেকের দিন ধার্য করা হয়েছে।

সম্রাট সন্তোষ প্রকাশ করলেন।

দু'চার কথার পর বলডুইন বললেন, এবার আপনার ব্যক্তিগত বন্ধু হিসেবে আমি কিছু বলতে তাই।

—স্বচ্ছন্দে বলুন?

মনে হল বলডুইন একটু ইতঃস্তত করে বললেন, দেশের বাইরে নানা দেশের পত্র-পত্রিকায় সম্রাট সম্বন্ধে এমন বহু সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে যাতে, আমি কিছু বিব্রত বোধ করছি। ইংল্যাণ্ড এবং রাজপরিবারের সম্মান এই ব্যাপারের সঙ্গে জড়িত। এডওয়ার্ড জানতেন প্রধানমন্ত্রী শেষ পর্যন্ত এই কথাতেই আসবেন। কিন্তু তিনি কিছু বললেন না। বলার আছেই বা কি?

তিনি আবার বললেন, মিসেস সিম্পসন বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা তুলে নিলেই

এই বিশ্রী জল্পনা-কল্পনার উপর যবনিকা পড়ে যায়। হিজ ম্যাজিস্টি! আমার কথাটা নিশ্চয় বিবেচনা করে দেখবেন।

এডওয়ার্ড দৃঢ় গলায় বললেন, চিন্তা করে দেখবার কিছু নেই। কারুর ব্যক্তিগত ব্যাপারে আমি মাথা গলাতে পারি না। মামলা তুলে নেবেন কি নেবেন না , তা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে মিসেস সিম্পসনের ইচ্ছার উপর।

বলডুইন আর কিছু বলতে পারলেন না। বিদায় নিলেন। এডওয়ার্ড বুঝলেন, পার্লামেণ্টের সঙ্গে তাঁর বিবাদ আরম্ভ হয়ে গেল। তবে একটা কথা তিনি কিছুতেই বুঝতে পারলেন না, তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে পার্লামেণ্ট মাথা ঘামাবে কেন? তিনি কোন বিশেষ ক্ষমতা চাননি। যা'কে ভালবেসেছেন তাকে বিয়ে করতে চেয়েছেন। সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত ব্যাপার।

ভাবনা-চিন্তার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে বিবাহ-বিচ্ছেদের রায় বেরুল একদিন। রায় ওয়ালিসের অনুকূলেই। এডওয়ার্ড তখন বেলভেডিয়ারে। তাঁর প্রিয়তমাও আছেন কাছাকাছি. এই সময় প্রাইভেট সেক্রেটারির কাছ থেকে জরুরী চিঠি পেলেন। সেই চিঠি পড়ে স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁরই কর্মচারী তাঁকে এইভাবে চিঠি লিখতে পারবে, ধারণার অতীত ছিল। মেজর হার্ডিঞ্জ, সম্রাটের চরিত্র নিয়ে সর্বত্র কি রকম নোংরা আলোচনা হচ্ছে তার বিবরণ দিয়েছেন, মন্ত্রীবর্গ, তাঁর কাণ্ড-কারখানায় নিদারুণ ক্রুদ্ধ একথা জানাবার পর লিখেছেন, "এই সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ পাবার একমাত্র পন্থা হল, মিসেস সিম্পসনকে ত্যাগ করা এবং তাঁকে এই দেশ থেকে চলে যেতে বাধ্য করা।"

এডওয়ার্ড আর ভাবতে পারেন না। তাঁর কর্মচারী আজ তাঁকে পন্থা নির্দেশ করছে। ওয়ালিস চিঠিখানা পড়লেন। ভয়ে ভাবনায় তাঁর মন সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। শুধু তাঁরই জন্য এই তুলকালাম কাণ্ড ঘটছে।

এডওয়ার্ড বললেন, প্রধানমন্ত্রীকে আমি পরিষ্কার জানিয়ে দেব, পার্লামেণ্ট যদি আমার মতকে সমর্থন না করেন, তাহলে, আমি সিংহাসনে থাকতে চাই না।

আর্তস্বরে ওয়ালিস বলিলেন, একি বলছো তুমি—।

—বর্তমানে এই কথাই একমাত্র আমি বলতে পারি।

—ওপথ তোমার জন্য নয়। অন্য কিছু চিন্তা করে দেখো।

—আমি আর অনিশ্চয়তার মধ্যে থাকতে চাইনা।

ওয়ালিস সানুনয়ে বললেন, আমি যখন সমস্ত কিছুর মূলে তখন আমাকে সরিয়ে দেওয়াই হল বুদ্ধিমানের কাজ।

—আমাকে আর বিভ্রান্ত করো না, ওয়ালিস।

বলডুইনের সঙ্গে দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হল এডওয়ার্ডের। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে

দিলেন পার্লামেন্টের অনিচ্ছা থাকলেও ওয়ালিসকে তিনি বিয়ে করবেন। এতে যদি তাকে সিংহাসন ত্যাগ করতে হয় তিনি নিরুপায়।

বলডুইন দুঃখ প্রকাশ করে বিদায় নিলেন।

এডওয়ার্ড রাণী মেরীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তিনি ছেলেকে জানিয়ে দিলেন, ওয়ালিসের সঙ্গে কথাবার্তা বলার ইচ্ছা তাঁর নেই। এমন কি দেখাও করতে চান না। এডওয়ার্ডের মনে হতে লাগল এই পৃথিবীতে তাঁর ও ওয়ালিসের নিজের বলতে বোধহয় আর কেউ নেই। ইতিমধ্যে এডমণ্ড হার্মসওয়ার্থ একটি প্রস্তাব দিলেন। প্রস্তাবটি হল, এডওয়ার্ড ওয়ালিসকে মর্গ্যানাটিক পদ্ধতিতে বিয়ে করুন। এতে বিয়ে সিদ্ধ হবে, তবে ওয়ালিস স্ত্রীর আসন লাভ করলেও সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা পাবেন না।

এডওয়ার্ড সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, তোমার কি মত?

ওয়ালিস মৃদু গলায় বললেন, আমার আবার মত কি? তুমি যা স্থির করবে তাই আমার মত।

তৃতীয়বার বলডুইনের সঙ্গে এডওয়ার্ডের সাক্ষাৎ হল। এডওয়ার্ড মর্গ্যানাটিক বিয়ের কথা বললেন।

চিন্তিত গলায় বলডুইন বললেন, হিজ এক্সেলেন্সীর কথার উত্তর এক্ষুণি দেওয়া সম্ভব নয়। মন্ত্রীসভার সঙ্গে পরামর্শ করা দরকার।

—আপনার কি ধারণা এই ব্যাপারে নতুন আইন পাশ করাতে হবে?

—নিশ্চয়। তবে আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এরকম কোন আইনের স্বপক্ষে পার্লামেণ্ট মত প্রকাশ করবে না।

এরপর আর কথাবার্তা অগ্রসর হতে পারে না। বলডুইন বিদায় নেবার পরই পার্লামেন্টের অধিবেশন আহ্বান করলেন। কোন সদস্যের অজ্ঞাত রইল না যে, এই অধিবেশনে স্পেনের ব্যাপার নিয়ে কোন আলোচনা হবে না আলোচনা হবে রাজার পরিণয় সংক্রান্ত বিষয়ে। তর্ক-বিতর্কের ঝড় উঠল। এডওয়ার্ডের স্বপক্ষে বক্তৃতা দেবার চেষ্টা করলে, উইনষ্টন চার্চিলকে চিৎকার করে বাধা দেওয়া হল। এটলীর প্রশ্নের উত্তরে বলডুইন বললেন, অন্যায় জেদের সমর্থনে তাঁর কিছু বলবার থাকতে পারে না।

ওয়ালিসকে সরিয়ে দেওয়া হল লণ্ডন থেকে। তিনি চলে গেলেন ফ্রান্সের টুর শহরে। তিনি ওখান থেকে টেলিফোন করলেন এডওয়ার্ডকে। প্রেমিকের অবিস্মরণীয় স্বার্থত্যাগে তাঁর মনের মধ্যে হুহু করছিল। টেলিফোনে বললেন, তুমি নিজের ভবিষ্যৎ না ভেবেই কাজ করছো। আমাকে যদি তুমি ত্যাগ করতে না চাও, আমি তোমাকে ত্যাগ করে আমেরিকা ফিরে যেতে চাই।

করুণ গলায় এডওয়ার্ড বললেন, তা আর হয় না। সবাই আমায় ছেড়ে গেছে। তুমি আর আমাকে ছেড়ে যেও না।

ওয়ালিস আর কিছু বলতে পারলেন না। তাঁর চোখে জল।

১৯৩৬ সালের ১০ই ডিসেম্বর সমস্ত কিছুর নিষ্পত্তি হয়ে গেল। তিন ভাইয়ের সামনে রাজ্যত্যাগের দলিলে স্বাক্ষর করলেন এডওয়ার্ড। ভাইরা সাক্ষী হিসেবে স্বাক্ষর দিলেন। এই ব্যাপারে সবচেয়ে যাঁর আনন্দিত হবার কথা সেই ডিউক অব ইয়র্কের মন ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। দাদার হাত থেকে তিনি এইভাবে রাজ্যভার নিতে চাননি।

সিংহাসন ত্যাগের পর এডওয়ার্ড পার্লামেণ্টকে লিখে জানালেন, "A message such as no king has ever before sent to Parliament in the Annals of our Long History."

সেই দিনই তিনি জাতির উদ্দেশে বেতারে বক্তৃতা করলেন। সিংহাসন ত্যাগের প্রকৃত কারণ বর্ণনা করবার পর তিনি তাঁর ভাই সম্রাট ষষ্ঠ জর্জের প্রশংসা করলেন।

ওই দিনই সুবিখ্যাত পত্রিকা "টাইমস" ইংরাজদের সম্পর্কে লিখল, "They had a sense of properiety in great places and in great affairs and would not tolerate headlong slips into the abyss of shamefulness."

ইংল্যাণ্ড থেকে বিদায় নেবার পূর্বে উইনষ্টন চার্চিলকে আহারের আমন্ত্রণ জানালেন এডওয়ার্ড । নিজের একখানি ছবি স্বাক্ষর করে দীর্ঘদিনের বন্ধুকে উপহার দিলেন। বিদায় নেবার সময় অত্যন্ত বিচলিত চার্চিল উপহার ভুলেই মোটরে গিয়ে বসলেন। মোটরের সামনে ছুটে গিয়ে ছবিটা তুলে ধরে এডওয়ার্ড বললেন, "Hi! Winston! You have forgotten something!"

এইরকম শোচনীয় পরিস্থিতিতে বন্ধুর সঙ্গে স্বাভাবিক ব্যবহারই করলেন। ইংল্যাণ্ডে সমস্ত কাজ তাঁর শেষ হল। এইচ, এম, এস ফিউরি পোর্টসমাউথ বন্দরে অপেক্ষা করছিল। তাঁকে নিয়ে জাহাজটি ফ্রান্সের দিকে যাত্রা করল। বন্দরে রাজকীয় বিদায় সম্বর্দ্ধনা তো দূরের কথা, সামান্য কোন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও হয়নি। ফিউরি জাহাজ যাঁকে নিয়ে সমুদ্রে ভাসল তিনি বৃটিশ সাম্রাজ্যের অধিকার স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করে এলেন—সেই ব্যক্তি যেন নন তিনি, অতি সাধারণ অজ্ঞাত কুলশীল ব্যক্তি। অভিমান—অনেক অভিমান সেদিন তাঁর মনের কোণে জমা হয়েছিল।

টুরে মিলিত হলেন প্রেমিক-প্রেমিকা।

কিছুদিন পরে বিশ্বের সমস্ত পত্র-পত্রিকায় রয়টার পরিবেশিত একটি সংক্ষিপ্ত সংবাদ পরিবেশিত হল, বেলা এগারটা সাতচল্লিশ মিনিটের সময় "হিজ রয়েল হাইনেস দি ডিউক অব উইণ্ডসরের সঙ্গে শ্রীমতী ওয়ালিস ওয়ারফিল্ডের

পরিণয়কার্য সুসম্পন্ন হয়েছে। মণ্টের মেয়র এই বলে তাঁদের বিবাহ দেন, আইনের নামে আমরা আপনাদের বিবাহিত বলে ঘোষণা করছি। এরপরই নবদম্পতি পাশের সঙ্গীত কক্ষে যান। এই কক্ষটিকে গির্জায় পরিণত করা হয়েছিল। সেখানে তাঁরা রেভারেণ্ড এণ্ডারসন জার্ডিনের উপস্থিতিতে সার্টিনের কুশনের উপর হাঁটু গেড়ে বসেন।'

এই বিশেষ দিনটির তারিখ হল, ৩রা জুন, ১৯৩৭ সাল।

.... সমস্তই পরিষ্কার মনে আছে ডিউক অব উইণ্ডসরের। সমস্তই জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মনে থাকবে। যে নারীটি তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁরই জন্য প্রেমের ইতিহাসে তিনি এমন এক নজীর সৃষ্টি করেছেন আধুনিক পৃথিবীর ইতিহাসে তার দৃষ্টান্ত আর নেই। দীর্ঘনিঃশ্বাস চেপে ডিউক অব উইণ্ডসর সস্ত্রীক প্রেক্ষাগৃহ ত্যাগ করলেন।

কলঙ্কিত নায়ক মোপাসাঁ

প্রশ্ন শুনে মোপাসাঁ হেসেছিলেন।

হাসবারই কথা।

তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল মেয়েদের সম্পর্কে। অর্থাৎ মেয়েদের সম্পর্কে তাঁর প্রকৃত ধারণা কি? যৌনাচারের রাজা প্রখ্যাত কাহিনীকারের কাছে কত বিলোল যৌবনা নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিল তার হিসাব রাখেন নি তিনি। তবে তাদের সম্পর্কে যে একটি সত্য মনের মধ্যে দানা বেঁধে রয়েছে একথা অস্বীকার করবেন কি ভাবে?

সেদিন তাই হাসি থামিয়ে বলেছিলেন, মেয়েদের আমি ভালবাসি না। ওরা আমায় আনন্দ দেয়। নিজেদের প্রয়োজনেই অনিন্দ্য দেহগুলি তুলে ধরে আমার কাছে। আমি তো গ্রহণ না করে থাকতে পারি না।

একথা যেদিন মোপাসাঁ বলেছিলেন, সেদিন প্যারিসের অভিজাত মহলের উপর তাঁর প্রতিশোধ নেবার পালা চলেছে। আগে যা তাঁর কল্পনার মধ্যেও স্থান পায়নি, এখন তিনি সেই অবিশ্বাস্য নিজেকে অবলীলায় ভাসিয়ে নিয়ে চলেছেন।

মাত্র কয়েক বছর আগে এই বিলাসবহুল নগরী তাঁর প্রতি সকরুণ ছিল—তাঁকে উপেক্ষার অন্ধকারে মিশিয়ে দিয়েছিল। খালি পেট আর মনের হাহাকার নিয়ে ঘুরে বেড়িয়েছেন পথে পথে। পেটের চেয়ে দেহের ক্ষুধাই যেন ছিল সেদিন প্রবল।

এখানে ওখানে দাঁড়িয়ে থাকা সস্তা তরুণীদের দিকে সতৃষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকেছেন। তাঁর বোহেমিয়ান রক্ত শিরশিরিয়ে উঠেছে শরীরের আনাচে-কানাচে। সেদিন কেউ তাঁকে কৃপা করা দূরের কথা, ফিরেও তাকায় নি।

আর আজ—

অভিজাত কুলের শ্রেষ্ঠ সমাবেশে অবিরাম আমন্ত্রণ! রাজপুরুষ আর ধনীদের স্ত্রী ও কন্যারা মোপাসাঁকে সঙ্গদান করার জন্য নিয়ত নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত। তিনি অবশ্য বড় একটা কাউকে বিমুখ করেন না।

সুন্দরী সঙ্গিনীদের নিয়ে রাতের পর রাতকে করে তোলেন রঙ্গীন। এতে যেন তাঁর ক্লান্তি নেই—অবসাদ নেই। তাই বিয়ে করার কথা ভাবতে পারেন না। তাঁর রক্তে যে উন্মাদনা আছে তার বেগ কি একজনের পক্ষে সহ্য করা সম্ভব?

এই তীব্র ইন্দ্রিয়পরায়ণ স্বভাব তিনি পেয়েছিলেন তাঁর জনকের কাছ থেকেই। প্যারিসে বারবধূ সমাজের অতি পরিচিত গুস্তাভ দ্য মোপাসাঁ ছিলেন ভারি রঙ্গীন মেজাজের লোক। তিনি যে কোনকালে বিয়ে করবেন একথা কেউ ভাবেনি। বাঁধা ছকের মধ্যে জীবন কাটাবার মানসিকতা তাঁর ছিল না।

কিন্তু হঠাৎ তিনি সকলকে অবাক করে দিয়ে বিয়ে করে বসলেন। লর্ সুন্দরী ও শিক্ষিতা মহিলা ছিলেন। বিয়ের পর পাঁচটা বছর তিনি স্বামীকে সংযত করে রাখতে পেরেছিলেন। শুভাকাঙ্খীরা স্বীকার করলেন লর্ এর বাহাদুরী আছে।

কিন্তু শেষ রক্ষা হল না।

১৯৫০ সালের ৫ই আগস্ট।

বিশ্বসাহিত্যের একটি স্মরণীয় দিন। গী দ্য মোপাসাঁ জন্মগ্রহণ করলেন। পুত্রের জন্মের পরই গুস্তাভের মোহ কেটে গেল স্ত্রীর প্রতি। তিনি আবার ফিরে গেলেন পুরানো উচ্ছৃঙ্খল জীবনে। এই অভিজাত পুরুষটি প্রকাশ্য রাজপথে বেলেল্লাপনার চূড়ান্তে পৌঁছাতেও আর পশ্চাৎপদ হতেন না।

অনিবার্য ফল ফলতে বিলম্ব হল না।

গুস্তাভ অকালেই বিদায় নিলেন পৃথিবী থেকে। স্বামীর মৃত্যুতে লর্ কিছুটা স্বস্তিই পেলেন যেন। এবার গভীর ভাবে মনযোগী হলেন ছেলেকে মানুষ করার ব্যাপারে। কিন্তু তিনি সভয়ে লক্ষ্য করলেন, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাপের প্রতিচ্ছবি হয়ে উঠছে যেন। ভারি দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলেন লর্।

তবে একটা গুণ ছেলের মধ্যে ছিল—সাহিত্যের প্রতি প্রবল আকর্ষণ। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ফ্লোবেঁয়ারের সঙ্গে লর্-এর পরিচয় ছিল। অনেক চিন্তা ভাবনার পর যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ছেলেকে পাঠিয়ে দিলেন ফ্লোবেঁয়ারের কাছে। ঘসে-মেজে যদি ওকে তিনি তৈরি করে দিতে পারেন।

ফ্লোবেঁয়ার মোপাসাঁকে দেখে অখুশি হলেন না। ছেলেটির চমৎকার অঙ্গসৌষ্ঠভ তাঁকে কিছুটা প্রভাবিত করল। মোপাসাঁও প্যারিসে এসে জননীর উচ্চ আশার উপর জল ঢেলে দেননি। যোগ্য গুরুর তত্ত্বাবধানে সাহিত্য সাধনা পূর্ণোদ্দমে চালিয়ে যেতে লাগলেন।

তবে তীব্র যৌন ক্ষুধা তাঁকে অস্থির করে তুলতো। শেষে উপায়হীন অবস্থায় বুলেভারের পথ ধরলেন। সেখানে সস্তাদরের পণ্যানারীরা পসরা সাজিয়ে বসে আছে।

তরুণ মোপাসাঁকে তারা লুফে নিল।

তিনিও অর্থের বিনিময়ে নিজের উগ্রকামনাকে শান্ত করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গেলেন। অবশ্যম্ভাবী ফল ফলতে অবশ্য বিলম্ব হল না। অচিরেই তিনি সিফিলিসে

আক্রান্ত হলেন। এই দুরারোগ্য ব্যাধি যখন তাঁর জীবনের উপর যবনিকা ফেলে দিয়েছিল, তখন তেতাল্লিশটি বসন্ত অতিক্রম করতে পারেননি সর্বকালের প্রখ্যাত কাহিনীকার।

যাই হোক, ক্রমে এমন একদিন এল, যখন স্বাভাবিক কারণেই আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল মোপাসাঁর। নিয়মিত আহার পর্যন্ত সংগ্রহ করা সম্ভব হত না। গুস্তাভ বলতে গেলে কিছুই রেখে যেতে পারেননি ছেলের জন্য। নারী ও সুরাতেই সব শেষ হয়ে গিয়েছিল।

শেষে মোপাসাঁ খালি পেট আর খালি পকেটেই বুলেভার যেতেন। সারা রাতের পর রাত যারা নিজেদের যৌবন তাঁকে নিংড়ে দিয়েছে আজ তারা আমল দেয় না। ঘেঁসতে দেয় না দরজা পর্যন্ত। বিদ্রুপ করে—গালাগালি দেয়। কি করুণ পরিহাস!

এই হল দুনিয়ার নিয়ম।

রূপোর চাবুক নিয়ে যা ইচ্ছে করা যায়, নয়তো সবই থাকে নাগালের বাইরে। শেষে এমন দিন এল যখন ভিখারীদের মত মার খেতে খেতে বিতাড়িত হলেন বারবধূ পল্লী থেকে। তখন মোপাসাঁ বিলাসবহুল অঞ্চলের এখানে-ওখানে দাঁড়িয়ে থাকতেন।

বলা বাহুল্য তাঁর দৃষ্টি থাকতো অভিজাত সুন্দরীদের উপর। বারংবার দীর্ঘনিঃশ্বাস ঠেলে বেরিয়ে আসতো বুক কাঁপিয়ে। তাঁর লোলুপ চোখের দৃষ্টি অনেকের মনে বিরক্তির সঞ্চার করতে লাগল। কটু মন্তব্য শুনতে হতো তাঁকে প্রায়ই।

কোন কথার প্রতিবাদ মোপাসাঁ করতেন না। তবে মনের মধ্যেটা জ্বলতে থাকতো দাউ দাউ করে। প্যারিসের প্রতিটি ইঞ্চি মাটির উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে তিনি শুধু প্রতিজ্ঞা করতেন, যদি দিন আসে তাহলে এর শোধ তিনি তুলবেন। উপর থেকে নিচের মহল—নির্বিচারে সুন্দরীদের অহঙ্কার আর সতীত্বপনাকে তিনি ভেঙ্গে খান খান করে দেবেন।

অবশেষে—

ঈশ্বরের অনুগ্রহই বলতে হবে, সেই রকম দিনকে হাতের মুঠোর মধ্যে শেষ পর্যন্ত মোপাসাঁ পেলেন। এর চাবিকাঠি অবশ্য 'একতাল চর্বি' শীর্ষক গল্পটি। সাহিত্যে নগ্নতাকে প্রতিষ্ঠা দেবার সফল রূপকার এমিল জোলার বাড়িতে তখন তরুণ সাহিত্যিকদের আসর বসতো। মোপাসাঁও যেতেন ওখানে মাঝে মাঝে।

ইতিমধ্যে তাঁর গুটি কয়েক কাহিনী প্রকাশিত হয়েছে। অবশ্য চোখে পড়ার মত কিছু নয়। জোলার বাড়িতে মোপাসাঁ যখন যেতেন, আলোচনায় অংশ নিতেন

না। নীরবে শুনতেন শুধু। ওখানেই একদিন স্থির হল, যুদ্ধের উপর কে কেমন গল্প লিখতে পারে তার একটি প্রতিযোগিতা হবে। সুরচিত গল্পগুলি জোলা প্রকাশের ব্যবস্থা করবেন। মোপাসাঁও এই প্রতিযোগিতায় যোগ দেবেন স্থির করলেন। কিছু চিন্তা-ভাবনার পর গল্প শেষ করলেন—নাম 'একতাল চর্বি'। সাহিত্যের ইতিহাসে যা কখনও হয়নি, তাই ঘটল গল্পটি প্রকাশিত হবার পর। অর্থাৎ একটি মাত্র গল্পই তাঁকে অসম্ভব জনপ্রিয় করে তুলল। বিখ্যাত হয়ে গেলেন মোপাসাঁ।

এবার তাঁর জয়যাত্রার পালা।

প্রকাশক ও পত্রিকার সম্পাদকরা ভিড় করে এগিয়ে আসতে লাগলেন। গল্প সংগ্রহই বিক্রি হল পঁচিশ হাজার কপি। রাতারাতি প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দৃষ্টান্ত একেই বলে। ঐ সঙ্গে অলিখিত সার্টিফিকেট পেলেন উঁচু সমাজে মেলামেশা করার। সেখানে তাঁর প্রতিভার ঔজ্জ্বল্য ও আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব প্রাধান্য পেতে লাগল।

এবার তিনি নামলেন প্রতিজ্ঞা পূরণে।

নারী শিকারের সফল নায়ক মোপাসাঁ কত সুন্দরীর উলঙ্গ পাঠ গ্রহণ করেছিলেন তার হিসাব কেউ রাখেনি। তবে সেই সংখ্যা যে চোখকে ধাঁধিয়ে দেবার মত তাতে কোন সন্দেহ নেই। বিস্ময়ের বিষয় তার স্বভাবের কথা ছিল না। সকলেই জানত তিনি এফুল থেকে ওফুলে ঝাঁপিয়ে পড়ার জন্য সব সময় তৎপর। তবু সেই কালের নারীরত্নরা গোপনে ছুটে যেত তাঁর কাছে নিজেদের উজাড় করে দেবার জন্য।

অবিশ্বাস্য হলেও এদের মধ্যে একজনকে কিছুটা অন্যদৃষ্টি দিয়ে রেখেছিলেন মোপাসাঁ। উদ্দাম কামনা নয়, আবার ঠিক যাকে ভালবাসা বলে তাও নয়—বিচিত্র এক দৃষ্টি। মোপাসাঁর জীবনে নিঃসন্দেহে সে এক অনন্যা নারী।

নাম তার মেরী জোহান।

অনিন্দ্য সুন্দরী এই ধনবতী তরুণী কিছুদিন থেকেই প্যারিসে উঁচু মহলে মক্ষিরাণী হয়ে উঠেছিল। উচ্চবিত্তের বহু তরুণ তাকে কাছে পাবার জন্য যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত। কেন জানা যায় না মেরী প্রশ্রয়ের হাসি হেসেও পিছলে বেরিয়ে যেত। মোপাসাঁও দেখলেন তাকে একদিন।

দেখার সঙ্গে সঙ্গে তীব্র এক উত্তেজনা তাঁকে জাপটে ধরল। জীবনে অনেক কিছু দেখেছেন, তবে স্বীকার করতেই হল এমন দেখেন নি। সকলে যা বলে মিথ্যা নয়। অনেকে যে মেরীকে পাবার জন্য উন্মাদ হয়ে উঠেছে, তাতে দোষ দেওয়া যায় না। এরকম একটি নারীরত্নের জন্য যে কেউ স্বচ্ছন্দে গোটাকয়েক খুন করে ফেলতে পারে।

সেদিন আলাপ হল না।

আলাপ হল আরো কিছুদিন পরে এক অনুষ্ঠানে। মেরী প্রখ্যাত কাহিনীকারকে প্রশংসার দৃষ্টিতে দেখল—শিষ্টাচার সম্মতভাবে কিছু কথার আদান-প্রদান হল। এইটুকু প্রাপ্তিতে খুশি হতে পারলেন না মোপাসাঁ। মনের উদ্বেল অবস্থা নিয়ে গভীর রাত পর্যন্ত জেগে রইলেন নিজের ঘরে।

তবে এটা নিশ্চিত বিস্ময়ের বিষয়, তাঁকে দেখেই অন্যান্য তরুণীদের মত মেরী আত্মহারা হয়ে পড়েনি। সস্তা মনোভাব না থাকাটাই মোপাসাঁর মনে গভীরভাবে রেখাপাত করেছে। কাজেই তাঁকে মনস্থির করতে হল, যে কোন উপায়ে আলাপকে গভীর করে আনতে হবে—ঐ দেবভোগ্যা যৌবনকে তাঁর নিবিড়ভাবে চাই।

সুযোগ এসে গেল।

কাউন্টেস এ্যামানুয়েলার বাড়িতে বর্ণাঢ্য পার্টির ব্যবস্থা হয়েছিল। মোপাসাঁ সেই পার্টিতে উপস্থিত থাকবেন এতে আশ্চর্যের কিছু ছিল না। কারণ এখন আর এ্যামানুয়েলা শুধু তাঁর গল্পের পাঠিকা নয়, দৈহিক সম্পর্কও দু'জনের মধ্যে স্থাপিত হয়েছে।

মোপাসাঁ তখন জানেন না মেরীও আমন্ত্রিতা এখানে। প্যারিসের অভিজাত ব্যক্তিরা ছাড়াও, আলফাঁস দোঁদে, অস্কার ওয়াইল্ডের মত প্রতিভাধরেরা পার্টিতে উপস্থিত ছিলেন। মোপাসাঁ তাঁদেরই দূর থেকে দেখছিলেন।

আর তাঁর গতিবিধির উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছিলেন এ্যামানুয়েলা। কাউন্টেস জানেন, তাঁর এই নাগরটি মোটেই সুবিধার নন। যে কোন মুহূর্তে যে কোন তরুণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়ে পড়তে পারেন তিনি। কাজেই একটু সতর্ক থাকা ভাল। এই সতর্কতা যেন মূল্যহীন অচিরেই তা প্রমাণিত হল।

নাচ তখন আরম্ভ হয়ে গেছে।

দলে দলে পুরুষ নিজের সঙ্গিনীদের আঁকড়ে ধরে বাজনার তালে তালে পা ফেলে চলেছেন। কাউন্টেস এগিয়ে গেলেন মোপাসাঁর দিকে। তাঁকে সঙ্গী করে তিনি নাচের আসরে নামবেন। কিন্তু কাছাকাছি পৌঁছাবার আগেই মেরী তাঁর মুখোমুখি হয়েছে. চমকে উঠেছিলেন মোপাসাঁ। তারপরই তাঁর রক্তে প্রবল চাঞ্চল্য দেখা দিল। তাঁর স্বপ্নের রাণীকে এখানে তিনি আশা করেননি।

তিনি একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলেন তাঁর মুখের দিকে।

—কি এত দেখছেন?

মেরীর মধুঝরা কণ্ঠস্বরে চমক ভাঙ্গল মোপাসাঁর।

—আপনাকে দেখছিলাম

—কেন?

—যা কিছু সুন্দর তার দিকেই তাকিয়ে থাকতে ইচ্ছে করে।

মেরী সলজ্জ হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুলল।

মোপাসাঁ আবার বললেন, আপত্তি না থাকলে চলুন, আমরাও বাজনার তালে তালে পা মেলাই।

মেরী কোন কথা না বলে, গাউনের একধারটা তুলে ধরে নাচের চত্বরে গিয়ে দাঁড়াল। মোপাসাঁ তাঁর কোমর জড়িয়ে ধরলেন। নাচের তালের সঙ্গে সমতা রেখে মেরী চাপা গলায় বলে চলল, ভূমধ্যসাগরের তীরে বেড়ান নিজের অভিজ্ঞতার কথা।

মোসাপাঁ তন্ময় হয়ে শুনছেন। তিনি কি ভাবতে পেরেছিলেন, এই পার্টিতে তাঁর আশা দানা বাঁধতে আরম্ভ করবে। কাউন্টেস নিজের নাগরের ব্যাপার-স্যাপার দেখে আহত হয়েছেন। আসরের অনেকেই তখন মুখ টিপেটিপে হাসছেন। তাঁরা বোধহয় ভাবছেন, আরেক পতঙ্গ পুড়ে এবার ছাই হল।

এক সময় নাচের চত্বর থেকে এসে নির্জন এক জায়গায় মুখোমুখি এসে বসলেন দু'জনে। অনেক কথা হল। অর্থহীন সামঞ্জস্যহীন সমস্ত কথা। রাত কিছুটা গভীর হবার পর, এ্যামানুয়েলার ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিকে আমল না দিয়েই পার্টি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। মেরীর সঙ্গে ঘন ঘন এবার দেখা হবে, এই আনন্দেই তিনি বিভোর।

মনোবাঞ্ছা কিন্তু পূর্ণ হল না।

কয়েকদিন অপেক্ষা করে থাকার পরও মেরী যখন দেখা করতে এল না, তখন তিনি অনুসন্ধান করে দেখলেন, সে রাশিয়া চলে গেছে! ভ্রমণের নেশা তাকে বারবার এইভাবে ঘর ছাড়া করে। মোপাসাঁ অত্যন্ত নিরাশ হলেন। এখানে-ওখানে ঘুরে বেড়িয়ে এইভাবে নিজের ভরা যৌবনকে নষ্ট করার প্রয়াসকে তিনি সমর্থন করতে পারলেন না।

মোপাসাঁ নর্মাণ্ডিতে এসেছেন।

প্যারিসে কিছুদিন থেকেই বড় একঘেয়ে মনে হচ্ছিল। অবিশ্বাস্য মনে হলেও গড়ে প্রতিদিন তিনি আমন্ত্রণ পাচ্ছিলেন কুড়িটির বেশি। মন বসিয়ে লিখবেন, সে অবসরটুকুও পাচ্ছিলেন না। তাই বাধ্য হয়ে চলে এসেছেন নর্মাণ্ডিতে। বাসা বেঁধেছেন গ্রামাঞ্চলে। সমুদ্রের কোল ঘেঁসেই গ্রাম। দ্রুত হাতে বেশ কিছু লেখা শেষ করবেন এই তাঁর বাসনা।

প্রাকৃতিক অবস্থা সেদিন ভাল ছিল না।

ঝড় যে শুধু সমুদ্রকেই উত্তাল করে চলেছে তাই নয়—গ্রামের প্রতিটি বাড়িকে

ক্ষণে ক্ষণে প্রচণ্ডভাবে নাড়া দিয়ে যাচ্ছে। লেখায় মন বসাতে না পেরে কিছু পড়বার চেষ্টা করছিলেন মোপাসাঁ।

হঠাৎ দরজায় করাঘাত হল।

এই দুর্যোগ মাথায় করে আবার কে এল! নাকি, ঝড়ের দরুণ দরজায় এমন শব্দ হল। আবার করাঘাত। সন্দেহের আর অবকাশ নেই, নিশ্চিতভাবে কেউ এসেছে। মোপাসাঁ উঠে গিয়ে দরজা খুলে দিলেন। তারপরই আগন্তুককে দেখে হতবাক হয়ে গেলেন তিনি।

মেরী দাঁড়িয়ে রয়েছে!

প্যারিস থেকে এত দূরে! এই শোচনীয় দিনে তার এখানে উপস্থিতি স্বপ্নকেও হার মানিয়ে দেয়। অনেক অপেক্ষার পর মেরীকে যখন মন থেকে মুছে ফেলার জন্য বদ্ধপরিকর হয়েছিলেন তখনই নাটকীয়ভাবে তার আগমন।

মেরী ঘরে প্রবেশ করল।

ভিজে গেছে। বসে পড়ল একটা চেয়ারে।

ক্লান্ত কলায় বলল, নর্মাণ্ডিতে এসেছিলাম। শুনলাম তুমি এই গ্রামে রয়েছো। তাই ভাবলাম—

—আমি ভেবেছিলাম, তুমি আমাকে ভুলে গেছো।

—এখন কি মনে হচ্ছে?

—ব্যস্ত হচ্ছ কেন? সে কথাও বলব।

—আমি কিন্তু বেশীক্ষণ থাকতে পাচ্ছি না। এসেছি শুধু তোমাকে একবার দেখব বলে।

—তা হয় না মেরী। তোমাকে অনেক কথা বলার আছে। এখনই তোমার যাওয়া চলবে না।

মেরী নরম গলায় বলল, আমি নিরুপায়, কয়েকজন বন্ধু আমার অপেক্ষায় রয়েছেন। তাঁদের বসিয়ে রেখে, এই ঝড়-জলের মধ্যে ছুটে এসেছি তোমাকে একবার দেখবো বলে—তোমার সঙ্গে দুটো কথা বলবো বলে—

একটু চুপ করে থেকে মোপাসাঁ বললেন, কিন্তু ... তুমি কি একেবারেই বুঝতে পাচ্ছ না, আমি তোমাকে ভালবেসে ফেলেছি? কামনা-বাসনার অনেক ঊর্ধ্বে আমার এই ভালবাসা।

হাসবার চেষ্টা করে মেরী বলল, তোমার মুখে একথা নতুন নয়। অনেক মেয়েকেই তুমি এই একই কথা বলেছো।

—আমায় বিশ্বাস করো, মেরী—

—তুমি এগিয়ে এস না। আমি ভীষণ ভয় পাচ্ছি।

মোপাসাঁ মর্মাহত হলেন।

তিনি ভাবতেই পারেননি ওর খামখেয়ালীপনা এই রূপ নিয়ে প্রকাশ পাবে। স্বাভাবিক কারণেই কথাবার্তায় উত্তাপ কমে গেল। সিফিলিসের যন্ত্রণাটা হঠাৎ অনুভব করতে লাগলেন মোপাসাঁ। অবশ্য মুখে কিছু প্রকাশ করলেন না। অল্পক্ষণের মধ্যে মেরী বিদায় নিল।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মোপাসাঁ অনুভব করলেন, প্রেম নামক বিকারকে মনে প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হয়নি। একের পর এক নারীর যৌবনকে নিয়ে খেলা চালিয়ে যাচ্ছেন, সেটাই ঠিক। প্রেম আবার কি?

মন কিন্তু মানতে চায় না। মেরীকে এবার হিসাব থেকে সরিয়ে দেবেন, কাছে এসেও আবার দূরে চলে যাবার এই প্রবৃত্তি তাঁর ভাল লাগে না। তবু মনে হয় পরম লগ্ন আসবে। আসতেই হবে।

এক বছরের মত অতিক্রান্ত হয়েছে।

ইতিমধ্যে অনেক নারীঘটিত কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে পড়েছেন মোপাসাঁ। কিছু চাপা থেকেছে, আবার কিছু লোকের মুখে মুখে ফিরেছে। সেদিকে অবশ্য ভ্রূক্ষেপ নেই। মানুষটির ঈর্ষাকাতরতা কেচ্ছা নিয়ে মাতামাতি করে।

সেদিন রাত দশটায় বাড়ি ফিরলেন।

আজ তাড়াতাড়িই ফিরেছেন বলা যায়। শয়নকক্ষে প্রবেশ করতেই কিন্তু প্রচণ্ড বিস্ময়ের মুখোমুখি হলেন মোপাসাঁ। তাঁরই বিছানায়, প্রায় বিবস্ত্র অবস্থায় ঘুমের কোলে ঢলে রয়েছে মেরী। তার অধিকাংশ পোশাক ছড়িয়ে রয়েছে এধার-ওধার।

এরকম অঘটনও ঘটে? যার সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হবার সম্ভাবনাই ছিল না, সেই মেরী তাঁরই বিছানায়। অসম্ভব উত্তেজিত মোপাসাঁ দু'চোখ ভরে অনিন্দ্য সুন্দরী নারীটিকে দেখতে লাগলেন। তারপর শরীর ঝুঁকিয়ে নিজের দুই বাহুর মধ্যে তাকে গ্রহণ করলেন।

মেরীর দুই বোজা চোখ খুলে গেল ধীরে ধীরে। তার দৃষ্টিতে সেই উন্মাদনা নেই। নেই সে বেপরোয়া ভাব। কেমন ক্লান্তি ছেয়ে রয়েছে যেন। ব্যাপারটা কি? ওকি অসুস্থ?

কাঁপা গলায় মেরী বলল, তুমি কোথায় ছিলে?

—আমি তো..

—আমি যে অনেকক্ষণ থেকে অপেক্ষা করছি।

—তুমি কি অসুস্থ?

—আজ একটু বেশি খেয়ে ফেলেছি।

মেরীর গলা জড়িয়ে আসছে।

—কি বেশি খেয়েছো?

—কোকেন—

কোকেন!!

মোপাসাঁ স্তম্ভিত হয়ে যান। মেরী কোকেনের নেশা করে। সমস্ত কিছু খতিয়ে ভাবার সময় তখন নেই। তাঁর দুই বাহু বেষ্টনের মধ্যেই মেরী অজ্ঞান হয়ে গেছে। তাকে সুস্থ করে তোলাই এখন প্রধান কর্তব্য।

কোকেনসেবী এই বিলাসিনীকে সুস্থ করে তুলতে প্রখ্যাত মানুষটির সময় লাগল অনেক। এক্ষেত্রে চিকিৎসক ডাকাও সম্ভব ছিল না। এই ভাবেই রাত ভোর হয়ে গেল। মেরীকে পৌঁছে দিয়ে এলেন তার আবাসে। মোপাসাঁ বুঝলেন পরম লগ্নের সময় এখনও হয়নি।

শেষ পর্যন্ত সেই লগ্ন এল।

এল মাত্র কয়েক দিন পরই।

সেদিন মোপাসাঁর একটি নাটকের উদ্বোধন রজনী। প্রেক্ষাগৃহ কানায় কানায় পূর্ণ। প্রথম সারিতে বসেছেন মোপাসাঁ। নাটকটি দর্শকদের মনে রেখাপাত করবে কিনা এই চিন্তাতেই তিনি কিছুটা বিমনা। নাটক আরম্ভ হয়ে গেছে। তখনও পর্যন্ত অবশ্য দর্শকদের মধ্যে থেকে কোন বিরূপ মন্তব্য শোনা যায় নি।

নাটক বেশ ভালভাবেই এগুচ্ছে। অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা নিজেদের নাটকের চরিত্রের সঙ্গে চমৎকার ভাবে মানিয়ে নিয়েছে। ক্রমেই মোপাসাঁ স্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। অভিনয় দেখার ব্যাপারে এবার একাগ্র হলেন কিছুটা। এই সময় কে একজন তাঁর পাশে এসে দাঁড়ালো।

মুখ তুললেন মোপাসাঁ।

মেরী!!

মেরী নাটক দেখতে এসেছে তিনি জানতেন না।

চাপা গলায় মেরী বলল, তোমার বাড়ি গিয়ে অপেক্ষা করছি।

সেই সুরেই উত্তর দিলেন তিনি, কিছুক্ষণ পরে আসছি।

অভিনয় শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে মোপাসাঁ ছুটলেন বাড়ির দিকে। মেরী ডাইনিং টেবিলের সামনে বসে আছে। কেমন শান্ত, সমাহিত ভাব। ডিনার শেষ হল দু'জনের। এরপরই মেরী ভারি সাবলীল হয়ে উঠল, কিছুটা উচ্ছ্বসিতও। ওকে মোপাসাঁ শোবার ঘরে নিয়ে এলেন।

কিভাবে কথা আরম্ভ করবেন?

শেষে—

—না, না—

—আজ কি তুমি....

—আজকের রাতটা তোমারই।

—তোমাকে যে কোন দিন আমি সম্পূর্ণ নিজের করে পাব ভাবতে পারিনি। ক্রমশই আমার কাছ থেকে সরে যাচ্ছিলে।

—না, না আমি তোমার—। আমি ভীষণ ক্লান্ত। আমাকে তুমি মাতাল করে তোল গী।

মেরী মোপাসাঁর কাঁধে মাথা রাখল।

তিনি আরেকবার অনুভব করলেন, তাঁর আকর্ষণীয় ক্ষমতা কত দুর্বার। পালিয়ে বেড়ানো মেয়ে শেষ পর্যন্ত বলেছে, আমি তোমার—। মেরীকে নিয়ে বিছানায় গিয়ে বসলেন। শ্যাম্পেন দু'জনের মনকে আরো স্নিগ্ধ করে তুলল।

তারপর—যৌনকলার সুনিপুণ শিল্পী গী দ্য মোপাসাঁ নিজের সহচরীকে দীর্ঘরাত মাতাল করে রাখলেন। শুধু সেদিন নয়, আরো কত রাত মাতালের মত মেরী এই বিছানায় গা ঢেলে দিয়েছে পরিপূর্ণ তৃপ্তির আশায়।

১৮৯৩ সালের ৬ই জুলাই এই কলঙ্কিত নায়ক পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন।

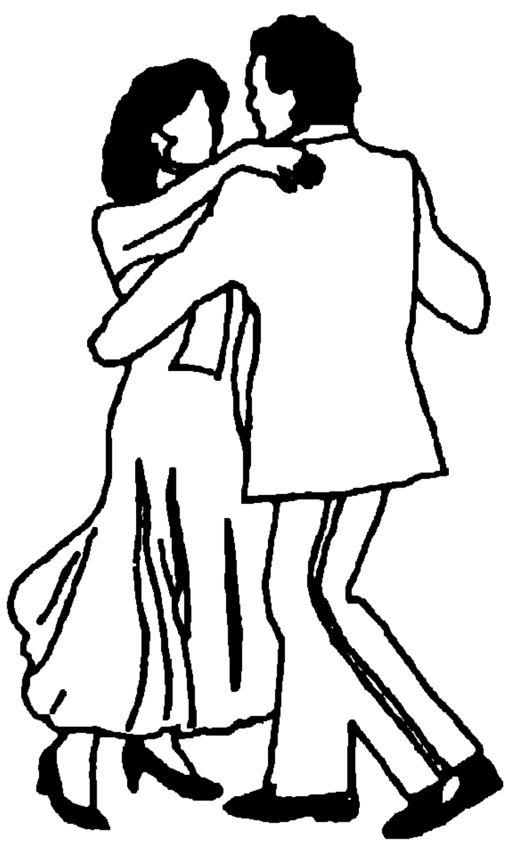

ক্যাসানোভা ইতিহাসের কলঙ্ক

নানা দেশের ইতিহাস ঘেঁটে এমন কারুর সঙ্গে তুলনা চলে না যার, সেই অতি কুখ্যাত এবং কোন কোন ক্ষেত্রে বিখ্যাত মানুষটি হলেন ক্যাসানোভা। কেউ কেউ তাঁকে প্রেমিক হিসাবে চিহ্নিত করতে চাইলেও, প্রকৃতপক্ষে প্রেমের নামাবলী গায়ে দিয়ে নারীর সতীত্ব নষ্ট করার মধ্যেই ছিল তাঁর আনন্দ। এমনই ভাগ্যের অধিকারী ছিলেন যে, অসংখ্য ক্ষেত্রে এই স্বভাবের পরিপূর্ণ রূপ দেওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়েছিল।

১৭২৫ খৃষ্টাব্দের এক বিষণ্ণ দিন।

পৃথিবীর প্রথম আলো ক্যাসানোভা দেখলেন এক ধনী পরিবারের গৃহে। জনব জননীর ভালবাসা তিনি পাননি। সন্তানের দিকে দৃষ্টি দেবার মত অবসর তাঁদের ছিল না। বাবা কাজ পাগল মানুষ। অবশ্য এই ব্যস্ততার লক্ষ্য যে কোন উপায়ে আরো অর্থ আহরণ।

মা'র সময় কাটে অন্যভাবে।

পুরুষ বন্ধুদের মনোরঞ্জন করতেই তিনি সবসময় অতিমাত্রায় ব্যস্ত। তাদের মধ্যে কারুর কারুর সঙ্গে তাঁর অবৈধ সম্পর্ক বর্তমান। জননীর বেলেল্লাপনা মাঝে-মধ্যে চোখে পড়ে গেছে বালক ক্যাসানোভার। কাজেই সেই বয়সেই তিনি অনেক কিছু শিখে ফেলেছিলেন—সাদা কথায় বলা চলে, তাঁর পরকাল ঝরঝরে হয়ে গিয়েছিল।

চাকর-বাকরের হাতে মানুষ হতে থাকেন। অনিবার্য ফলস্বরূপ হয়ে ওঠেন অসম্ভব রাগী—বেয়াড়া। আবার এক বিশ্রী রোগের শিকার হয়ে পড়েন। মাঝে মাঝে নাক দিয়ে রক্ত গড়িয়ে পড়তে থাকে।

ছেলের এই রোগের কথা শেষ পর্যন্ত জানতে পারলেন জনক জননী। তাঁরা রোগ নিরাময়ের জন্য কিন্তু চিকিৎসক ডাকলেন না, ডাকলেন এক ডাইনীকে। এই ডাইনী। বেশ নাম ডাক ছিল অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপ কুসংস্কারে আচ্ছন্ন ছিল।

বিচিত্র চেহারার ডাইনী সঙ্গে বিশাল এক বাক্স নিয়ে এসেছিল। মনতন্ত্র পড়ে রুগীকে তার মধ্যে ঠেসে-ঠুসে ভরে ডালা বন্ধ করে দিল। ভাগ্যক্রমে ডালার

মধ্যে গুটিকয়েক ফুটো ছিল, নইলে ক্যাসানোভা সেইদিনই মারা যেতেন। গেলে কিন্তু ভালই হতো। তাহলে অজস্র নিষ্পাপ কুমারী ছলনায় ভুলে নিজেদের নষ্ট করে দিত না।

বহুক্ষণ বাক্সর মধ্যে বন্ধ রাখার পর ক্যাসানোভাকে বার করা হল। ডাইনী এবার নানা অঙ্গভঙ্গী করে মন্ত্রের ঝড় বইয়ে দিল। স্বাভাবিকভাবেই ধরে নেওয়া হল রোগ আর রুগীর ত্রিসীমানায় নেই। ছেলেকে অবশ্য আর বাড়িতে রাখা হল না। শিক্ষার মান ও ধর্মভাব জাগানোর জন্য পাঠান হল এক ধর্মযাজকের আশ্রয়ে। সেখানেই বেটিনার সাক্ষাৎ পেলেন। বেটিনা ধর্মযাজকের মেয়ে।

যদিও যৌবনে পৌঁছাতে তখন তাঁর অনেক বিলম্ব ছিল, তবু নারী সম্পর্কে দুর্বলতার অধিকারী হয়ে পড়েছিলেন একটু আগে-ভাগেই। বেটিনা সহজেই তাঁকে প্রভাবিত করল। অথচ ওই তরুণী বয়ঃকনিষ্ঠ ক্যাসানোভার মনের কথা কিছুই জানতো না। সহজভাবে মেলামেশা করত। যাজক মহাশয়ের নির্দেশমতো পরিচর্যা করত।

ক্যাসানোভা পাগল হয়ে উঠলেন। কিন্তু মনের কথা প্রকাশ করতে সাহস পান না। তখন বেটিনার উলঙ্গ অবস্থায় দেহ-সৌন্দর্য নিরীক্ষণ করবার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠলেন। তার শয়নকক্ষের দরজায় ছোট একটা ফুটো ছিল। সেই ফুটোয় চোখ লাগিয়ে তিনি আকুল-আগ্রহে অপেক্ষা করতেন।

বেটিনার একজন প্রেমিক ছিল। সে প্রায়ই আসত। দু'জনের অন্তরঙ্গ কার্যকলাপ ফুটোর মধ্যে দিয়েই দেখতে পেতেন ক্যাসানোভা। সেই প্রেমিক কিন্তু একদিন তাঁকে দরজায় চোখ লাগান অবস্থায় ধরে ফেলেন। প্রচণ্ড মারধোর করল তারপর। বেটিনা কিন্তু এই ব্যাপারকে ভাল চোখে দেখল না। কথা কাটাকাটি হয়ে গেল প্রেমিকের সঙ্গে।

ক্যাসানোভা মার খেয়ে কাতরাচ্ছিলেন। বেটিনা তাঁর গায়ে হাত বুলিয়ে দিয়ে, মিষ্টিকথা বলে তাঁকে সহজ করে তোলবার চেষ্টা করতে লাগল। শেষে প্রশ্ন করল, দরজার ফুটো দিয়ে কি দেখছিলে?

—আজ নয়, আমি প্রায়ই দেখি।

ক্যাসানোভা সাহস সঞ্চয় করে বললেন, তোমাকে দেখি। মুখে তো কিছু বলতে পারি না। তাই ওইভাবে দেখে মনকে শান্ত করি।

এই কথা শুনে বেটিনা অবাক হয়ে যায়। তারপর কৌতুক অনুভব করলেও ক্রমে ক্যাসানোভার অতি সুন্দর মুখ তার মনে ছায়া ফেলতে আরম্ভ করল। বয়সে ছোট বলে এতদিন যাকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনেনি, এখন সে গুরুত্বলাভ করতে আরম্ভ করল। সেই মারধোর ঘটার পর প্রেমিকেরও সন্ধান পাওয়া যাচ্ছিল না।

সেই সুবিধাবাদী অন্য কাউকে নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েছে বোধহয়। কাজেই অসম প্রেমের সূত্রপাত অচিরেই ঘটল।

ক্যাসানোভার জীবনে প্রথম ঘনিষ্ঠভাবে নারী সঙ্গলাভ। এই আরম্ভ, তারপর তাঁর দীর্ঘজীবনে কত অসংখ্য কাণ্ডের যে তিনি নায়ক তার হিসাব দেওয়া সম্ভব নয়। বার খণ্ডে নিজের আত্মজীবনী লিখেছেন শেষ জীবনে। অন্যমনস্কতার ভান করে নিজের জীবনের অশ্লীল কাহিনীগুলি তুলে ধরেছেন পরিচ্ছদে-পরিচ্ছদে। তবুও নিজের সমস্ত ন্যাক্কারজনক কার্যকলাপের ইতিকথা কি লিখে যেতে পেরেছেন? মনে হয় না।

বেটিনার সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে কিছুদিন কাটল। বেটিনা ভেবেছিল, এই ধনী পুত্রটিকে সারা জীবন নিজের সঙ্গে যুক্ত করতে পারবে। তার আশা অবশ্য ফলবতী হয়নি। হবারও নয়। বোহেমিয়ান ক্যাসানোভা একজনকে নিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারেন না। একদিন সেখান থেকে সরে পড়লেন।

পারিবারিক সূত্রে তিনি দু'টি জিনিস পেয়েছিলেন। প্রচুর অর্থ এবং জননীর উদ্দাম স্বভাব। ষোল বছর বয়সেই তাঁকে দেখতে পূর্ণ যুবকের মত। এছাড়া অতি সুন্দর মুখের অধিকারী তো ছিলেনই। মেয়েমহলে তাঁর খ্যাতি দ্রুত বিস্তার লাভ করেছিল। এই সময় তিনি আবার স্থির করে ফেললেন চার্চের আওতায় থাকবেন। অর্থাৎ মানুষকে ধর্মকথা শোনাবেন।

এ এক বিচিত্র ব্যাপার। মনে হয়, বাড়ি থেকে চাপ আসার দরুণই অনিচ্ছার সঙ্গে পুরোহিতের বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। চার্চের প্রার্থনা সভায় যোগ দিতে অনেক মেয়ে আসে। তাদের মধ্যে কাউকে কাউকে দেখে হৃদয় উদ্বেল হয়ে ওঠে। বিশেষ করে এ্যাঞ্জেলাকে যেদিন দেখলেন, নিজেকে স্থির রাখা অসম্ভব হয়ে উঠল।

নিটোল স্বাস্থ্য আর অনিন্দ্য সুন্দর মুখের অধিকারিণী এ্যাঞ্জেলা সত্যি মনে দাগ কেটে যাবার মত মেয়ে। ক্যাসানোভা আর থাকতে না পেরে একদিন সরাসরি নিজের মনের কথা বললেন। হোক তরুণ, তবু একজন পুরোহিতের কাছ থেকে এ্যাঞ্জেলা এই ধরনের ব্যবহার আশা করেনি। সে রূঢ়ভাবেই তাঁকে প্রত্যাখ্যান করল।

ক্যাসানোভা মর্মাহত হলেন। চিন্তা করে দেখলেন, তাঁর স্বভাবের সঙ্গে তাঁর বৃত্তি খাপ খায় না। পুরোহিতদের মেয়েরা এড়িয়ে চলতে চাইবেই। কালবিলম্ব না করে তিনি চার্চ থেকে বেরিয়ে এলেন। এ্যাঞ্জেলার সন্ধানে ঘুরতে লাগলেন। তাকে পাওয়া না গেলেও, যোগাযোগ হল তার ছোট বোন লুক্রেশিয়ার সঙ্গে। লুক্রেশিয়া ক্যাসানোভাকে দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। ধরা দিতে বিলম্ব করল না।

দু'জনে যত্র-তত্র ঘুরে বেড়ান। ক্যাসানোভার মন কানায় কানায় পূর্ণ। এইরকম

সময় এক ঘটনা ঘটল। সেদিন এক ঢাকা-গাড়ির মধ্যে লুক্রেশিয়াকে নিয়ে তিনি চলেছেন। মৃদু ছন্দে নির্জন রাস্তা দিয়ে এগিয়ে চলেছে গাড়ি। কোচম্যানের পাশে বসে ছিল তার সহকারী। হঠাৎ সহকারীর কি মনে হওয়ায় কোচম্যানকে গাড়ি থামাতে বলল। তারপর মাটিতে নেমে দরজা খুলে ফেলতেই যে দৃশ্য চোখে পড়ল, তার চেয়ে লজ্জাকর বুঝি আর কিছু হয় না।

ক্যাসানোভা আর লক্রেশিয়া উলঙ্গ অবস্থায় ঘনিষ্ঠ। তাড়াতাড়ি দু'জনে সরে গেলেন। লুক্রেশিয়া লজ্জায় লাল হয়ে গায়ে কাপড় টেনে নিয়ে একপাশে জড়সড় হয়ে বসল। ক্যাসানোভার কিন্তু লজ্জিত হবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। তিনি বরং ক্রুদ্ধ হলেন।

—কি চাই তোমার?

সহকারী বেচারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়েছিল। প্রভুর কণ্ঠস্বরে এমন ঘাবড়ে গেল যে তার মুখ থেকে কথা বেরুল না।

—তোমার কাজ গাড়ি থামিয়ে ভিতরে কি হচ্ছে দেখা নয়। যাও, কোচম্যানের পাশে বসো গিয়ে!

গাড়ি আবার চলতে আরম্ভ করল। দুই নরনারী আবার ঘনিষ্ট হলেন। এই ক্যাসানোভার বৈশিষ্ট্য! লজ্জা সঙ্কোচ ইত্যাদিকে তিনি কোনদিন প্রশ্রয় দেননি। নারীকে জয় করতে এবং জয় করা নারীকে পরিপূর্ণভাবে ভোগ করার জন্য যা-কিছু করার প্রয়োজন—তা যত লজ্জাজনকই হোক না কেন, তা করতে তিনি সদা প্রস্তুত ছিলেন।

লুক্রেশিয়াকে কিন্তু বেশিদিন সহ্য হল না। কুড়ি বছর বয়স তখনও অতিক্রম করেন নি। এর মধ্যে তিনি হয়ে উঠলেন একজন প্রথম শ্রেণীর লম্ফট। সুশ্রী মুখ, সুগঠিত দেহ ও চমৎকার বাচনভঙ্গী তরুণীদের টেনে আনতো তাঁর কাছে। আর তিনি অক্লান্তভাবে তাদের শিকার করে যেতেন।

ক্রমে ইতালি তাঁর কাছে পানসে মনে হতে লাগল। ইউরোপ পরিক্রমায় বেরুলেন। অর্থাৎ নানা দেশের নানা বয়সী যুবতীদের সঙ্গে অবাধ মেলামেশা করার সুযোগ নেবেন। এতে যে অজস্র অর্থব্যয় হবে, সেদিকে দৃষ্টি দেবার কোন প্রয়োজনীয়তা ক্যাসানোভা অনুভব করলেন না। সঞ্চিত অর্থ যে ইতিমধ্যেই আশঙ্কাজনকভাবে কমে এসেছে সে সম্পর্কেও তাঁর কোন চিন্তা-ভাবনা নেই।

ক্যাসানোভার নাম তখন দিকে দিকে প্রচারিত। ইউরোপের নানা দেশের অভিজাত তরুণীরা তাঁর নাম শুনলে রোমাঞ্চ এবং পুলক দুই অনুভব করতেন। অনন্য ভাগ্যের অধিকারী হয়েই এই দুনিয়ায় ক্যাসানোভা এসেছিলেন। বিস্ময়ের বিষয় হলেও, এই সমস্ত সুন্দরী ললনারা তাঁর লাম্পট্য, তাঁর ব্যভিচারের কথা

জেনেও এর কোন গুরুত্ব দিতেন না। বরং দুর্নিবার আকর্ষণে বারবার ছুটে যেতেন নিজেদের আহুতি দিতে।

প্যারিসে পরিচয় হল মারিয়ার সঙ্গে। উঁচু ঘরের দুলালী ক্যাসানোভাকে দেখামাত্র মুগ্ধ। যথা নিয়মে অল্প সময়ের মধ্যে ক্যাসানোভা তাকে করায়ত্ব করে ফেলেন। তবু মারিয়া শয্যাসঙ্গিনী হতে দ্বিধা করছিল। কারণ গর্ভবতী হবার আশঙ্কা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পাচ্ছিল না।

ক্যাসানোভা অবশ্য শেষ-পর্যন্ত তাকে রাজি করালেন। এবং অভয় দিলেন, তেমন অবস্থা দেখা দিলে সে দায়িত্ব তাঁর। মারিয়া পুলকিত হল। তাকে যে বিয়ে করবেন ক্যাসানোভা সেই ইঙ্গিত করে রাখলেন। বেচারি জানে না এই নারী-উন্মাদ পুরুষটি কখনই কারুর কাছে বাঁধা পড়বে না।

অনিবার্য ফলস্বরূপ যথাসময় মারিয়া গর্ভবতী হল। ক্যাসানোভার কাছে বিয়ের কথা তুলতেই তিনি মহাবিস্ময় প্রকাশ করলেন এবং নিজের অক্ষমতা জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলতে ভুললেন না, যা কিছু ঘটেছে তার জন্য—তাঁকে শুধুমাত্র দায়ী করা চলে না।

মারিয়া চোখে অন্ধকার দেখলেও, নিজেকে সামলে নিল অল্প চেষ্টাতে। তারপর সে এমন কথা বলল, যাতে ক্যাসানোভা বিশেষ বিচলিত হলেন। মারিয়া জানাল এই কলঙ্কের হাত থেকে রক্ষা পাবার কোন ব্যবস্থা যদি না করা হয়, তখন বাধ্য হয়েই সে নিজের প্রতিপত্তিশালী আত্মীয়দের কাছে সমস্ত কথা প্রকাশ করে দেবে। ফলস্বরূপ ক্যাসানোভা প্রাণ নিয়ে এখান থেকে যেতে পারবেন না।

বাধ্য হয়েই মারিয়াকে সঙ্গে করে তাঁকে যেতে হল এক ধাত্রীর কাছে। ফ্রান্সে তখন গর্ভপাত আইন সিদ্ধ নয়। প্রস্তাব শুনে ধাত্রী অক্ষমতা জানাল। কিন্তু ক্যাসানোভা তখন মরিয়া। পিস্তল বার করে খুলি উড়িয়ে দেবার ভয় দেখালেন। তখন বাধ্য হয়েই ধাত্রী মারিয়ার গর্ভপাত ঘটাল।

এই ব্যাপারের শেষ কিন্তু এখানেই নয়। একটা বড় রকম ঝামেলা এড়িয়ে যেতে পেরেছেন এই কথা ভেবে যখন ক্যাসানোভা শান্তি পাচ্ছিলেন, তখনই জানা গেল সেই ধাত্রী তাঁর বিরুদ্ধে আদালতে গুরুতর অভিযোগ এনেছে। অগত্যা আবার ছুটতে হল ধাত্রীর বাড়ি। অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, মোটা টাকা দিয়ে শেষ পর্যন্ত রফায় আসা সম্ভব হল।

যথা সময় কেস উঠল কোর্টে।

আসামীর খাঁচার মধ্যে এনে দাঁড় করান হল ক্যাসানোভাকে।

সরকারী পক্ষের আইনজীবী ধাত্রীকে প্রশ্ন করলেন, এই কি সেই ব্যক্তি, যে আপনাকে ভয় দেখিয়ে বে-আইনী কাজ করতে বাধ্য করেছিল?

ধাত্রী অম্লান মুখে বলল, আমি এঁকে চিনি না। সেই ব্যক্তির সঙ্গে এঁর চেহারার মিল পর্যন্ত নেই।

হাকিম হয়তো বুঝতে পারলেন প্রকৃত ব্যাপারটা কি? কিন্তু আর কিছু করার ছিল না। ক্যাসানোভা খালাস পেলেন। বড় রকম একটা বিপদ কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন ভেবে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেও, জেলের হাত থেকে তিনি পরে রেহাই পাননি।

নারী আর জুয়া—এই দুটির জন্য ক্যাসানোভা সমস্ত কিছু করতে পারতেন। বিদেশে ছদ্মনাম-পরিচয়ের সাহায্যে সুন্দরীদের মন হরণ করতেও তাঁর বাঁধত না। সময় সময় তিনি হতেন বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রদূত। আবার কখনও বা কোন দেশের রাজকুমার। নিজের যে পরিচয় তিনি দেন না কেন, চমৎকার চেহারার দরুণ তাঁকে মানিয়ে যেত।

ছদ্মপরিচয় দিয়ে কার্যোদ্ধার করতে গিয়ে ভিয়েনায় তিনি একবার ধরা পড়ে গেলেন। তাঁকে অস্ট্রিয়া থেকে বিতাড়িত করা হল। ইতিমধ্যে তিনি নিজের অনেক শত্রু তৈরি করে ফেলেছেন। তাঁদের মধ্যে তাঁর শয্যাসঙ্গিনীর স্বামীতো ছিলই—আর ছিল, যাদের কাছ থেকে নানাভাবে টাকা ঠকিয়ে নিয়েছেন তারা।

শেষ পর্যন্ত ক্যাসানোভা ধরা পড়লেন ভেনিসে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল একাধিক কুমারীর সতীত্ব-নাশ। কারাবাসের আদেশ হল। অনেকে অতিষ্ঠ হয়ে তাঁকে ডুয়েলে আহ্বান করেছে, তিনি নির্বিকারভাবে সরে পড়েছেন সেখান থেকে—এই অভদ্র মানুষটির শাস্তি হওয়ায় তারা খুশি হয়েছে। খুশি হয়েছে পুরানো শত্রুরাও। কিন্তু এই খুশি বেশিদিন স্থায়ী হল না। ক্যাসানোভা জেল থেকে পালালেন।

অন্যত্র আবার তাঁর লীলা-খেলা আরম্ভ হল। তবে এখানে কিছুটা বিস্ময় থেকে যাচ্ছে। তাঁকে গ্রেপ্তারের ব্যবস্থা করা যেতে পারতো। কিন্তু তা হয়নি, মনে হয়, কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি তাঁর হয়ে রাজদরবারে ওকালতি করেছিলেন। যাই হোক ক্যাসানোভা তখন ফ্লোরেন্সে। সেখানে তিনি দুঃসাহসিক এক কাজ করার জন্য অগ্রসর হলেন।

চার্চের পরিচালনায় সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে মেয়েদের পাঠান তখনকার দিনে অত্যন্ত সম্মানজনক বলে বিবেচিত হত। এখানকার জীবন ছিল অত্যন্ত কঠোর। শিক্ষা শেষ হবার পর ওই সমস্ত যুবতীদের ধর্মীয় কাজকর্ম ও আর্তের সেবায় বাকি জীবন কাটিয়ে দিতে হত। বলা বাহুল্য কৌমার্য্য রক্ষা করে চলা অবশ্য পালনীয় ছিল।

এই তরুণীদের মধ্যে কারুর-কারুর যে পদস্খলন না হত তা নয়। সংবাদ প্রকাশ

হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাকে বহিষ্কার করা হত। অর্থশালী পিতার একমাত্র কন্যা সুন্দরী ক্রিশ্চিনা সৎমার ব্যবহারে অতিষ্ঠ হয়ে এই জীবন বেছে নিয়েছিল এবং অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলত।

দৈবাৎ ক্রিশ্চিনাকে দেখে ফেললেন ক্যাসানোভা। একথা না বললেও চলে যে, মন থেকে তাকে কাছে পাবার জন্য অসম্ভব উতলা হয়ে উঠলেন। কিন্তু ক্রিশ্চিনা সহজলভ্যা নয়। নগরের যত্রতত্র ঘুরে বেড়াবার অধিকার তার নেই, থাকে আশ্রমে। সেই আশ্রমে যাজক ছাড়া অন্য কোন পুরুষের প্রবেশাধিকার নেই।

ক্যাসানোভা কিন্তু হতাশ হলেন না। নানা সূত্রে খোঁজ খবর নিয়ে জানতে পারলেন ক্রিশ্চিনার শয়নকক্ষ আশ্রমের পশ্চিমদিকে। বাগান সংলগ্ন। তারপর পাঁচিল। পাঁচিলের অপরপ্রান্ত উদ্যান সংলগ্ন একটি বাড়ি। বাড়িটি খালি। কারণ কর্তা গ্রামাঞ্চলে নিজের জমিদারিতে বাস করেন। ক্যাসানোভা বাড়িটি ভাড়া নিয়ে ফেললেন।

তারপর তার কাজ হল, পাঁচিলের কাছে গিয়ে উঁচু কিছুর উপর দাঁড়িয়ে ক্রিশ্চিনার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করা। মাঝে-মাঝে দু'জনের চোখাচোখি হতে লাগল। ওই পুরুষটি কি চায় ক্রিশ্চিনার বুঝতে অসুবিধা [illegible] উঠত ঘৃণায়। তখন অবশ্য তার জানা নেই ওই বেহায়ার প্রকৃত পরিচয়। ক্যাসানোভা ক্রমে কথা আরম্ভ করলেন।

কাছাকাছি কেউ না থাকলেই অনুচ্চ গলায় দু'চার কথা বলতেন। ওপক্ষ থেকে কোন উত্তর আসতো না। শেষে নিজের পরিচয় দিলেন। কঠোর ধর্মীয় জীবনযাপন করতে থাকলেও ক্যাসানোভার লাম্পট্যের কথা ক্রিশ্চিনার অজানা ছিল না। এই সেই কুখ্যাত কুপুরুষ জানতে পেরে ঘৃণা আরো বেড়ে গেল।

শেষে ক্যাসানোভা অনুভব করলেন, এ মেয়েকে সহজে জয় করা যাবে না। বরং আরো কিছুদিন এইভাবে চলতে থাকলে নিশ্চিন্তভাবে সে কর্তৃপক্ষর কাছে অভিযোগ জানাবে। সুতরাং আর কথা নয়, এবার কাজে নামার সময় এসেছে।

একদিন গভীর রাত্রে পাঁচিল টপকে ওধারে নামলেন। আশ্রম তখন সুপ্তির অতলে তলিয়ে রয়েছে। ক্রিশ্চিনার দরজায় গিয়ে মৃদু করাঘাত করলেন। কোন সাড়া পাওয়া গেল না। বারকয়েক করাঘাত করার পর দরজা খুলে গেল। ক্রিশ্চিনা ভেবেছিল তার কোন সঙ্গিনী প্রয়োজনের তাগিদে গভীর রাত্রে তাকে ডাকছে। ক্যাসানোভাকে দেখে সে হতবাক হয়ে গেল। দু'পা পিছিয়ে গেল সভয়ে।

ক্যাসানোভা ভিতরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলেন। এবং সঙ্গে সঙ্গে একথাও

দৃঢ়ভাবে জানিয়ে দিলেন, চেঁচামেচি করার চেষ্টা করলে নিজের বিপদই ডেকে আনা হবে। লোকজন জড় হলে তিনিও যে বেকায়দায় পড়বেন না তা নয়, তবে প্রকারান্তরে সকলকে জানিয়ে দেবেন, এই ঘরে তাঁর নিয়মিত যাওয়া-আসা আছে। তাঁদের অবৈধ জীবন দীর্ঘদিনের।

ক্যাসানোভার হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া ছাড়া অসহায়া ক্রিশ্চিনার সামনে আর কোন পথ খোলা রইল না। কারণ জানাজানি হয়ে গেলে, বিশ্রী কেলেঙ্কারির মুখোমুখি যে শুধু হতে হবে তা নয়, কঠোর শাস্তিও পেতে হবে। এর পর সমস্ত কিছু অত্যন্ত সহজ হয়ে এল।

তৃপ্তির তুঙ্গে পৌছাবার জন্য নিয়মিত নবলব্ধা নারীটির ধারে যাওয়া-আসা করেন ক্যাসানোভা। ক্রিশ্চিনার মনেও আর কোন ইতস্তত নেই, তাই ভাল লাগে! স্পর্ধিতা যৌবনা যুবতী এতদিন যে নিজেকে শাসনে রেখেছিল এই তো যথেষ্ট। সংযমের বাঁধ যখন ভেঙে গেছে তখন নিজেকে আকণ্ঠ ডুবিয়ে দাও।

কিন্তু এই সুখের দিন দীর্ঘস্থায়ী হল না। ক্রিশ্চিনা সন্তান সম্ভবা হয়েছে এই সংবাদ পাবার পরই ক্যাসানোভা ওই অঞ্চল থেকে অদৃশ্য হলেন। তাঁর মনের কোণেও স্থান পেল না, এতদিন যে তাঁকে অপার আনন্দ দিয়ে এসেছে এবার তার কি হবে?

দিন গড়িয়ে চলেছে, এই সঙ্গে ক্যাসানোভার আর্থিক অবস্থা হয়ে উঠেছে শোচনীয়। চতুর্দিকে প্রচুর ধার। পাওনাদারের ভয়ে যত্রতত্র আর ঘুরে বেড়াতে পারেন না। আয়ের কোন পথও নেই। এইরকম শোচনীয় অবস্থা কিছুদিন চলার পর ভাগ্য আবার তার সহায় হল। অক্ষম বা প্রচণ্ড মদ্যপ স্বামীকে নিয়ে যে সমস্ত নারীরা দিন কাটায়; তারা গোপনে এগিয়ে আসতে লাগল। এই সমস্ত অসুখী মহিলারা অর্থের বিনিময়ে ক্যাসানোভার কাছ থেকে দৈহিক সুখ ক্রয় করতো। পনেরো থেকে পঁয়ষট্টি—বয়স যাই হোক না, তিনি কাউকেই বিমুখ করতেন না।

এই ধারা আবহমান বজায় থাকতে পারে না। বয়স বেড়েছে, কর্মক্ষমতাও দ্রুত কমে এসেছে। ক্যাসানোভার শেষ জীবন করুণ রসে মোড়া। প্রচণ্ড একাকিত্ব তাঁকে সদা উতলা করে রেখেছে। একটি কর্পদকও সঞ্চিত নেই। পেটের জন্য চুরি করতে হয়। অবশ্য এইরকম অবস্থার মধ্যেই দীর্ঘ আত্মজীবনী লেখা তিনি শেষ করেন।

১৭৯৮ খৃষ্টাব্দের এক সন্ধ্যায়, পরিণত বয়সে চিরদিনের মত চোখ বুজলেন জিওভানি জিয়াকোনো দ্যা ক্যাসোনোভা। বিস্ময়ের বিষয় তিনি কোন রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন না, রাজপুরুষ ছিলেন না, কুখ্যাত নারী শিকারী, তবুও ইতিহাস তাঁকে নিজের বুকে স্থান দিয়েছে।

রঙ্গনায়িকা গ্রেটা গার্বো

সাংবাদিক ম্যাথিয়াম বিপদে পড়েছেন।

তিনি কল্পনা করতে পারেননি তাঁর একটি প্রবন্ধের কয়েকটি লাইন তাঁকে এমনভাবে বেকায়দায় ফেলে দেবে। নিউইয়র্কের প্যারিস ম্যাচ পত্রিকায় তার লেখা রচনাটি কিভাবে যেন প্রখ্যাতা অভিনেত্রী গ্রেটা গার্বোর চোখে পড়ে গিয়েছিল—তারপরই আইনজ্ঞর কাছ থেকে কড়া এক চিঠি এসে উপস্থিত।

আজকের গ্রেটা গার্বো শীর্ষক প্রবন্ধে ম্যাথিয়াম প্রতিভাময়ী শিল্পীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে দুচার কথা লিখেছিলেন। বিশেষ জর্জ স্কীলের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল। ভারি নরম জায়গায় ঘা দেওয়া হয়েছিল। গ্রেটা কখনই পছন্দ করতেন না, তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে আগ্রহ প্রকাশ করা হোক।

এমনকি গুণগ্রাহীদের হাত থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্য সারা জীবনই ফ্ল্যাট বদল করে চলেছেন। কিন্তু নিজেকে যতই তিনি ঢেকে রাখার চেষ্টা করুন না কেন—তাঁর মত অতিখ্যাত অভিনেত্রীর ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে সকলেই উৎসুক, তাই মাঝে মাঝেই অনেক গোপন কথা বেরিয়ে পড়েছে।

তখনই গ্রেটা রাগ করেছেন। বিরক্তিতে সমস্ত মন তেতো হয়ে উঠেছে। আইনের দরজায় ঘা মারবেন কিনা ভেবেছেন। ম্যাথিয়াম আবার এগিয়ে গেছেন আরো এক ধাপ। কাজেই তাঁকে আইনজ্ঞর চিঠি পেতেই হল।

প্রশ্ন হচ্ছে, কে এই জর্জ স্কীল?

গ্রেটা গার্বোর মনের মানুষ নিশ্চয়?

কিন্তু জর্জ স্কীলকে আলোচনার মধ্যে এনে ফেলার আগে, সেই চাষী পরিবার সম্পর্কে কিছু বলে নেওয়া বোধহয় বাঞ্ছনীয় যাদের বাস ছিল সুইডেনের এক গণ্ডগ্রামে—যাদের দিন কাটত চরম দারিদ্র্যের মধ্যে।

গত শতাব্দীর শেষ দিকের কথা।

ঐ পরিবারের কর্তা কার্ল গুসতাফসান অনন্যপায় অবস্থায় মনস্থির করে ফেললেন, গ্রামে থাকলে অনাহারে মৃত্যুকে রোধ করা যাবে না। শহরে গিয়ে ভাগ্যের কূলে পৌঁছান যায় কিনা তার চেষ্টা দেখা দরকার। কাজেই দুই মেয়ে এক ছেলে আর স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়ে কার্ল সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমে চলে

এলেন। অসম্ভব সুপুরুষ কার্লের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, গ্রামের গণ্ডির মধ্যে না থেকে শহরে উপস্থিত হতে পারলে ভাগ্য ফিরে যাবে। তাঁর কিন্তু কোন কারিগরি বিদ্যার জ্ঞান ছিল না, না ছিল অন্য কোন বিষয়ে পারদর্শিতা। কাজেই দারিদ্রতা গুসতাফসান পরিবারের পিছু ছাড়ল না।

কার্লের ছোট মেয়ে কেটা বাপের মতই অপূর্ব মুখশ্রী লাভ করেছে, অঙ্গ সৌষ্ঠবও চমৎকার। তবে গম্ভীর প্রকৃতির। কিছুটা আত্মকেন্দ্রীকতা, একলা কোন নির্জন স্থানে সময় কাটাতেই ভালবাসে। কেটার যখন মাত্র চৌদ্দ বছর বয়স তখন কার্ল মারা গেলেন যদিও মা, দাদা এবং দিদি—তিনজনই চাকরি করেন, তবে তাঁদের মিলিত আয় এত অল্প যে তাতে সংসার চলা দায় হয়ে পড়ল। কেটা স্থির করে ফেলল আর লেখাপড়া নয়, এবার তাকেও চাকরি করতে হবে।

কাজ পাওয়া গেল পাড়ার সেলুনে। ওখানে কিছুদিন থাকার পর অন্য পাড়ার বড় সেলুনে চলে গেল। শেষ পর্যন্ত ওর মোটা মুটি ভাল মাইনের চাকরি হল, স্টকহোমের অন্যতম সেরা ডিপার্টমেণ্টাল স্টোরে। এই অসম্ভব সম্ভব হল অবশ্য সুন্দর মুখের জন্যই।

অল্প কিছুদিনের মধ্যে একটা সুযোগ পেল পেশাদার থিয়েটার দলে যোগ দেবার। অভিনয় করার ইচ্ছে মনের মধ্যে অনেক দিন থেকে। দোকানের কাজ ছেড়ে দিয়ে সে নাটকের চরিত্রগুলির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে ফেলার চেষ্টা করতে লাগল। তাঁকে অবশ্য বড় পার্ট দেওয়া হত না। তবুও একটা নাম করে ফেলল। নাম হওয়ার কারণ হল তার অ্যাংলো স্যাকসন ধাঁচের চেহারা।

সুইডেনের যে কোন শিল্পীর যা পরম কাম্য—সেই রিয়াল ড্রামাটিক থিয়েটার একাডেমি থেকে আহ্বান করা হল কেটাকে। ভাগ্য তখন প্রবলভাবে তাকে উপর দিকে ঠেলে নিয়ে চলেছে। ১৯২৩ সালে দেশের শ্রেষ্টতম চিত্র পরিচালক ষ্টিলার তাঁর 'গেসটা বের্লিং সাগা' চিত্রে কেটাকে নায়িকা মনোনিত করলেন।

তিনিই তার নতুন নামকরণ করলেন গ্রেটা গার্বো।

প্রথম চিত্র মুক্তিলাভ করবার পরই গ্রেটা সুইডেনবাসীর চিত্ত জয় করে নিলেন। এরপর একের পর এক চিত্রে অভিনয় করে গেছেন। ষ্টিলার তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছিলেন, গ্রেটা এমন এক শিল্পী যে ক্যামেরার সামনে শতাব্দীতে একবার আসে।

বলা বাহুল্য দু'জনেই দু'জনকে গভীরভাবে আকর্ষণ করেছিলেন। এ সংবাদ চাপা ছিল না। সকলেই বিখ্যাত পরিচালক আর সুখ্যাতা অভিনেত্রীর জাঁকজমকপূর্ণ বিবাহ অনুষ্ঠান দেখবার জন্য উৎসুক ছিলেন। কিন্তু সে রকম কিছু ঘটবার আগেই হলিউড থেকে ডাক এল। বৃহত্তর ক্ষেত্রে নিজেকে প্রতিষ্ঠা দেবার জন্য গ্রেটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যাত্রা করলেন।

ওখানে তাঁর প্রথম অভিনীত চিত্র ‘টরেন্ট।’ স্টিলারও সঙ্গে এসেছিলেন। দ্বিতীয় চিত্র ‘টেম্পট্রস’ এর পরিচালক তিনিই। ‘টেম্পট্রস’ কিন্তু জনচিত্ত জয় করতে পারল না। এর পরেও ষ্টিলারের কয়েকটি বই ফ্লপ করল। প্রেমিকের জন্য মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন গ্রেটা। সমস্ত ব্যাপারটা এলোমেলো হয়ে গেল এরপর। ভাঙা মন নিয়ে আমেরিকায় আর তিষ্টতে পারলেন না ষ্টিলার। হঠাৎই একদিন দেশে ফিরে গেলেন।

গ্রেটার জীবনে এবার উদয় হলেন জন গিলবার্ট। হলিউডের প্রখ্যাত অভিনেতা। অভিজাত চালচলন ও সুন্দর চেহারার জন্যও তাঁর খ্যাতি ছিল। দু'জনে প্রথম মুখোমুখি হলেন ‘ফ্লেশ অ্যাণ্ড দ্য ডেভিল’ ছবিতে। অল্প দিনের মধ্যেই প্রেম জমে উঠল। সাংবাদিকরা ঘনঘন দু'জনের কাছে যাতায়াত করতে লাগলেন এনগেজমেণ্টের তারিখ কবে ধার্য হচ্ছে জেনে নেবার জন্য।

সমস্ত কিছু সঠিক পথ ধরেই এগুচ্ছিল কিন্তু এবারও শেষ রক্ষা হল না। সেদিন ছিল ‘ওয়াইল্ড অর্কিড’ ছবির শুটিং। প্রাণ ঢেলে অভিনয় করছিলেন গ্রেটা। এমন সময় খবর এল ষ্টিলার মারা গেছেন। এই অচিন্ত্যনীয় সংবাদ পরিপাক করতে গ্রেটার সময় লাগল! আজকে যে এত নাম, যশ তার জন্য প্রেরণা ষ্টিলার ছাড়া আর কেউ নয়। তাঁর সেই গুরু—প্রেমিক এত তাড়াতাড়ি পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন?

সেইদিনই গ্রেটা সুইডেন যাত্রা করলেন।

স্টকহোমে পৌঁছাবার পর জনতা তাঁকে বিপুলভাবে সম্বর্ধনা জানাল। সে সমস্ত দিকে গ্রেটার দৃষ্টি নেই। সব কিছু এড়িয়ে তিনি সেই জায়গাটিতে গিয়ে উপস্থিত হলেন যেখানে তাঁর প্রিয় ষ্টিলার শেষ শয্যায় শায়িত রয়েছেন। সেদিন চোখের জল বাধা মানেনি, বারবার কবরের গায়ে হাত বুলিয়েছেন।

আবার হলিউডে ফিরে এলেন গ্রেটা। অন্যরূপ নিয়ে ফিরে এলেন। আগের চেয়ে গম্ভীর। অনেক বেশি আত্মসমাহিত ভাব। প্রয়োজনের সময় ছাড়া মানুষের সঙ্গ এড়িয়ে চলতে পারলেই খুশি হন। গিলবার্টের সঙ্গে মন দেওয়া-নেওয়ার পালা শেষ হল। গ্রেটা নির্মমভাবে নিজেকে সরিয়ে নিয়ে এলেন বলা চলে। গিলবার্ট সম্পর্ক জোড়া লাগাবার অনেক চেষ্টা করেছিলেন, কিন্তু সফল হতে পারেননি।

অবশ্য স্টুডিওর কাজে কোন গাফিলতি দেখালেন না। নিয়মিত নির্দিষ্ট সময় শুটিং-এ গিয়ে উপস্থিত হতেন। তবে এই সময় থেকেই তাঁর স্বেচ্ছানির্বাসন আরম্ভ হল। কোথায় থাকেন একথা কাউকে জানতে দিতে চান না—তাই একের পর এক হোটেল আর ফ্ল্যাট বদল করে চললেন।

ইতিমধ্যে প্রেমের ডালি সাজিয়ে এগিয়ে এসেছেন রবার্ট মামুলিয়ান, অভিনেতা, জর্জব্রাণ্ট, সুরকার লিওপোল্ড স্টকওয়াস্কি, অসম্ভব ধনী রথচাইল্ড। এদের সকলকে বাজিয়ে দেখেছেন গ্রেটা। ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছেন কারুর কারুর সঙ্গে। কিন্তু শেষ

পর্যন্ত সরে আসতে হয়েছে গভীর যন্ত্রণা বোধ নিয়ে। কেউই তাঁর মনের গভীরে মাধুর্যের প্রলেপ লাগাতে পারলেন না।

এই সময় জর্জ স্কীলের সঙ্গে আলাপ হল গ্রেটার।

স্কীলের স্ত্রী ভ্যালেন্টিনা সুন্দরী মহিলা। নিউইয়র্কে বসবাসকারী এই দম্পতির জীবনযাত্রা বেশ ছন্দময় ছিল। কিছুদিনের মধ্যেই কিন্তু স্কীল আর্থিক অনটনে বিব্রত হয়ে পড়লেন। তখন স্ত্রীকে মেয়েদের পোশাকের দোকান করে দেওয়া ছাড়া উপায় রইল না। ভাগ্য ক্রমে অল্প দিনের মধ্যে এই দোকান ধনী ও ফ্যাশন প্রবণ মহিলাদের কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠল।

একদিন ওই ফ্যাশন হাউসে গ্রেটা গিয়েছিলেন কিছু পোশাক কিনতে। স্কীলের সঙ্গে আলাপ হয়ে গেল। সুপুরুষ বলতে যা বোঝায় জর্জ স্কীল তা ছিলেন না। তবে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন চেহারা ছিল। অন্যকে বিশেষ করে নারীদের আকর্ষণ করার বিশেষ এক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন তিনি।

ভ্যালেন্টিনা আর স্কীলের সঙ্গে প্রায়ই দেখা হতে লাগল গ্রেটার। ক্রমে এমন অবস্থা দাঁড়াল, ভ্যালেন্টিনা বাদ পড়ে গেলেন—দু'জনে নিভৃতে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় কাটিয়ে আসেন। গ্রেটা নতুন করে প্রেমে পড়লেন, স্কীলও গভীরভাবে ভালবাসলেন জনচিত্তজয়ী অভিনেত্রীকে। বিস্ময়ের বিষয় ভ্যালেন্টিনা ব্যাপারটা বুঝতে পেরেও এমন ভাব করতেন যেন কিছুই জানেন না। এর কারণ বোধহয় গ্রেটাকে তিনি ঘাঁটাতে চাননি। গ্রেটার দৌলতে দোকানে ধনী ক্রেতার ভিড় লেগে থাকত। আর্থিক অবস্থা দারুণ ভাল হয়ে উঠেছিল।

নিউইয়র্কের ফিফটি সেকেণ্ড স্ট্রীটে জর্জ স্কীল স্ত্রীকে নিয়ে থাকতেন। গ্রেটা ওই বাড়িতে একটা অ্যাপার্টমেন্ট কিনে ফেললেন। শুটিং থেকে অবসর পাওয়া মাত্র লস এঞ্জেলস থেকে নিউইয়র্কে ছুটে আসতেন। স্কীলের নিবিড় সান্নিধ্য ছাড়া তখন যেন তাঁর আর কিছু কাম্য ছিল না। আউটডোরে কোথাও গেলে আমেরিকার মধ্যে কোথাও বা বিশ্বের যে কোন প্রান্তে, স্কীল হতেন তাঁর সাথী। যে হোটেলে গিয়ে উঠবেন, পাশের ঘরখানা নিশ্চিতভাবে প্রেমিকের জন্য নির্দিষ্ট। বলাবাহুল্য অবসর সময় সেই ঘরেই তিনি কাটাতেন।

গ্রেটা অবশ্য সতর্ক ছিলেন। যাই করুন না কেন, এমনভাবে করতেন যাতে বাইরের কেউ কিছুই বুঝতে না পারে, তিনি কখনই চাইতেন না তাঁর নব অনুরাগের কথা সাংবাদিকরা জানতে পারুক। কিন্তু এক্ষেত্রে চেষ্টাই শেষ কথা নয়, এই ধরনের ব্যাপার কখনই চাপা থাকে না। সাংবাদিকরা যথাসময় জানতে পারলেন।

নানা পত্রিকায় রসাল আলোচনা প্রকাশিত হতে লাগল। বিখ্যাত টাইমস পত্রিকায় লেখা হল, ওরা এমন তিনজন, যাদের অদ্ভুত ত্রয়ী বলা যায়। ভ্যালেন্টিনা,

জর্জ স্কীল আর গ্রেটা গার্বো—একই সঙ্গে ঘোরা ফেরা, একইসঙ্গে বসবাস—আশ্চর্য!

আরো সরল করে, আরো পরিষ্কার ভাবে যে ব্যাপারটাকে দেখবার চেষ্টা করা হয়নি তা নয়। কেউ কেউ এমন ইঙ্গিতও করলেন, জর্জ স্কীল এমন এক ব্যক্তি যিনি, গ্রেটার মনের গহনে শুধু প্রবেশ করেছেন তাই নয়, দেহটিও সম্পূর্ণ অধিকার করে নিয়েছেন।

পত্রিকাওয়ালাদের কাণ্ড কারখানায় অসম্ভব বিরক্ত হলেন গ্রেটা। তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে সকলের এত মাথা ব্যথা কেন? অচিরেই অবশ্য তিনি উপলব্ধি করলেন, তিনি নামকরা অভিনেত্রী, তাঁর আচার-আচরণ নিয়ে আলোচনা সোচ্চার হয়ে ওঠাই স্বাভাবিক।

সাংবাদিকরা ছেঁকে ধরল একদিন। গ্রেটা বুঝলেন, তাঁর অন্তরঙ্গ জীবন সম্পর্কে এবার মন্তব্য না করলেই নয়। স্বাভাবিক গলায় তিনি বললেন, জর্জকে আমি ভালবাসি—আমাদের দু'জনর প্রকৃতিগত মিলও আছে। তবে একথা ঠিক, ও কোন দিন আমাকে বিয়ে করবে না।

দীর্ঘ দু'দশক ধরে গ্রেটার সঙ্গে স্কীলের অন্তরঙ্গতা ছিল। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত এই ধারা প্রবাহিত থাকলে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রেত তা নয়। দু'জনে প্যারিস বেড়াতে গিয়েছিলেন, আস্তানা গেড়েছিলেন ক্রিলন হোটেলের শ্রেষ্ঠ দুটি ঘরে। সেদিন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত দু'জনে একই সঙ্গে ছিলেন। তারপর গ্রেটা ঘুমের আশায় ফিরে গিয়েছিলেন নিজের ঘরে।

সকালে ওঠার পর গ্রেটা আর স্কীলকে জীবিত অবস্থায় দেখতে পাননি। তাঁর মনের মানুষ ঘুমন্ত অবস্থাতেই চিরবিদায় নিয়েছে। তীব্র বেদনা মনকে ব্যথিত করে তুলল। ছুটে গেল তীক্ষ্ণ প্রশ্ন, কেন—বারবার এমন হয়।

হোটেল কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে ভ্যালেন্টিনা দ্রুত প্যারিসে চলে এলেন। এতদিন পরে যে প্রতিশোধ নেবার সময় উপস্থিত হল। তীক্ষ্ণ ভাষায় ভ্যালেন্টিনা স্বামীর মৃত্যুর জন্য দায়ী করলেন গ্রেটাকে। শুধু তাই নয়, যে প্লেনে স্কীলের মৃতদেহ নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হল তাতে চড়তে দেওয়া হল না গ্রেটাকে। আরো নানাভাবে উপেক্ষা অবজ্ঞা দেখান ভ্যালেন্টিনা।

সমস্তই নীরবে সহ্য করনে গ্রেটা গার্বো। হয়তো ভেবেছেন এও তাঁর প্রাপ্য। আবার নিরুত্তাপ খাতে তাঁর জীবন বইতে আরম্ভ করেছে। ইতিপূর্বেই সিনেমা জগৎ থেকে স্বেচ্ছায় নির্বাসন নিয়েছেন। খ্যাতির উচ্চ শিখরে অবস্থান রত অবস্থায় সরে দাঁড়াবার এমন নজীর ইতিহাসে আর নেই। তাঁর শেষ ছবি হল, 'টু ফেসেড ওম্যান'। ১৯৪১ সালের কথা—তখন তাঁর বয়স ছত্রিশ অতিক্রম করেনি।

পরবর্তীকালে অনেকেই প্রেমের ডালি সাজিয়ে এগিয়ে এসেছেন। তাঁর নিঃসঙ্গ

জীবন ভরিয়ে তুলতে চেয়েছেন। গ্রেটা সহযোগিতার হাত কারুর দিকে বাড়িয়ে দিতে চাননি। কারুর সঙ্গে অপেরায় গেছেন; কারুর আমন্ত্রণে পার্টিতে গেছেন, নৌকাবিহার করেছেন—ওই পর্যন্ত। আর বেশি এগোন নি।

কেউ কেউ কিন্তু তাঁর এই নিরাসক্ত ভাবকে প্রশ্রয় দিতে চাননি মোটেই। লেগে থেকেছেন আশায় আশায়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন সেসিল বেটন। শেষে অবশ্য তাঁকেও বিরক্ত হয়ে ক্ষান্ত দিতে হয়েছে। সেসিল গ্রেটা সম্পর্কে ক্ষোভের সঙ্গে বলেছেন, অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু বুঝতে পারিনি প্রকৃতপক্ষে গ্রেটা গার্বো কি চান। কোন কিছুর উপরই তাঁর বেশি আকর্ষণ থাকে না— খামখেয়ালীপনার চূড়ান্তে পৌঁছে তিনি যেন নিজের জীবনকে নিয়ে অবিরাম জুয়া খেলে চলেছেন। তাঁর স্বার্থপরতা তুলনাহীন। তাঁকে সঙ্গিনী হিসাবে পাওয়ার অর্থই হল, উদ্বেগ, আশঙ্কা আর অশান্তিকে নিত্য সহচর করে রাখা। সর্বদাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলছেন, সন্দেহের চোখে তাকিয়েছেন এদিক ওদিক—কারুর সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে যাওয়ায় তাঁর প্রচণ্ড অনীহা। ভালবাসা কাকে বলে তা তো তিনি জানেনই না।

এই সেসিল বেটন আবার অন্য সময় বলেছেন, আমি জীবনে অনেক সুন্দরীর সংস্পর্শে এসেছি, তবে গার্বোর মত এমন অনিন্দ্য সুন্দরী নারী আর দেখিনি। সৌন্দর্যের স্নিগ্ধতায় সর্বদা তিনি উদ্ভাসিত থেকেছেন। হলিউডে যখন প্রথম সাক্ষাৎ হয়, তখন যেমন দেখেছি, পরবর্তী বহু বছর পরেও লক্ষ্য করেছি, একই সৌন্দর্য তিনি ধরে রেখেছেন অবিশ্বাস্যভাবে।

তবে সেসিল ভালবাসা না পেলেও দৈহিক সুখ থেকে বঞ্চিত হননি। গ্রেটাকে সঙ্গে নিয়ে তিনি দু'বার কণ্টিনেণ্ট ট্যুর করেছেন—সেই সমস্ত দিনগুলি তাঁর কেটেছে স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে। আমেরিকাতেও অনেকে দু'জনকে আলিঙ্গনাবদ্ধ অবস্থায় দেখেছেন। সেসিলের তৃপ্তি অন্যত্র। তিনি চেয়েছিলেন গ্রেটা তাঁকে গভীরভাবে ভালবাসুন। দু'জনের বিয়ে হয়ে যাক।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ ছায়াচিত্র শিল্পী গ্রেটা গার্বোর আজ বয়স পঁয়ষট্টি বছর। কুমারী জীবনকেই শুধু দীর্ঘায়িত করেননি, চরম রিক্ততার মধ্যেই দিন কাটিয়ে চলেছেন। পরবর্তী জীবনে বহু লোভনীয় প্রস্তাব পেয়েছেন রূপালী পর্দায় নামার, রাজি হননি। দামী ও নামী ব্যক্তিরা বারংবার অনুনয় জানিয়েছেন এই সম্পর্কে—অসম্ভব বিরক্ত হয়েছেন গ্রেটা।

ভেবেছেন আর নয়, বিদেশে আর পড়ে থাকবেন না। ফিরে যাবেন স্টকহোমে। আত্মীয়-স্বজনদের মধ্যে এমন কেউ কেউ আছেন। তাঁদের সঙ্গে মিলে মিশে বাকি জীবন কাটিয়ে দেবেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যেতে পারেন নি। পড়ে থেকেছেন আমেরিকার মাটি আঁকড়ে।

বিস্ময়ের বিষয় নিউইয়র্কের সেই ফিফটি সেকেণ্ড স্ট্রীটের অ্যাপার্টমেন্ট-এ বাস করে চলেছেন—যেখানে স্কীলের সঙ্গে অনেক মন মাতানো রাত কেটেছে। ওই বাড়িরই অ্যাপার্টমেণ্টে যথা নিয়মে আছেন ভ্যালেণ্টিনা। স্কীলের মৃত্যুর পর দু'জনের মধ্যে আর কথাবার্তা হয়নি। এমনকি দেখা-সাক্ষাৎও নয়। গ্রেটা লিফটম্যানকে বলে রেখেছেন, ভ্যালেণ্টিনার মুখোমুখি হতে হয়, এমন অবস্থায় পড়ার আগেই যেন তাঁকে সতর্ক করে দেয় সে।

অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে এইভাবে দিন কাটাবার অর্থ কি? ইচ্ছে করলেই গ্রেটা অন্য অ্যাপার্টমেণ্টে চলে যেতে পারেন। ভ্যালেণ্টিনাকে এড়িয়ে যাওয়ার জন্য লিফটম্যানের সহযোগিতার প্রয়োজন হয় না। তবুও তিনি ফিফটি সেকেণ্ড স্ট্রীটের ওই বাড়িতেই রয়েছেন!

এই সমস্ত দেখে শুনে মনে হয়, তাঁর জীবনে ধারাবাহিকভাবে অনেক পুরুষ এসেছেন, নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে ষ্টিলার আর স্কীল অনন্য। আবার প্রথম যৌবনের সঙ্গী ষ্টিলারের চেয়ে স্কীলকেই বেশি পছন্দ করেছেন গ্রেটা গার্বো। নইলে এত অসুবিধা থাকা সত্ত্বেও ওই অ্যাপার্টমেণ্ট ছেড়ে চলে যেতে পাচ্ছেন না—শুধুমাত্র ওখানে প্রতি পদক্ষেপে প্রেমিকের স্মৃতি বিজড়িত আছে বলেই।

নারীবিলাসী বায়রণ

বিপুল খ্যাতি ও ততোধিক অখ্যাতির বোঝা ঘাড়ে নিয়ে দেবদুর্লভ কান্তির অধিকারী জর্জ গর্ডন বায়রণ বিশ্বসাহিত্যে আজও বিস্ময়ের প্রতীক হয়ে রয়েছেন। অমর সৃষ্টি ডন জুয়ানের প্রণেতা নিজের বিপুল প্রতিভাকে আরো বেশি কার্যকরী করে তুলতে পারতেন, যদি না দুর্নিবার নারী বিলাস তাঁকে পেয়ে বসত। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগ থেকে উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের মধ্যপাদ পর্যন্ত অসংখ্য সুন্দরী তরুণীর একমাত্র কাম্য পুরুষ ছিলেন তিনি। তাদের এই ভাবাবেগকে চমৎকার ভাবে কাজে লাগিয়ে তিনি দিনের পর দিন নিজের বাসনা চরিতার্থ করে গেছেন।

নগর নায়ক বায়রণ প্রমীলা রাজ্যে বিচরণ করেও কিন্তু কাউকে ভালবাসেননি। ভালবাসা নামক অনুভূতিকে মনে প্রশ্রয় দেবার অর্থ খুঁজে পেতেন না। তিনি বলেছেন, আমার মতে ভালবাসা হ'ল সবচেয়ে নিকৃষ্ট অসুখ। অর্থাৎ ভালবাসাকে ঠেলে রেখে শুধু প্রয়োজন মিটিয়ে যাও। সৌভাগ্যক্রমে তিনি আজীবন অপর্যাপ্ত সুযোগ পেয়েছেন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে তার সদ্ব্যবহার করতে দ্বিধা করেননি। তাঁর এই স্বভাবের জন্য এক বন্ধু অনুযোগ করায় বায়রণ বলেছিলেন, আমি কি করব, মেয়েরা আমার কাছে আসে নষ্ট হতেই।

বায়রণ উন্মত্তের মত একটির পর একটি নারীর সঙ্গে ব্যভিচার করে কেন আনন্দ পেতেন তার একটা আবছা ধারণা পাওয়া যায়। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দের ২২শে জানুয়ারি লণ্ডনে তিনি এক লর্ড পরিবারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর জনক নিজের অপরিণামদর্শিতার জন্য নিজের মৃত্যুর সময় আকাশ ছোঁয়া আভিজাত্য ছাড়া আর কিছু রেখে যেতে পারেননি ছেলের জন্য।

অপূর্ব স্বাস্থ্য ও তীক্ষ্ণ সুন্দর মুখের অধিকারী বায়রণের একটি পা ছিল সামান্য ছোট। কাজেই তাঁকে খুঁড়িয়ে চলতে হত। শরীরের এই খুঁতের জন্য আজীবন তিনি হীনমন্যতায় ভুগেছেন। ষোল বছর বয়সে একবার ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন গ্রামে। সেখানে রূপসী মেরী সাওয়ার্থের সঙ্গে পরিচয় হ'ল তাঁর।

ভীষণ ভাল লেগে গেল মেরীকে। বায়রণ যতদূর সম্ভব বেশি সময় তার সঙ্গেই কাটান। মেরী তাঁর সঙ্গে হেসেই কথা বলে। এসমস্ত কিন্তু ভাল লাগে না গ্রামের একজন তরুণের। না লাগবারই কথা। কারণ তাদের মন দেওয়া-নেওয়ার পালা

শেষ হবার পর সে অপেক্ষা করছে পাকা কথার। এই সমস্ত জানা ছিল না বায়রণের। জানতে পারলেন যে পরিস্থিতি তাতে অপমান আর আত্মধিক্কারে মাটির সঙ্গে নিজেকে মিশিয়ে দিতে মন চাইল। প্রতিদিনকার মত সেদিন মেরীদের বাড়ি ঢুকতে গিয়ে শুনতে পেলেন, মেরী কাউকে বলছেন, তুমি ভেবে বসে আছ নাকি আমি ওই খোঁড়াটাকে বিয়ে করব।

সেইদিন বোধ হয় বায়রণ স্থির করেছিলেন, আর ভালবাসা নয়। মেয়েদের তিনি গ্রহণ করবেন শুধু মাত্র খাদ্য হিসাবে। এতে যদি সময় সময় বেলেল্লাপনার চূড়ান্তে পৌঁছাতে হয় তাতে তিনি পশ্চাৎপদ হবেন না। বলাবাহুল্য তাঁর অল্প পরিসর জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই ধারাকে অনুসরণ করে গেছেন। এই ব্যাপারে ভাগ্যও তাঁকে অদ্ভুত সাহায্য করেছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে তিনি নন, অপর পক্ষই এগিয়ে এসেছে তাঁর দিকে। সেই সমস্ত কাহিনী এই ছোট প্রবন্ধে বর্ণনা করা সম্ভব নয়। তবে তাঁর জীবনের একটি বিখ্যাত দৃষ্টান্ত এখানে তুলে ধরতে বাঁধা নেই। সেই অভিজাত নারীটি হলেন ক্যারোলিন ল্যাম—ইংল্যাণ্ডের তৎকালের প্রধানমন্ত্রী লর্ড মেলবোর্ণের পুত্রবধূ। উঁচু সমাজের রোমাণ্টিক মনোভাবাপন্না এই তরুণীর সঙ্গে বায়রণের পরিচয় ছিল না।

সাহিত্যের প্রতি ক্যারোলিনের বিশেষ ঝোঁক ছিল। মাঝে মধ্যে কবিতাও লিখতেন। একদিন স্যামুয়েল রজার্স বায়রণের "চাইল্ডহেরল্ড" পড়ে শোনালেন তাঁকে। এত ভাল লাগল ক্যারোলিনের যে তিনি কবির সঙ্গে দেখা করবার জন্য অসম্ভব উতলা হয়ে উঠলেন। বায়রণের স্বভাব বিশেষ সুবিধার নয় এবং তিনি খোঁড়া এটা জেনেও তাঁর আগ্রহ কমল না।

শেষে রজার্সের চেষ্টাতেই সাক্ষাৎ হ'ল দু'জনের। প্রথম দর্শনেই ক্যারোলিন মুগ্ধ হয়ে গেলেন। প্রখ্যাত কবির এমন সুন্দর চেহারা না হলে কি মানায়! এই আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের সামনে দাঁড়িয়ে তিনি বিশেষ কিছুই বলতে পারলেন না। সারা শরীরে ঘামের বন্যা নামল। বায়রণও সামান্য দু'চার কথা বললেন, তবে দেখলেন খুঁটিয়ে খ্যাতনামা পরিবারের এই বধূটিকে।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎ ঘটল এক পার্টিতে।

বড়ঘরের বহু রূপবান তরুণ সেখানে একত্রিত হয়েছিল। ক্যারোলিনের দৃষ্টি কিন্তু তাদের দিকে নেই। তিনি উসখুস করছিলেন বায়রণের জন্য। শুনেছিলেন এখানে কবিও আমন্ত্রিত। বায়রণ আসতেই ক্যারোলিন সকলের সামনেই ছুটে গেলেন তাঁর দিকে। নিজেকে আজ সহজ করে নিয়েছেন অনেক। দু'জনে বসলেন একধারে। অসংলগ্নভাবে কথাবার্তা চলতে লাগল।

এক সময় শিষ্টাচারের খাতিরে একজনের আহ্বানে ক্যারোলিনকে নাচের চত্বরে

যেতে হল। নাচে তাঁর বিশেষ খ্যাতি ছিল। বায়রণ কিন্তু নিজের অক্ষমতার দরুণ ঘোর অপছন্দ করতেন বলনাচ। তিনি নিরস মনে বসে জোড়ায় জোড়ায় নৃত্যশীল নরনারীকে দেখতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ পরে ক্যারোলিন ফিরে এসে বললেন, নাচ ভাল লাগল?

—আমি পছন্দ করি না।

—আমি কি আর নাচব না?

—আমার পরামর্শ যদি নেন তাহলে আমি ওই কথাই বলব।

ক্যারোলিন সেই দিন থেকে নাচ বন্ধ করে দিলেন। সহস্র অনুরোধে কেউ তাঁকে আর নাচের চত্বরে নিয়ে যেতে পারত না। এমনকি তাঁর স্বামী উইলিয়াম ল্যামও নয়। এরপর থেকে দু'জনের প্রায় দেখা সাক্ষাৎ ঘটতে লাগল। বায়রণ প্রায়ই আমন্ত্রণ পেতে লাগলেন মেলবোর্ণ হাউসে। হুজুগ-প্রিয় স্ত্রীর এই খেয়ালকে বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না উইলিয়াম ল্যাম।

বায়রণ নামেই লর্ড ছিলেন। পৈতৃক সূত্রে তিনি কান্ট্রিসাইডে একটি মাঝারি আকারের দুর্গ ছাড়া আর কিছুই পাননি। লেখার আয় থেকেই তাঁর চলতো, তাঁর বইগুলি অসম্ভব বিক্রি হত। সময় সময় তিনি প্রখ্যাত ওয়াল্টার স্কটের বাজারকেও ছাপিয়ে যেতেন। লণ্ডনে বায়রণ একাই থাকতেন একটি দ্বিতীয় শ্রেণীর বাড়ি ভাড়া নিয়ে। সেই বাড়িতে কত কুলবধূর সঙ্গে যে অসংখ্য রাত কেটেছে তার হিসাব কেউ রাখেনি। বায়রণ কুমারীর চেয়ে বিবাহিতাদেরই বেশি পছন্দ করতেন।

ক্যারোলিনের সঙ্গে আলাপ হবার অল্প কিছুদিন পরে বায়রণ প্রেমপত্র পেলেন তাঁর কাছ থেকে। দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এই রকম কিছু একটা আশা করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নিপুণ ভাষায় উত্তর দিলেন। পত্রের আদান-প্রদান চলল কয়েকদিন। বিশ্বপত্র সাহিত্যে এগুলি অমর হয়ে আছে। দু'জনে দু'জনের সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হবার পর একান্তে সাক্ষাতের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল। একটি আসর থেকে সকলের অলক্ষ্যে অসময়ে দু'জনে বেরিয়ে পড়লেন, বায়রণ বললেন, আমরা কিছুক্ষণ এক সঙ্গে সময় কাটাতে পারি আমার বাসায় অবশ্য আপনার কোন আপত্তি না থাকলে।

ক্যারোলিন এই রকম আনুরোধই যেন আশা করেছিলেন।

নির্জন গৃহে দুটি মিলনোৎসুক নরনারী গিয়ে প্রবেশ করলেন। তারপর অনিবার্য ঘটনার স্রোতেই দু'জনে গা ভাসিয়ে দিলেন। বায়রণ এর সচেষ্ট হবার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল না। ক্যারোলিন নিজেকে বিলিয়ে দিলেন প্রেমিকের কাছে। দেহের আগুন ঠাণ্ডা হবার পর বায়রণ অনুভব করলেন, মনের অবচেতনে এই রকম একটি নারীর আকাঙ্খাই ছিল বোধহয় এতদিন।

এরপরের ঘটনা আরো বিচিত্র। বায়রণকে পাগলের মত ভালবেসে ক্যারোলিন

শুধু বেপরোয়া হয়ে উঠলেন না, নির্লজ্জতার চরমে গিয়ে পৌঁছালেন। তিনি স্থান কাল বা পাত্রকে বিন্দুমাত্র গ্রাহ্য না করে জড়িয়ে ধরতেন বায়রণকে বা এমন ব্যবহার প্রকাশ করতেন যাতে মনে হত উনি তাঁর অনুগতা পত্নী।

তখনকার ইংলণ্ডের রক্ষণশীল আভিজাত্যের উপর এ এক প্রচণ্ড আঘাত। বড় ঘরের মেয়েরা একটু আধটু এদিক ওদিক যে না করেন তা নয়, তবে চোখের আড়ালে যা হয় তা নিয়ে বড় একটা কারুর মাথা ব্যথা থাকে না।

কিন্তু এতো প্রকাশ্যে ঢলাঢলি! ক্যারোলিন ও বায়রণকে নিয়ে সকলে আলোচনায় সোচ্চার হয়ে উঠল। ছ্যা ছ্যা পড়ে গেল চারিধারে!

ক্যারোলিনের কানে যে কোন কথা যাচ্ছিল না তা নয়। তিনি এ সমস্ত গ্রাহ্যের মধ্যে আনা প্রয়োজন মনে করলেন না। বরং তাঁর ভালবাসা আরও উন্মত্ত আকার নিল। বায়রণের শয়নকক্ষে তাঁর প্রতিদিন কিছু সময় কাটেই—এ ছাড়া ছায়ার মত অনুসরণ করতে থাকেন উপপতিকে সর্বত্র। একজন অভিজাত মহিলার প্রকাশ্যে এমন অবৈধ জীবন অতিবাহিত করার দৃষ্টান্ত সেকালে খুবই কম ছিল।

বায়রণ কিন্তু ক্রমেই অস্বস্তি বোধ করছিলেন। কুৎসা রটছিল বলে তাঁর বিশেষ কোন চিন্তা ছিল না। তিনি অনেক দিন থেকেই অনেক কেচ্ছার নায়ক। সুতরাং কারা কি বলে বেড়াচ্ছে তাতে কিছু যায় আসে না। অস্বস্তির কারণ হল ক্যারোলিন স্বয়ং। তাঁকে বায়রণের ভালই লেগেছিল। কিছুদিন তাঁকে আকণ্ঠ পান করবেন তারপর আবার ছুটবেন নতুনের সন্ধানে। কিন্তু ক্যারোলিন এমন ভালবাসার জালে আঁকড়ে ধরেছেন যে তিনি সরে আসবার পথ পাচ্ছেন না।

কার পিছনে ছুটবেন তাও একরকম স্থির হয়ে রয়েছে, সে আর কেউ নয়, ক্যারোলিনেরই আত্মীয়া অপূর্ব সুন্দরী ইসাবেলা মিল ব্যাঙ্ক। ইদানিং অনেক পার্টিতে দুজনের সাক্ষাৎ হচ্ছে। ইসাবেলার চোখে তিনি সহানুভূতির আভা দেখেছেন। সর্বজন সমক্ষে ক্যারোলিন বায়রণকে অসভ্যের মত আঁকড়ে থাকেন এটা বোধহয় তারও ভাল লাগছে না।

এই রকম যখন পরিস্থিতি তখন মেলবোর্ণ হাউসে বিশেষ এক নাটকের অবতারণা হয়েছে। উইলিয়ামের কানে সমস্ত কথাই গিয়েছিল। তিনি মর্মে-মর্মে বুঝলেন স্ত্রীকে অত্যধিক প্রশ্রয় দেওয়ার ফল কত শোচনীয় হয়েছে। এখন শক্ত হাতে সংযত করতে না পারলে মান মর্যাদা চিরকালের মত হাতছাড়া হবে। তিনি সরাসরি আক্রমণ করলেন ক্যারোলিনকে এবং ধিক্কারে স্ত্রীকে জর্জরিত করে কঠিন শব্দে জানালেন, যা হবার হয়ে গেছে। এখন সংযত হলে তিনি তাকে স্ত্রীর মর্যাদাতেই ঘরে রাখবেন।

ক্যারোলিন গম্ভীর গলায় বললেন, তোমার যখন এত অসুবিধা তখন নাই বা

থাকলাম এখানে। আমি চলে যাচ্ছি ওর কাছে।

কেলেঙ্কারির আর কিছু বাকি রইল না। কথা শেষ করেই ক্যারোলিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর শ্বাশুড়ী আর মা চুপ করে আর থাকতে পারলেন না। বায়রণের কাছে গিয়ে অনুনয় করলেন তাঁদের মান-মর্যাদা বাঁচাতে। দুই অভিজাত মহিলার নাটকীয় উপস্থিতিতে অবাক হলেও নিজের মুক্তির পথ খুঁজে পেলেন বায়রণ। তাঁদের কথা দিলেন, ক্যারোলিনের সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক রাখবেন না। রূঢ়ভাবে তাকে ফিরিয়ে দেবেন।

কার্যক্ষেত্রে তিনি তাই করেছিলেন। তারপর ঝুঁকলেন ইসাবেলার দিকে। তবে কয়েকদিন মেলামেশা করার পর বুঝলেন, আর অনেকের মত সহজে দেহদান করার মেয়ে সে নয়। ইসাবেলা তাঁকে পরিষ্কার ভাবে বলেছে, আমাকে যখন এতই পছন্দ তখন আমাদের বিয়ে হয়ে গেলেই তো হয়।

ক্যারোলিন পর্বের তখনও কিছুটা বাকি ছিল। লেডি হিসকোটের প্রদত্ত পার্টিতে শেষ দেখা হল দু'জনের। বায়রণ অবশ্য জানতেন না ক্যারোলিনও এখানে আমন্ত্রিতা। দু'জনের সম্পর্ক এখন কি সকলেরই জানা। নতুন কিছু ঘটে কিনা দেখবার জন্য অনেকেই ওঁদের উপর দৃষ্টি রেখেছেন।

ক্যারোলিন ধীরে ধীরে বায়রণের সামনে এসে দাঁড়ালেন।

—তোমার আপত্তি ছিল। এখন আমি নাচতে পারি কি?

—স্বচ্ছন্দে। তোমার যা ইচ্ছা হবে তাই করবে।

নাচ আরম্ভ হল। জোড়ায় জোড়ায় নারী পুরুষ ক্রমে উদ্দাম নৃত্যে নিজেদের হারিয়ে ফেললেন। বায়রণ নির্বিকারভাবে বসে দেখছেন। হঠাৎ ভীষণ চিৎকার করে উঠলেন ক্যারোলিন—"ওঃ—বায়রণ"! তারপর ছুটতে ছুটতে চলে গেলেন পাশের ঘরে। লেডি হিসকোট ও বায়রণ দ্রুত সেখানে গিয়ে দেখলেন টেবিলের উপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে আছেন ক্যারোলিন, তাঁর পোশাক রক্তে ভিজছে। নিজেই তিনি ছুরি দিয়ে এই কাণ্ড ঘটিয়েছেন বুঝতে পারা যায়। আঘাত গুরুতর নয়। আমন্ত্রিতরাও ভিড় করে এসেছিলেন। তাঁরা এই বাড়াবাড়ি ধরনের ন্যাকামি দেখে অবাক। বায়রণ আর ওখানে অপেক্ষা না করে সকলের অলক্ষ্যে স্থান ত্যাগ করলেন।

আবার ক্যারোলিনকে নিয়ে আর কোন ব্যাপারে জড়িয়ে পড়বার আগেই ইসাবেলা মিল ব্যাঙ্ককে বিয়ে করে বসলেন। পরবর্তী কালে ক্যারোলিন গ্লেনারভন নামে একটি উপন্যাস লিখেছিলেন। তাতে তাঁর ও বায়রণের উদ্দাম যৌন জীবনের হুবহু চিত্র দেওয়া ছিল।

বলা বাহুল্য কিছুদিন পর থেকেই মিল ব্যাঙ্ককে তাঁর পানসে মনে হতে লাগল।

একটি কন্যার জন্ম হবার পর দু'জনের সম্পর্কের অবনতি ঘটলো আরো। ইসাবেলার সাধ্য ছিল না স্বামীকে নিজের প্রতি একাগ্র করে রাখার। লর্ড বায়রণের মত মানুষের এই বন্ধন স্বাভাবিক কারণেই ভাল লাগার কথা নয়—স্ত্রী যতই সুঠাম দেহী সুন্দরী হোক না কেন। তিনি আবার এখানে ওখানে মধু খেয়ে বেড়াচ্ছিলেন।

তাঁর বিবাহিত জীবনের উপর চরম সঙ্কট ঘনিয়ে এল আগাষ্টার আগমনের পর। পুরুষস্বভাবা এই তরুণী বায়রণের সৎ বোন। অল্প দিন পরেই ইসাবেলা বুঝতে পারল বায়রণ নিজের এই নিকট আত্মীয়ার সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। লজ্জায় আর ঘৃণায় তার শরীর রি রি করে উঠল। মানুষটার আপন পর বলেও কি কিছু নেই! এই সমস্ত সংবাদ হাওয়ার আগে ছুটে যায়। কাজেই চতুর্দিকে ছি ছি পড়ে গেল।

ইসাবেলা আর অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করল না। বিবাহ-বিচ্ছেদের আবেদন জানাল আদালতে। ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত। তবু এই ডাইভোর্সকে কেন্দ্র করে ঝড় উঠল, অনেকে বায়রণকে অপমানিত করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। বিশেষ ব্যথিত হলেন তিনি। বুঝে উঠতে পারলেন না তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে সকলের এত মাথা ব্যথা কেন!

এই সময় আরো একটু বেকায়দায় পড়তে হল তাঁকে। নেপোলিয়ানের পতন হওয়ায় তিনি আক্ষেপ করে লিখলেন, "অন দি ষ্টার অব দি লীজন অব অনার"। দেশদ্রোহী আখ্যা পেতে তাঁর বিলম্ব হল না। ব্যাপারটি পার্লামেণ্ট পর্যন্ত গড়াল। লর্ড নামক খেতাবটি তাঁর নামের সঙ্গে যুক্ত থাকায় সেখানে রেহাই পেলেন বটে, তবে একটা ভয় তাকে অনুসরণ করে চলল। মনে হতে লাগল যে কোন মুহূর্তে কেউ তাঁকে আদালতে টেনে নিয়ে যেতে পারে।

এই সমস্ত সাত-পাঁচ ভেবে তিনি দ্রুত মনস্থির করে ফেললেন। আসামী হয়ে আদালতে যাবার আগেই তিনি ইংল্যাণ্ডের মায়া কাটাবেন। মন অবশ্য চাইছে না কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এ ছাড়া আর কোন উপায়ও নেই।

যাবার দিন ঘনিয়ে এল। ইউরোপের কোন শহরে স্থায়ীভাবে বাস করবেন এরকম কোন পরিকল্পনা নেই যত্রতত্র ঘুরে বেড়িয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দেবেন এই ইচ্ছাই মনে আছে। যাবার সময় একজন তাঁর কাছে জানতে চেয়েছিল, তিনি আর ফিরে আসবেন কিনা? বায়রণ বললেন, তিনি যদি ফিরে নাও আসেন, তাঁর আত্মা ফিরে আসবে।

এই সময় একটি বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল, দলে দলে অভিজাত ঘরের মেয়ে চাকরানীর পোশাক পরে তাদের প্রিয় বায়রণকে দেখতে এল জাহাজ ঘাটে। তিনি

কিছুটা উদাসীন ভাব নিয়েই ইংলণ্ড থেকে বিদায় নিলেন। প্রবাসেও তাঁর নারীকে আকর্ষণ করবার তীব্র ক্ষমতা কমেনি।

ইতালির নানা শহরে উঁচু ঘরের বেশ কয়েকটি বিবাহিতা তরুণীর সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। তারা নিজেদের বিলিয়ে দিয়েছে বায়রণের কাছে। এরকম নারীসঙ্গ-সুখী ভাগ্য বড় একটা দেখা যায় না। ক্রমে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর মন চরিত্রের বিপরীতে একসময় যে ভাবে ঘুরল তাতে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

তুর্কীরা গ্রীস আক্রমণ করতেই তিনি ছুটে গেলেন সেখানে। স্বাধীন সত্ত্বার উপর এই আঘাত তাঁকে আহত করল। তিনি নিজের যথাসাধ্য শক্তি নিয়ে সাহায্য করতে লাগলেন গ্রীসকে।

কিন্তু বিধি বাম। ১৮২৩ সালে সেই যুদ্ধের ঘাত-প্রত্যাঘাতের মধ্যেই দুরন্ত নারীবিলাসী লর্ড বায়রণ যৌবনের সীমা রেখার মধ্যেই নিজের জীবনের উপর যবনিকা টানলেন।

নেলসনের প্রেমিকা লেডি হ্যামিলটন

বিখ্যাত বৃটিশ নৌবহরের প্রখ্যাত সেনাপতি নেলসন একটু বেকায়দায় পড়ে গেছেন। ফরাসিদের সঙ্গে ইংরাজদের তখন প্রবল যুদ্ধ চলেছে। সমস্ত ইউরোপ ভূখণ্ডকে থরথর করে কাঁপিয়েই শুধু নেপোলিয়ান ক্ষান্ত হননি। তাঁর দৃষ্টি পড়েছে সোনার দেশ ভারতের উপর। প্রাচ্যের এই মূল্যবান অংশটি ইংরাজদের হাত থেকে তিনি ছিনিয়ে নিতে চান। নেলসনের উপর দায়িত্ব পড়েছে নেপোলিয়ানকে কঠোর হাতে ও পথ থেকে সরিয়ে আনার।

অসংখ্য জলযুদ্ধের পরাক্রান্ত সেনানায়ক নেলসন নেপোলিয়ানের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছেন না। অসুবিধা দেখা দিয়েছে অন্য ধারে। রসদ ফুরিয়ে গেছে, পানীয় জলের একান্ত অভাব। নিকটবর্তী ইংরাজ ঘাঁটি জিব্রাল্টারে গেলে সমস্যার সমাধান হয়। তবে ফিরে এসে আর ফরাসিদের ধরা যাবে না। তারা তখন ভারত মহাসাগরের জলে ভাসতে থাকবে। অবশ্য একটা উপায় আছে। নিরপেক্ষ রাষ্ট্র নেপলস্ যদি তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করার জন্য হাত বাড়ায়।

স্যার উইলিয়াম হ্যামিলটন তখন নেপলসে রাষ্ট্রদূত। তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করতে গেলেন নেলসন। সমস্ত শোনার পর, অবস্থার গুরুত্ব উপলব্ধি করে স্যার উইলিয়াম ছুটলেন নেপলস্-রাজদরবারে। এই সময় আরো একটি ব্যাপার ঘটে গেল। ঘটে গেল বলতে যা বোঝায় ঠিক তা নয়—শিষ্টাচার বজায় রাখার জন্যেও বটে, আবার খ্যাতিমান নেলসনকে একবার চোখে দেখার আগ্রহেও লেডি হ্যামিলটন দু'জনেব কথোপকথনের মধ্যে এসে পড়েছিলেন।

স্যার উইলিয়াম নিজের স্ত্রীর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলেন নেলসনের। অনেক রক্ত দেখা, কঠোর হৃদয় সেনাপতির মনের মধ্যে তখন ঝড় আরম্ভ হয়েছে। জীবনে তিনি অনেক সুন্দরী নারীর একান্ত উষ্ণস্পর্শ অনুভব করেছেন। লণ্ডনের উঁচু মহলের সেরা ললনারা তাঁর সঙ্গ পাবার জন্য লালায়িত। তাদের নিয়ে তিনি যথেচ্ছভাবে সময় কাটিয়েছেন। কিন্তু আজ একি দেখলেন! এত দিনের দেখা সমস্ত সুন্দরীরাই তাঁর কাছে এখন জোলো মনে হতে লাগল। এমন নিখুঁত সুন্দর মুখ, এমন সুঠাম দেহের অধিকারী নারীও আছে তাঁর অদেখা জগতে।

স্যার উইলিয়াম কার্যোদ্ধারের জন্য বেরিয়ে পড়বার পরই নেলসন লেডি

হ্যামিলটনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে আলাপ করার জন্য ব্যগ্র হয়ে পড়লেন। তিনি ভুলে গেলেন কি কাজের জন্য এখানে এসেছেন। ভুলে গেলেন, কত কঠিন দায়িত্বের চাপ তাঁর উপর রয়েছে। তিনি মোহগ্রস্তের মত ওই অনিন্দ্যসুন্দরী নারীর সঙ্গে নানা প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যেতে লাগলেন।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তিনি অনুভব করলেন, লেডি হ্যামিলটন যেন তাঁকে কিছুটা প্রশ্রয় দিচ্ছেন। লেডির চোখে যেন এক বিচিত্র ইশারা। নেলসন উৎসাহিত হলেন। তাঁর আকাঙ্ক্ষিতার মন কিছুটা নরম করে এনেছেন। পরিচিত মহলে পলকে নারীচিত্ত জয়ী হিসাবে তাঁর খ্যাতি আছে। তবে বর্তমান ক্ষেত্রে যে এত তাড়াতাড়ি সাফল্যের প্রথম সোপানে পা রাখতে পারবেন তা তিনি ভাবতে পারেন নি।

নেলসন বহুদর্শী হলেও জানেন না বর্তমান ক্ষেত্রে তাঁর কৃতিত্বের কানা-কড়ি দাম নেই। অন্যপক্ষই ধরা দেবার জন্য অধিক মাত্রায় আগ্রহশীলা। এক শ্রেণীর বিবাহিতা নারী আছে যারা ক্ষমতাশালী পরপুরুষ দেখলেই তাদের অনুগ্রহ পাবার জন্য উতলা হয়ে ওঠে। কিন্তু লেডি হ্যামিলটনের ক্ষেত্রে সেরকম কথা বলা যায় কি? স্যার উইলিয়াম উচ্চ বেতনধারী এবং পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর স্ত্রীর পক্ষে প্রথম দর্শনে একজন পরপুরুষকে নিজের দিকে আকর্ষণ করার চেষ্টাকে নিন্দনীয় মনে হলেও, লেডি হ্যামিলটনের প্রকৃত পরিচয় পাবার পর—তাঁর চারিত্রিক বিশৃঙ্খলার ইতিহাস জানার পর আর কিছু বলার থাকবে না।

প্রথম থেকেই এবার আরম্ভ করা যেতে পারে। তাহলেই বুঝতে পারা যাবে, ভাগ্যের বিচিত্র খেয়ালে একটি পথে পথে ঘুরে বেড়ানো বহুভোগ্যা অতি সাধারণ নারী কিভাবে লেডি হ্যামিলটনে পরিণত হয়েছিল। নানা চমকে সমাকীর্ণ ইংলণ্ডের সমাজ জীবনের ইতিহাসে এ এক অন্যতম দৃষ্টান্ত।

এক শীতের সন্ধ্যায় ল্যাঙ্কাশায়ারের প্রেস্টনে আগামীকালের ভুবনবিখ্যাত সুন্দরী অ্যান লিয়ন পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেছিল। দুঃস্থ মা বাপের কেউই তখন বুঝতে পারেননি জীর্ণ ঘরের চার দেওয়াল পেরিয়ে এই মেয়ে কোথায় গিয়ে পৌঁছাবে। অ্যানি যখন মাত্র কৈশোরে পা দিয়েছে তখন তার কামার বাবা চরম দারিদ্র্যের মধ্যে স্ত্রী-কন্যাকে রেখে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

কিভাবে সংসার চলবে এই চিন্তায় অ্যানির মা পাগল হয়ে উঠলেন। এছাড়া আরেক উৎসর্গ দেখা দিয়েছিল। কিশোরী অ্যানিকে দেখতে অপরূপা এক যুবতীর মত। বলতে গেলে প্রেস্টনের সমস্ত তরুণ, এমন কি বয়স্করাও তাকে কাছে পাবার জন্য দিক্‌বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন। এই সূত্রে কয়েকজনকে ডুয়েলেও মুখোমুখি হতে হল। ওই বয়সেই অ্যানি বুঝতো নিজের মুখশ্রীর মূল্য। সে নিজেকে যদি গাম্ভীর্যের আবরণে মুড়ে রাখতে পারতো তাহলে হয়ত এতটা বাড়াবাড়ি হত না। কিন্তু অ্যানি ছিল আজন্ম

বিকীর্ণ কামা। কিশোরী বয়স থেকেই সে নিজের দিকে আকর্ষণ করত পুরুষদের।

শ্রীমতী লিয়ন অত্যন্ত ঘাবড়ে গেলেন। তিনি বুঝতে পারলেন এখানকার বাস উঠিয়ে না দিলে মেয়ে একদিন হাতছাড়া হয়ে যাবে। তাছাড়া অন্নের সংস্থানও করা দরকার। অন্যত্র কাজকর্ম পাওয়া যেতে পারে। একদিন সকলের অলক্ষ্যে অ্যানিকে সঙ্গে নিয়ে তিনি প্রেস্টন থেকে অদৃশ্য হলেন। মাথা গোঁজার ব্যবস্থা হল ব্লাকফায়ারে। কিছুদিন অতিক্রান্ত হবার পর একই অবস্থা দাঁড়াল এখানেও। অ্যানির জন্য মারামারি লেগে গেল ওখানকার তরুণদের মধ্যে। স্তুতিবাদ আর উপহারের ছড়াছড়ি পড়ে গেল।

অ্যানি তখন অনেক কিছু বুঝতে শিখেছে। মা'র শাসনের মধ্যে থেকে কষ্টে জীবন কাটাবার সার্থকতা যে অর্থহীন তা ক্রমেই তার মনে গাঢ় হয়ে বসছে। অল্প দিনের মধ্যেই সে নিজের মন স্থির করে ফেলল নিজের অসামান্য রূপকে সম্বল করেই গা ভাসিয়ে দেবে সুষ্ঠুভাবে বাঁচার তাগিদে। এই সঙ্গে অ্যানি এও বুঝতে পেরেছিল, গা যদি ভাসাতেই হয় তাহলে এখানকার এই গেঁও পরিবেশ নয়—ইংলণ্ডের প্রাণকেন্দ্র লণ্ডনে। ওখানেই তার এই সুষমামণ্ডিত দেহের কদর হবে।

মা'র আওতা থেকে একরকম জোর করেই অ্যানি একদিন লণ্ডনের পথে পা বাড়াল। বিলাসবহুল দেশের এই প্রাণকেন্দ্রের রূপ দেখে সে স্তম্ভিত। কিভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবে প্রথমে ভেবে পেল না। কয়েক রাত কাটল নোংরা গলির মধ্যে ততোধিক কদর্য মানুষের সঙ্গে সহবাস করে। সে বুঝতে পেরেছে, দিনের পর দিন এই সমস্ত মানুষের কাছে নিজের দেহ দিতে থাকলে দুরারোগ্য ব্যাধি ছাড়া আর কিছু লাভ করা যাবে না। সুতরাং যে কোন উপায়ে উঁচু তলায় উঠতে হবে।

এই সময় সৌভাগ্যক্রমে ব্লাকফায়ারের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি লণ্ডনে ডাক্তারি করতেন। অ্যানিকে তিনি সহজেই নিজের সহকারির চাকরি দিলেন। ব্যবসায়ী বুদ্ধিসম্পন্ন এই ব্যক্তির ধারণা হয়েছিল, একজন সুন্দরী সহকারি পেলে তার রুগীর সংখ্যা বেড়ে যাবে। আর অ্যানির সান্ত্বনা হল, এখানে চাকরি করতে করতেই একজন পয়সাওয়ালা মানুষকে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলতে পারবে।

এখানে কিন্তু সে বেশিদিন টিকতে পারল না। কোন মক্কেল ধরা তো দূরের কথা। অতি বাস্তববাদী ডাক্তার তার যৌবন সম্পর্কেও সম্পূর্ণ নিস্পৃহ ছিলেন। কাজেই "টেম্পল অব হেলথ"-র কর্তা ডাঃ গ্রেহামের কাছে সে চাকরি নিয়ে চলে গেল। ডাঃ গ্রেহাম ধূর্ত প্রকৃতির মানুষ। তিনি অ্যানিকে প্রায় উলঙ্গ করে রুগীদের সামনে উপস্থিত করতেন। বলা বাহুল্য এতে তাঁর আয় বেড়ে গিয়েছিল। এইসঙ্গে সহকারিণীকে রাত্রে বিছানায় টেনে নিয়ে যাবার একটা ব্যবস্থাও তিনি রেখেছিলেন। অ্যানি অবশ্য ঠিক লক্ষ্যে পৌঁছাতে পাচ্ছে না বলে মনে খুঁত-খুঁতানি নিয়েই আছে।

মনের যখন এই রকম অবস্থা চলেছে তখন মিসেস লিয়নের একটি চিঠি মেয়েকে

উপর দিকে ঠেলে দেবার সহায়ক হল। মা মেয়েকে চিঠিতে যা জানালে তার সারমর্ম হল, নৌ-বিভাগের কর্মচারি অ্যানির কাকা গোলমেলে ব্যাপারে জড়িয়ে পড়ে জেলে আটক রয়েছেন। অ্যানি লণ্ডনে থাকে। অনেকের সঙ্গে নিশ্চয় আলাপ হয়েছে, সে যদি চেষ্টা করে কাকাকে ছাড়িয়ে আনতে পারে তাহলে ভাল হয়।

অ্যানি বেশ ভাবনায় পড়ে গেল। হোমরা-চোমরাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় থাকা দূরের কথা, ধারে কাছে পর্যন্ত পৌঁছাতে পারেনি। এ ক্ষেত্রে কাকাকে ছাড়িয়ে আনার ব্যাপারে কিছু করতে যাওয়ার কোন প্রশ্নই ওঠে না। ভবিষ্যতের ইঙ্গিত নিহিত ছিল বলেই বোধহয় সে প্রায় নিজেই ইচ্ছার বিরুদ্ধে তৈরি হল চেষ্টা চরিত্র করে দেখার জন্য।

পরের দিন পরিপাটি ভাবে সেজেগুজে সে নৌদপ্তরের সদরে গিয়ে পৌঁছাল। গমগম করছে চারিধার। চরম ব্যস্ততা নিয়ে লোকে এদিক-ওদিক যাচ্ছে। অ্যানি বিপন্নভাবে ইতস্ততঃ তাকাতে লাগল। কার কাছে কাকার সম্পর্কে খোঁজ খবর নেবে স্থির করতে পাচ্ছে না। ফিরে আসবে কিনা যখন ভাবছে ঠিক সেই সময় ক্যাপ্টেন পেন তাকে দেখতে পেলেন।

সুদর্শন এই যুবা অফিসারটি ওদিক দিয়েই যাচ্ছিলেন। অপরূপা মেয়েটিকে কুণ্ঠিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে থামলেন। নৌদপ্তরে মেয়েটি কি জন্য এসেছে এ কথা জানার আগ্রহ নিয়ে থেমেছিলেন। কয়েক পা এগিয়ে আসার পরই তাঁর মাথা ঘুরে গেল। মনে মনে তাঁকে স্বীকার করতেই হল, এমন রূপের বাহার আগে তাঁর চোখে পড়েনি। ক্যাপ্টেন পেন সাগ্রহে অ্যানির সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। তার কাকা যাতে তাড়াতাড়ি ছাড়া পান সে ব্যবস্থাও তিনি করলেন। তারপর যা অনিবার্য তাই ঘটল। ক্যাপ্টেন পেনের শয্যাসঙ্গিনী হল অ্যানি। এতদিনে তার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হল। লণ্ডনের উঁচু সমাজে কিছুটা জায়গা করে নিতে পেরেছে। পেন তাকে বিয়ে না করলেও স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে নিজের বাড়িতে রাখলেন। নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে তাকে নিয়ে যেতেন। বলনাচের আসরেও দু'জনের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যেতে লাগলো। অ্যানি ক্রমে ক্রমে অনেক কিছু শিখল। পরিণত হতে লাগল তার বুদ্ধি। কাজেই সে বুঝল, পেনকে আঁকড়ে থাকলেই জীবনে তার সব পাওয়া হল না। আরো পদমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে তার শিকারে পরিণত করতে হবে।

সুযোগ এসে গেল অচিরেই। এক সামাজিক অনুষ্ঠানেই আলাপ হল স্যার হ্যারি ফেদারষ্টোনের সঙ্গে। নাচের অবসরেই সে অনুভব করল স্যার হ্যারির তীব্র উত্তাপ। সুতরাং স্থির করে ফেলল এই নাইট প্রবরকেই সে অবলম্বন কববে। ক্যাপ্টেন পেন অনেক বলে কয়েও তার মত পরিবর্তন করতে পারলেন না। অ্যানি উপেক্ষার হাসি হেসে স্যার হ্যারির সঙ্গে চলে গেল সাসেক্সে। সাসেক্সের এই প্রখ্যাত জমিদার অ্যানিকে

উঁচু সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার ব্যাপারে অনেক কিছু করলেন। স্যার হ্যারির সঙ্গে রাত কাটাবার বিনিময়ে সে অনেক কিছু পেল। কিন্তু সময় যত এগুতে লাগল অ্যানিকে বিষণ্ণতা সাপটে ধরতে লাগল ততোই। সে অনেক উপরে উঠেছে সন্দেহ নেই, তবে লণ্ডনের চোখ ঝলসান জীবন থেকে দূরে, এই কাউন্টিতে জীবন কাটাবার কোন সার্থকতাই খুঁজে পাচ্ছে না। সুতরাং স্যার হ্যারির সঙ্গে আর নয়। লণ্ডন ফিরে যাবার একটা উপায় দেখতে হবে।

ভাগ্য তখন অ্যানির সহায়। অচিরেই উপায়ের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল। অনারেবল চার্লস গ্রেভিল স্যার হ্যারির অতি পরিচিত জনের মধ্যে একজন। চমৎকার চেহারার স্মার্ট ভদ্রলোক। অ্যানি তাঁকে খেলিয়ে তুলল। এত সমস্ত করার কোন প্রয়োজন ছিল না। কারণ, তিনি নারীলোভী ও সুবিধাবাদীদের একজন। অজস্র সুন্দরীদের নিয়ে তিনি ঘাঁটাঘাঁটি করেছেন। তবে কেউ বেশিদিন তাঁকে ধরে রাখতে পারেনি। মন ভরে গেলেই তিনি সংগ্রহ করেছেন আরেকজনকে।

প্রথম সুযোগেই দু'জনে লণ্ডনের পথে যাত্রা করল।

আবার অ্যানির আরম্ভ হল আনন্দোচ্ছল জীবন। তবে সে স্থির করেছে চার্লসকে আর ছেড়ে যাবে না। নিচু মহলের চেয়েও উঁচু সমাজে চাপ চাপ অন্ধকার যেন বেশি প্রকট। কাজেই তাঁর মত একজন রক্ষক থাকা দরকার। চার্লসের মনে কিন্তু তখন অন্য চিন্তা। অ্যানির সুন্দর স্বাদ তিনি প্রাণ ভরে নিয়েছেন। এখন তাকে ঘাড় থেকে নামিয়ে অন্য একজনকে সেখানে বসাবার তাগিদ অনুভূত হচ্ছে। তবে এই সুযোগে দু-পয়সা রোজগার করে নেবার লোভও উঁকি-ঝুঁকি মারছে মনে। এখন সেরকম একজনের দেখা পেলেই হয়।

একদিন চার্লস প্রশ্ন করলেন, তুমি ইতালি গেছো?

—আমি ইংলণ্ডের বাইরে কখনও যাইনি।

—নেপলসের নাম নিশ্চয়ই শুনেছো? চমৎকার জায়গা। ভাবছি তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ওখানে কয়েকদিন বেড়িয়ে আসব।

আনন্দে ঝলমলিয়ে উঠল অ্যানি। এতো তার পরম সৌভাগ্য। নেপলসের বিভোল জীবনের কথা কত শুনেছে এর-তার মুখে। ওখানে কেউ তাকে নিয়ে যাবে স্বপ্নেও ভাবেনি। চার্লস তাহলে তাকে আন্তরিকভাবে চায়। অ্যানি কি ভাবে বুঝবে চার্লসের মনে তখন বিশেষ এক পরিকল্পনা ভেসে বেড়াচ্ছে, অবশ্য সেই পরিকল্পনা রূপ নেবার পর অ্যানির ভালই হয়েছিল। নিজের চেষ্টায় জীবনে এত উঁচুতে উঠতে পারত না।

দু'জনে নেপলসে পৌঁছাল।

স্যার উইলিয়ামন হ্যামিলটন তখন সেখানে বৃটিশ সরকারের প্রতিনিধি। লণ্ডনের অভিজাত সমাজের এই প্রখ্যাত পুরুষটি রাজপরিবার ও পার্লামেন্টের আস্থাভাজন।

স্ত্রী-হীন স্যার উইলিয়ামের রমণীকুলে বিশেষ খ্যাতি। তাঁর সঙ্গ পাবার জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। আলোচনায় অনুমান করা হয়, কাকে তিনি শেষপর্যন্ত স্ত্রী হিসাবে গ্রহণ করবেন।

চার্লস নেপলস্ পৌঁছে স্যার উইলিয়ামের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করলেন। অ্যানিকে দেখে চোখ ধাঁধিয়ে গেল স্যার উইলিয়ামের। তিনি ঈর্ষাকাতর মন নিয়েই অনুসন্ধান করে দেখলেন, সে চার্লসের স্ত্রী নয়। এবার আশায় বুক বেঁধে প্রস্তাব পাঠালেন। এ রকমটা যে হবে চার্লস আগেই অনুমান করেছিলেন।

তিনি বললেন, আপনি মিস অ্যানিকে নাচের আসরে নিয়ে যেতে চান এতো সুখের কথা। প্রকৃতপক্ষে আপনাকে সঙ্গ দান করবার জন্যই তার এখানে আসা।

আপনার সৌজন্যতায় আমি মুগ্ধ। তবে—

—সমস্ত কিছু খোলসা করে বলাই ভাল। আমার বান্ধবীকে আপনার কাছে রেখেই আমি ইংলণ্ডে ফিরে যেতে চাই।

স্যার উইলিয়ামের মন আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠল।

—আপনি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। বিনিময়ে অবশ্যই আমি মোটা অর্থদাবী করব।

স্যার উইলিয়াম তাতে গররাজি নন। পাওনা-গণ্ডার কথা পাকাপাকি হবার পর চার্লস গ্রেভিল সরাসরি কথাটা পাড়লেন অ্যানির কাছে। সে তো শুনে অবাক। তার প্রেমিক তাকে অপরিচিত একজন লোকের ঘাড়ে চাপিয়ে সরে পড়তে চাইছে। চার্লস অবশ্য তাকে স্যার উইলিয়ামের বৈভব-মর্যাদা এবং অর্থের কৌলিন্যের কথা জানালেন। ওই সঙ্গে একথাও বললেন, চূড়ান্ত খামখেয়ালী ধরনের ওই লোকটি বিয়েও করে ফেলতে পারেন। এর চেয়ে ভাল বিষয় আর কি হতে পারে। অ্যানি চিন্তা করে দেখল, সত্যি এর চেয়ে ভাল আর কিছু হতে পারে না। সে রাজি হয়ে গেল। অবশ্য তার রাজি হওয়া না হওয়াতে কিছু যেতো আসতো না। টাকা পাবার সঙ্গে সঙ্গে চার্লস সরে পড়লেন নেপলস্ থেকে। স্যার উইলিয়াম সাদরে গ্রহণ করলেন অ্যানিকে। আদরে সোহাগে ভরিয়ে তুললেন তাকে। শেষপর্যন্ত চার্লসের অনুমানই সত্যি হল। তিনি তাকে লণ্ডনে নিয়ে গেলেন বিয়ের পাকা ব্যবস্থা করতে। এই সংবাদ প্রচারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে ওখানে হই হই পড়ে গেল। অ্যানির পূর্ব ইতিহাস তখন সকলেরই জানা হয়ে গেছে। স্যার উইলিয়ামের রুচিবোধ বিকৃত হতে লাগল। যেমন তেমন মেয়েকে নিয়ে রাত কাটানো যেতে পারে। ও সমস্ত নিয়ে উঁচু মহলের কোন মাথা ব্যথা নেই। তাই বলে বিয়ে! এ যে অসম্ভব কথা!

অনেকে তাঁকে বোঝালেন। একটি সাধারণ শ্রেণির মেয়ে— বিশেষ করে যাকে বহু পুরুষ ভোগ করেছে, সে কোন ঐতিহ্যশালী বংশের বধূ হতে পারে না। তাঁর আকাশ ছোঁয়া মর্যাদাও খান খান হয়ে যাবে এতে। তার যেমন চলছে চলুক, বিয়ে কখনই নয়।

কিন্তু তিনি অটল রইলেন এবং নির্দিষ্ট দিনেই প্রখ্যাত পুরুষটির সঙ্গে অখ্যাত মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেল। প্রকৃতপক্ষে নিজের কোন ব্যবস্থা করতে না পারলে বেশ্যাপল্লীতে ঘর নেবার জন্য তৈরি হয়ে যে লণ্ডনে এসেছিল, সেই অ্যানি শেষ পর্যন্ত লেডি হ্যামিলটন রূপে প্রতিভাত হল।

সে নিদারুণ খুশি। একটি সাধারণ মেয়ের পক্ষে আর কত মর্যাদা সংগ্রহ করা সম্ভব? তবে প্রগাঢ় ভাবে সে স্বামীকে ভালবাসতে পারল না, কেমন একটা সমীহভাবে দূরত্ব রচনা করে রইল। স্যার উইলিয়াম অবশ্য এত বুঝতে পারলেন না। ও সমস্ত নিয়ে মাথা ঘামাবার তাঁর দরকারও ছিল না। নেপলসে ফিরে অ্যানিকে নিয়ে তিনি বিভোর হয়ে রইলেন।

দিন এগিয়ে চলল। এক রকম রাণীর মত দিন কাটায় অ্যানি। এত ভোগ-বিলাস সহ্য করা যায় না। তবে তখনও তার জীবনের বৈচিত্র্যতার আরো কিছু বাকি ছিল। ঠিক এইরকম সময়েই পূর্ব কথিত পদ্ধতিতে ঐতিহাসিক সাক্ষাৎ ঘটল তার সঙ্গে নেলসনের। এতদিন পরে অ্যানির জীবনের প্রকৃত নায়ক এল।

ব্যর্থতার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে রয়েল প্যালেস থেকে ফিরে এলেন স্যার উইলিয়াম। রাজি করানো গেল না। নেপলস্ নিজের নিরপেক্ষতা ভেঙে ইংরাজদের সাহায্য করতে পারবে না। এবার এক অভাবনীয় ব্যাপার ঘটল। নেলসনকে অ্যানির এত ভাল লেগেছে যে রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা গলাতে সে প্রস্তুত হল। সে গেল নেপলসের রাণীর কাছে। তাঁর উপর একরকম জাদুর প্রভাব বিস্তার করে সে জীবনে প্রথমবার রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা গলিয়ে সাফল্য লাভ করল। নেপলস্ রাজি হল ইংরাজদের সাহায্য করতে। নেলসন এই রূপসী নারীর কর্মদক্ষতায় মুগ্ধ হয়ে গেলেন।

প্রাচ্যের দিকে আর নেপোলিয়ানের যাওয়া সম্ভব হল না। রসদ ও জলের সমস্যা মিটিয়ে নেলসন প্রচণ্ড বিক্রমে আক্রমণ করলেন তাঁকে। ইতিহাসের পাতায় রক্তের অক্ষরে লেখা আছে সে জলযুদ্ধের কথা। ফরাসিরা নিজেদের বহরের মুখ ঘুরিয়ে ফিরে গেল। ধন্য ধন্য পড়ে গেল নেলসনের।

এবার বীর সেনাপতি নেপলসে ফিরে এলেন লেডি হ্যামিলটনকে পরিপূর্ণভাবে অধিকার করবার আশা নিয়ে। তারপর আরম্ভ হল দু'জনের উদ্দাম জীবন। স্যার উইলিয়াম স্ত্রীর কাণ্ডকারখানায় স্তব্ধ হয়ে গেলেন। বাধা দেবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তাঁকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনল না অ্যানি। যৌনকলার সুনিপুণ শিল্পী নেলসন তাকে দিয়েছেন সম্পূর্ণ নতুন স্বাদ। সে তুচ্ছ বিবাহিত জীবনের বেড়াজালে আর আটকে থাকতে চায় না। ব্যাপার যে এতদূর গড়াবে স্যার উইলিয়াম ভাবতে পারেনি। আক্ষেপে নিজেকে জর্জরিত করতে করতে তিনি দেখলেন, অ্যানি তার প্রেমিকের হাত ধরে জাহাজে গিয়ে উঠল।

নেলসন লণ্ডন পৌঁছাবার পরই গেল গেল রব উঠল। বীরসেনাপতি অন্যান্য বারের মত এবার দেশবাসীর কাছ থেকে স্বতঃস্ফূর্ত অভিনন্দন লাভ করলেন না। সংবাদ রাষ্ট্র হয়ে পড়েছিল। অভিজাত পুরুষ থেকে সাধারণ মানুষ, বৃটিশ সাম্রাজ্যের অদ্বিতীয় সেনাপতির বারবণিতাকে নিয়ে ঢলাঢলি করাটা পছন্দ করল না। এর উপর আবার পরস্ত্রী হরণের ঘটনাও জড়িত রয়েছে। সংবাদপত্রে এই নিয়ে অনেক সরস রচনা প্রকাশিত হল। মন্ত্রীমহলেও এই প্রসঙ্গে কথার আদান-প্রদান চলতে লাগল। বিস্ময়ের বিষয় যাঁকে নিয়ে এত কাণ্ড তিনি কিন্তু নির্বিকার। কোন কথা গায়েই মাখছেন না। যত্রতত্র ঘুরে বেড়ান দু'জনে। প্রকাশ্যেই অ্যানিকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে তুলেছেন রক্ষিতা রূপে।

সুখের সাগরে অ্যানি ভাসছে। মনের গহনে এইরকম একজন পুরুষের আকাঙ্খাই ছিল তার। যথা সময়ে সে কন্যার জননী হল। কোন পুরুষই আজ পর্যন্ত তাকে সন্তানসম্ভবা করে তুলতে পারেনি। সে স্থির করেছে, নেলসন তাকে ত্যাগ না করলে বাকি জীবন এই সুখানুভূতির মধ্যেই কাটিয়ে দেবে। কিন্তু মানুষের সব ইচ্ছাই পরিপূর্ণ রূপ নিতে পারে না। আচম্বিতে এক দুর্যোগ অ্যানিকে উড়িয়ে নিয়ে গেল তাঁর বাঁধা ছকের জীবন থেকে অনেক দূরে।

নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে কয়েকটি ইউরোপীয় দেশের সঙ্গে কাঁধ মিলিয়ে ইংরাজরা ট্রাফালগারের রণক্ষেত্রে সমবেত হয়েছিল। এই যুদ্ধে অবিস্মরণীয় শৌর্য ও অসীম সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছিলেন নেলসন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নিজের জীবন রক্ষা করতে পারেননি। মৃত্যুর পূর্বে তিনি লিখিতভাবে জানিয়ে গিয়েছিলেন, তার প্রিয়তমা লেডি হ্যামিলটনকে তিনি রাজা ও দেশবাসীর হাতে দিয়ে যাচ্ছেন।

নেলসনের মৃত্যুর পর কিন্তু কেউই সহযোগিতার হাত এগিয়ে দিল না অ্যানির দিকে। তার রূপের মূল্য তখন এক কানাকড়িও কেউ দিতে চায় না। চতুর্দিকের উপেক্ষা আর বিদ্রূপ তাকে তাড়িয়ে বেড়াতে লাগল। স্বামীর পায়ে ধরে কাকুতি মিনতি করে যে একটু স্থান করে নেবে সে উপায়ও নেই। কারণ স্যার উইলিয়াম মারা গিয়েছিলেন।

ক্রমে আর্থিক অবস্থা চরমে উঠল। দেনার দায়ে চুল বিকিয়ে যাবার অবস্থা। শেষে পাওনাদাররাই তাকে জেলে পাঠাল। জেল থেকে বেরিয়ে আরো কিছু দুর্দশায় দিন কাটিয়ে অ্যানি যখন মারা গেল তখন তার বয়স একান্ন। অতিসাধারণ ভাবে দেহ বিক্রি করে যার জীবন কেটে যেতে পারতো—ভাগ্যের জোরে ইংলণ্ডের শীর্ষস্থানীয়দের অঙ্কশায়িনী হবার কৃতিত্ব সে অর্জন করেছিল। ওই সঙ্গে নিজের স্থান করে নিয়েছে ইতিহাসের পাতায়।

অস্কার ওয়াইল্ডের সমকামতত্ত্ব

ইংরাজি সাহিত্যের উজ্জ্বল রত্ন অস্কার ওয়াইল্ড নিজেকে যে ঘৃণ্য পরিবেশে এনে ফেলেছিলেন সাহিত্যের ইতিহাসে তা এক দূরপনেয় লজ্জাকর কাহিনী হিসাবে আবহমানকাল চিহ্নিত হযে থাকবে। সেই রক্ষণশীল ভিক্টোরিয় যুগে একজন নবীন বিখ্যাত সাহিত্যিক আলফ্রেড ডাগলাস নামে এক তরুণের সঙ্গে অবৈধভাবে মেলামেশা করেন নিঃসন্দেহে তা এক অবিশ্বাস্য ঘটনা। বলা বাহুল্য এটিই তখন লণ্ডনে সর্বাপেক্ষা মুখরোচক কলঙ্ক কাহিনী।

প্রথম থেকেই এবার আরম্ভ করতে হয়। আইরিস বংশজাত অস্কার ১৮৫৬ খৃষ্টাব্দের ১৫ই অক্টোবর ডাবলিনে জন্মগ্রহণ করেন। কৃতী ছাত্র হিসাবে তাঁর সুনাম ছিল। কুড়ি বছর বয়সে অক্সফোর্ড থেকে স্নাতক হয়ে তিনি অবতীর্ণ হলেন জীবন-সংগ্রামে। চাকরি করবেন না। সাহিত্যকে বেছে নিয়েছেন পেশা হিসাবে। সলিসবারি স্ট্রীটে বাসা বাঁধলেন এবং নিজের আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব ও চমৎকার বাচনভঙ্গীর জোরে মিশে গেলেন লণ্ডনের উঁচু সমাজে।

অল্প কিছুদিন পরেই দেখা গেল, ডিউক অব নিউক্যাসল, ডাচেস অব ওয়েস্ট মিনিস্টার, হাণ্টার ব্লেয়ার প্রভৃতি প্রখ্যাত ব্যক্তিরা অস্কারের ঘনিষ্ঠ বন্ধু। এমন কি কয়েকটি নাটক প্রকাশিত হবার পর তিনি বেশ বিখ্যাত হয়ে পড়েছেন। আশানুরূপ অর্থ হাতে না এলেও সময় বেশ ভালভাবেই কেটে যাচ্ছিল।

১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে তাঁর সঙ্গে আলাপ হল কুইন্স কাউন্সেলর স্বর্গীয় হোরেস লয়েডের মেয়ে কন্সটানসের। তারপরই দু'জনে গভীর প্রেমে ডুবে গেলেন। অস্কারের মন কিন্তু খুঁতখুঁত করছিল, ছাত্রজীবন থেকেই তিনি বেশ্যালয়ে যাওয়া আসা করছেন। ফলস্বরূপ সিফিলিস রোগ তাঁর শরীরে বাসা বেঁধেছে। এ সমস্ত কথা কন্সটানসকে না জানালে তার প্রতি অবিচার করা হয় ভেবে তিনি শান্তি পাচ্ছিলেন না।

শেষ পর্যন্ত অস্কার বললেন সমস্ত কিছু। কন্সটানস্ অত্যন্ত সহৃদয়া মহিলা ছিলেন। প্রেমিকের এই ন্যক্কারজনক কার্যাবলীকে তিনি বিশেষ গুরুত্ব দিলেন না। অতীতকে ভুলে গেলেই আগামী জীবনের শান্তি বজায় থাকবে এই হল তাঁর সারকথা। ওই বছর মে মাসে প্যাডিং টনের সেণ্ট জেমস চার্চে দু'জনের বিয়ে হয়ে গেল। টাইট স্ট্রীটের বাড়িতে সংসার সাজিয়ে বসলেন স্বামী-স্ত্রী। আরম্ভ হল তাঁদের উদ্দাম প্রেমময় জীবন।

১৮৯০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত অস্কার ওয়ালইল্ডের জীবন চমৎকার খাতেই বইল বলা চলে। প্রেমময়ী স্ত্রী, দুটি সন্তান, ওম্যান ওয়ার্লড পত্রিকার সম্পাদকত্ব, বই ও পত্রিকায় বহু রচনার আত্মপ্রকাশ—স্বচ্ছল অবস্থা ইত্যাদি। এইভাবেই বাকি জীবনটা তাঁর কেটে যেতে পারতো। কিন্তু তা হবার নয়। মনস্তাত্ত্বিকরাই বলতে পারবেন, প্রতিভাধররা বিচিত্র সমস্ত নোংরামির মধ্যে কেন নিজেদের এনে ফেলেন? এই বছরই প্রকাশিত হয় তাঁর দি পোর্ট্রেট অব মিঃ ডাব্লু এইচ। সমকামিতার উপর তাঁর প্রথম রচনা। অস্কার বলতে চেয়েছেন, শেক্সপিয়ার উইল হিউতেস নামে একজন অভিনেতার প্রতি কামপ্রবণ ছিলেন।

এই রচনা কোন বহুল প্রচ রিত পত্রিকায় প্রকাশিত না হওয়ায় তেমন সোরগোল উঠল না। কিন্তু পরের বছর যখন এক মার্কিন প্রকাশকের মাধ্যমে "পিকচার্স অব ডোরিয়ান গ্রে" প্রকাশিত হল তখন ভিক্টোরিয় যুগের রক্ষণশীল ইংরাজরা গেল গেল রব তুলল। লেখক স্বয়ং যে সমকামী সে সম্পর্কে আর কারুর সন্দেহ রইল না। তৎকালের বিদগ্ধ ও প্রথম শ্রেণির মিথ্যাবাদী ফ্র্যাঙ্ক হ্যারিস নিজের সুচিন্তিত মত দিলেন, "অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করার সময় থেকেই সুশ্রী ছেলেদের পিছনে অস্কার ওয়াইল্ডের ছোটা অভ্যাস ছিল।"

কবে থেকে তিনি সমকামিতায় দীক্ষিত হয়েছিলেন তা সঠিকভাবে জানা না গেলেও আলফ্রেড ডাগলাসের সঙ্গে অবৈধ জীবনের কথা তিনি চেপে রাখতে পারেননি। তখনকার লণ্ডনে এ এক বহুল প্রচারিত মুখরোচক কাহিনী ছিল। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দের এক সন্ধ্যায় কবি কলিওনেল জনসন ডাগলাসের সঙ্গে অস্কারের পরিচয় করিয়ে দেন। বয়স তখন মাত্র একুশ। দেখলে ষোলর বেশি মনে হয় না। অনিন্দ্য সুন্দরী তরুণীর মত তার মুখশ্রী অস্কারের মনে আলোড়ন আনল। প্রথম দর্শনেই বলতে গেলে তিনি হৃদয় হারালেন।

আলফ্রেড ডাগলাস সাধারণ ঘরের ছেলে ছিল না। কুইন্সবেরি অষ্টম মার্কুইসের সে পুত্র। সুতরাং ওই অল্প বয়সেই সে নিজের নামের আগে লর্ড ব্যবহার করবার অধিকারী ছিল। সে অস্কারের কুৎসিত আমন্ত্রণে সাড়া দিয়েছিল কিনা জানা যায় না। মোট কথা এই পরিচয়ের অল্প কয়েকদিন পর থেকে দু'জনের অবৈধ জীবন আরম্ভ হয়ে যায়। দু'জনে প্রেমিক-প্রেমিকার মত ঘুরে বেড়াতেন। হোটেলে ঘর ভাড়া নিয়ে রাত কাটাতেন দু'জনে একসঙ্গে।

এই বিশ্রী ব্যাপারটা অচিরেই কুইন্সবেরি জানতে পারলেন। তিনি মাথা গরম ও আধপাগলা ধরনের মানুষ। রাগে আগুন হয়ে ছেলেকে ভীষণ বকাবকি করলেন। এবং শেষে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, অস্কারের সঙ্গে আর দেখা-সাক্ষাৎ করা চলবে না। ডাগলাসের শরীরে কুইন্সবেরির রক্তই বইছে। রাগ ও জেদ তারও কিছু কম

নেই। সে সরাসরি বাপের আদেশকে অগ্রাহ্য করল। কামাতুরা রমণীর মত অবাধে অস্কারের সঙ্গে অবৈধ কার্যকলাপ চালিয়ে যেতে লাগল।

শেষে কুইন্সবেরি অস্কারের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। রাগতভাবে বলে গেলেন অনেক কিছু। তাঁর তীক্ষ্ণ প্রশ্ন হল, স্যাভয় হোটেল থেকে বিশ্রী কাণ্ড-কারখানার জন্য ডাগলাস ও অস্কারকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে কিনা?

—কখনই না।

—আপনি ডাগলাসের জন্য পিকাডেলিতে আলাদা ঘর নিয়েছেন?

অস্কার শান্ত গলায় বললেন, লর্ড কুইন্সবেরি, আপনি কি সত্যি আমাদের অসদাচরণের জন্য অভিযুক্ত করছেন?

—আপনাদের ভাব-ভঙ্গী সেই রকমই মনে হয়। যা-হোক আর কোনদিন আপনাদের দু'জনকে একসঙ্গে দেখলে ফল ভাল হবে না।

—আইন আমি জানি না, তবে অস্কার ওয়াইল্ডের আইন হল অপরাধীকে দেখা মাত্র গুলি করো—তারপর চাকরের দিকে ফিরে বললেন, এই লোকটা মার্কুইস অব কুইন্সবেরি। লণ্ডনের সর্বনিকৃষ্ট জীব। একে কোনোদিন বাড়িতে ঢুকতে দেবে না।

অপমান আর রাগে কাঁপতে কাঁপতে কুইন্সবেরি বেরিয়ে এলেন ওখান থেকে। অস্কার ধারণাই করতে পারলেন না, এইভাবে নিজের কবর নিজেই খুঁড়লেন। যা হবার হয়ে গিয়েছিল। তিনি যদি কুইন্সবেরির সঙ্গে ঠাণ্ডা মাথায় কথা বলতে পারতেন—ডাগলাসের সঙ্গে সম্পর্ক যদি চিরদিনের মত শেষ করে দিতে পারতেন তাহলে এই মানুষটি অবজ্ঞা, উপেক্ষা, রাজরোষ আর কলঙ্কের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বিদেশে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করতেন না। বরং রাজকীয় নাইট-হুড উপাধি লাভ করে চূড়ান্ত স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে সুন্দরী পত্নীর সঙ্গে দিন অতিবাহিত করতে পারতেন।

যা হোক, ডাগলাস-জনক এবার উঠে পড়ে লাগলেন। এবং ছেলেকে অনেক বুঝিয়ে কায়রোতে লর্ড ক্রোমায়ের কাছে পাঠিয়ে দিলেন। ডাগলাস মনমরা অবস্থাতেই ওখানে দিন কাটায়। তার অবস্থা অনেকটা বিরহী প্রেমিকার মত। শেষে সে প্যারিসে পালিয়ে গেল এবং ওখান থেকে আবার লণ্ডনে এল। অস্কার সাদরে গ্রহণ করলেন তাকে। অভিমানে কেঁদে ভাসিয়ে দিল ডাগলাস। তারপর দু'জনের আবার আরম্ভ হল উদ্দাম সমকামিতা।

লণ্ডনের উঁচু সমাজ ভালরকমই ব্যাপারটা জেনে ফেলেছেন। চতুর্দিক ছি-ছি-ক্কার পড়ে গেল। স্ত্রী কন্সটান্স লজ্জায় আর ঘৃণায় নুয়ে পড়েছেন। মুখ দেখাতে পারছেন না কারুর কাছে। তিনি দুই ছেলেকে নিয়ে আলাদা হয়ে গেলেন। অস্কারের কোন

দিকে দৃষ্টি নেই—পাগলের মত আঁকড়ে আছেন ডাগলাসকে।

কুইন্সবেরি দমে থাকবার লোক নন। তিনি একগাদা পচা টমেটো নিয়ে ছুটে গেলেন জেমস থিয়েটারে। যেখানে অস্কারের নাইট চলছিল। নাট্যকারকে পচা টমেটো ছুঁড়ে মারবেন এই ছিল পরিকল্পনা। কিন্তু সফল হলেন না। কারণ তাঁকে ঢুকতে দেওয়া হল না। কিছু মাত্র না দমে অন্যপথ ধরলেন। একটি অপমান সূচক চিঠি লিখে রেখে এলেন অস্কার যে ক্লাবে যাওয়া আসা করেন সেখানে।

যথা সময়ে সেই চিঠি অস্কার ওয়াইল্ডের হাতে এসে পড়ল। রাগে কাঁপতে লাগলেন তিনি! এবং স্থির করে ফেললেন, কোর্টে ওই বজ্জাত বুড়োর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা আনবেন। বলতে গেলে এই সংকল্প করার সঙ্গে সঙ্গে নিজের ভবিষ্যৎকে তিনি ঘোর অন্ধকারের মধ্যে ডুবিয়ে দিলেন। তাঁর নন্দনতাত্বিক সূক্ষ্ম মন চিরদিনের মত ছত্রখান হতে চলল।

যথা সময়ে মামলা কোর্টে উঠল।

অস্কার সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন, কুইন্সবেরির বিচিত্র চালে তিনিই ধরাশায়ী হয়েছেন। তিনি মানহানির মোকদ্দমা এনেছিলেন, কিন্তু দেখা গেল সমস্ত চাপটা তাঁরই উপরে এসে পড়েছে। কুইন্সবেরির ব্যবহারজীবি এডওয়ার্ড কারসন নিজের মক্কেলের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ অস্বীকার করলেন না। তবে এই কাজ তিনি কেন করেছেন তার সমর্থনে কোর্টের অজস্র মানুষের সামনে প্রাঞ্জল ভাষায় অস্কার ও ডাগলাসের সমকামিতার কথা প্রকাশ করলেন। সুতরাং একজন বাপের পক্ষে, তাঁর ছেলে যে অধঃপাতে নিয়ে যাচ্ছে তার সম্পর্কে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়া অস্বাভাবিক কিছু নয়।

অস্কারের শুভানুধ্যায়ীরা চিন্তিত হলেন—কেস্ তুলে নেবার কথা বললেন। কেউ কেউ তাকে অনুরোধ করলেন ইংলণ্ড ছেড়ে চলে যেতে। তিনি নিমরাজিও হয়েছিলেন। কিন্তু বাধ সাধল ডাগলাস। তাঁর বক্তব্য হল, এ হচ্ছে সম্মানের লড়াই। তার বাবা কখনই প্রমাণ করতে পারবে না তাদের অবৈধ সম্পর্কের কথা। সুতরাং কেস্ তুলে না নেওয়াই হল বুদ্ধিমানের কাজ।

কার্যক্ষেত্রে অন্যরূপ দেখা গেল। তাঁর বিরুদ্ধে বহু সাক্ষী সংগ্রহ করেছেন কুইন্সবেরি। মামলার অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠল। অগত্যা অস্কার ইংলণ্ড ত্যাগ করাই মনস্থ করলেন। ব্যাঙ্ক থেকে সমস্ত টাকা তুলে নিয়ে তিনি যখন জাহাজে চড়বার আয়োজন করছেন ঠিক তখনই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হল। কুইন্সবেরি পাল্টা অভিযোগ এনেছেন ব্যভিচারের। এবার তাঁকে আসামীর কাঠগড়ায় গিয়ে দাঁড়াতে হল।

নিয়মাফিক কেস্ চলতে থাকলেও কারুর বুঝতে বাকি ছিল না, যেভাবে কেস্

সাজানো হয়েছে তাতে অস্কারের রেহাই নেই। শেষ পর্যন্ত হলও তাই। পুরুষের সঙ্গে ব্যভিচার করার অপরাধে তিনি দু' বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। আলফ্রেড ডাগলাস শনির মত উদয় হয়ে তাঁর জীবনের মান, সম্মান, প্রতিভার মূল্য সমস্ত কিছুকে ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দিল একথা সেদিন ভেবেছিলেন কিনা জানা যায় না। তবে এটাও ঠিক একা ডাগলাসকে দোষ দেওয়া যায় না। তাঁর মত প্রতিভাবান পুরুষই বা কেন ওই ছোকরার জন্য এমন আত্মহারা হয়ে পড়েছিলেন? কিসের অভাব ছিল তাঁর—সুন্দরী-প্রেমময়ী স্ত্রী, অসংখ্য অভিজাত যুবতীর সঙ্গদান করার ফলাও ব্যবস্থা—তা সত্ত্বেও সমকামিতায় এত ব্যগ্রতার হেতু কি? মনস্তত্ত্বের গলিতে যাঁরা ঘুরে বেড়ান, মনে হয় তাঁরাই এর উত্তর দিলেও দিতে পারবেন।

দু'টি বছর হাড়ভাঙা খাটুনির পর ইংরাজি সাহিত্যের প্রখ্যাত নাট্যকার অস্কার ওয়াইল্ড বেরিয়ে এলেন জেল থেকে। সেই স্মরণীয় তারিখটি হল ১৯শে মে, ১৯০০ খৃষ্টাব্দ। লণ্ডনের জনারণ্যের মধ্যে এসে দাঁড়িয়ে অস্কার বুঝতে পারলেন, গুটিকয়েক বন্ধু ছাড়া তাঁর আর কেউ নেই। মাথা উঁচু করে চলার অধিকার তিনি হারিয়েছেন। বাকি জীবন ঠাট্টা-বিদ্রূপের ভারেই নুয়ে থাকতে হবে।

সুতরাং লণ্ডনে আর নয়, ইংলণ্ডেও নয়—তিনি বৃটিশ দ্বীপপুঞ্জ থেকে চিরবিদায় নেবেন। অভিমান হত মনে সত্যি তিনি তাই করলেন। বন্ধু-বান্ধবদের সামান্য আর্থিক সহযোগিতার উপর নির্ভর করে চলে গেলেন ফ্রান্সের কার্ণিভালে। প্রথম দিকে সেখানে তাঁর সময় ভালই কাটছিল। জেলের অভিজ্ঞতা নিয়ে চমৎকার একটি কাব্যও লিখে ফেললেন।

কিন্তু তারপরই কেমন সব এলোমেলো হয়ে গেল। ডাগলাসকে কাছে পাবার জন্য তিনি প্রায় উন্মাদ হয়ে উঠলেন। পত্রে যোগাযোগ ছিল, সেই সূত্রেই তিনি জানতে পেরেছিলেন, ডাগলাস নেপলস্ যাচ্ছে। সুতরাং আর কার্ণিভালে থাকতে পারলেন না, ছুটলেন নেপলসের দিকে। তাঁর একবারও মনে হল না, এই ছেলেটির জন্যই তিনি মান-সম্মান খুইয়ে দেশ ছাড়া হয়েছেন। এবং এর সঙ্গে আবার সম্পর্ক গাঢ় করলে আরো দুর্বিপাকের ঘূর্ণিপাকে ঘুরতে হবে।

নেপলসে দেখা হল দু'জনের। প্রেমিক-প্রেমিকার মিলন হল যেন। ডাগলাস আবার নিজেকে বিলিয়ে দিল অস্কারের হাতে। প্রথমে দু'জনে হোটেলে গিয়ে উঠেছিলেন। তারপর একটা ভিলা ভাড়া করে স্বামী-স্ত্রীর মত বাস করতে লাগলেন। স্থানীয় লোকেরা দু'জনের কাণ্ড-কারখানায় হতবাক হয়ে গেল।

এই কথা চাপা থাকার নয়। অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই লণ্ডনের সুধী মহল জানতে পারলেন এই ন্যাক্কারজনক ধারাবাহিক কার্যকলাপের কথা। অস্কারের বন্ধুরা বিশেষ

যাঁরা তাঁকে অর্থ সাহায্য করে থাকেন তাঁরা বিশেষ বিরক্ত হলেন। কারণ তাঁরা বিদ্রূপ-বাণে আক্রান্ত হচ্ছিলেন বেশি।

তাছাড়া অলিখিত একটা শর্তও ছিল। ডাগলাসের সঙ্গে অস্কার কোন সম্পর্ক রাখবেন না, তবেই তাঁর গ্রাসাচ্ছানের মোটামুটি ব্যবস্থা চালিয়ে যাওয়া হবে। তাঁরা অস্কারকে চিঠি দিলেন—সাবধান বাণী উচ্চারণ করলেন। কিন্তু কোনই ফল হল না। অস্কার ওয়াইল্ড তখন উন্মত্ত।

ইদানিং লেখাও তাঁর কমে এসেছিল। তাছাড়া যে কেচ্ছার বোঝা ঘাড়ে নিয়ে তিনি জেলে গিয়েছিলেন তাতে প্রকাশক পাওয়াও দুষ্কর। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে এই সময় জেলের অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখা কাব্য গ্রন্থটির প্রকাশক পাওয়া গেল। দুঃসাহসিক প্রকাশক জেনে শুনেই ঝুঁকিটা নিলেন। লোকে যে যাই বলুক, বই কিন্তু কয়েক হাজার কপি বিক্রি হয়ে গেল।

অস্কারের মনোভাব তখন এই রকম ছিল, ভয় অমূলক। লিখতে পারলেই প্রকাশক পাওয়া যাবে এবং বই বিক্রি হবে। কাজেই অর্থ প্রাপ্তিতে কোন অসুবিধা হবে না। তাছাড়া ডাগলাস মোটা মাসোহারা পায়। দু'জনের বেশ আরামেই দিন অতিবাহিত হবে। সুতরাং বন্ধুরা যদি সাহায্য না করতে চায়, না করুক। তিনি ডাগলাসকে ছাড়বেন না।

তবে তিনমাস যেতে না যেতেই বুঝতে পারলেন হিসাবে কি বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে। মাস দু'য়েক ডাগলাসের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক খুবই মধুর ছিল। তারপর সমস্ত কেমন বেসুরে বাজতে লাগল। দু'জনের সম্পর্কের মধ্যে বিরাট ফাটল দেখা দিল। অবশ্য এর জন্য দায়ী [illegible] ডাগলাসই। বয়স বেড়ে যাওয়ার জন্যই বোধহয় সমকামিতায় তার আগ্রহের অভাব দেখা দিয়েছিল। তাছাড়া তার লণ্ডনে ফেরা দরকার। এইভাবে মাসের পর মাস বিশ্রী কাজ-কারবার চালিয়ে গেলে মাসোহারা হয়ত নিয়মিত আসতে থাকবে না।

তৃতীয়মাসের শেষের দিকে দারুণ ঝগড়াঝাটি হতে লাগল দু'জনের মধ্যে। অস্কার অসহায় ভাবে চিন্তা করলেন, শুধুমাত্র এই ছেলেটির জন্যই তিনি কোথা থেকে কোথায় নেমে এসেছেন, আজ সে এটুকুও বুঝতে চাইছে না। সত্যি ডাগলাস তাঁকে ছেড়ে চলে গেল। অস্কার তখন বিষণ্ণ ভাবেই বলেছেন "It was the most bitter experience of bitter life."

ডাগলাসের সঙ্গে দীর্ঘ সুমধুর সম্পর্কের উপর এখানেই যবনিকা পড়ে গেল। জীবনে আর দুজনের দেখা হয়নি। অস্কার তার প্রতি তীব্র আকর্ষণ অনুভব করতেন—কেন যে এই অসমকামের উপর গভীর দুর্বলতা তা তিনি নিজেও জানতেন না। অথচ এই কদর্যতাকে এড়িয়ে যেতে পারলে তাঁর সৃজনশীল বৈদগ্ধ

সমকালীন বার্ণাড শ ও এইচ, জি ওয়েলসের মতই যথাযোগ্য সম্মান লাভ করত।

আর নেপলসে থাকার কোন মানে হয় না। তিনি ভাঙা মন নিয়ে প্যারিসে চলে এলেন। এখন মর্মে মর্মে বুঝতে পারলেন, হিতাকাঙ্ক্ষী বন্ধুদের কথা না শুনে তিনি কত বড় ভুল করেছেন। মুখে যাই বলুন লেখার ক্ষমতা আর তার নেই। পুরানো সিফিলিস রোগটা আবার চাগিয়ে উঠেছে। মদে চুর হয়ে থাকেন। প্যারিসে তখন তিনি এক উপহাসের বস্তু। সময় সময় বেয়ারারাও দূর-দূর করে তাঁকে হোটেলের দরজা থেকে তাড়িয়ে দেয়।

অনেক অভিমান, অনেক আঘাত পাওয়া এই পোড় খাওয়া মানুষটি আর যেন নিজের জীবনকে টেনে নিয়ে যেতে পাচ্ছিলেন না। এই সময় এক হোটেলওয়ালা এই কপর্দকশূন্য ব্যক্তির জন্য যে সহানুভূতি দেখিয়েছিল তার বুঝি তুলনা হয় না। লণ্ডনে খবর পৌঁছাল অস্কারের জীবনের আশা ক্ষীণ হয়ে আসছে। বন্ধুবর রবার্ট রস ছুটে এলেন। দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা হল। কিন্তু তখন সব কিছুর বাইরে তিনি।

১৯০৭ খৃষ্টাব্দের ৩০ শে নভেম্বর বেলা দু'টোর সময় বিশ্বের প্রখ্যাত সাহিত্যিক ও নাট্যকার অস্কার ওয়াইলড পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন।

বিষণ্ণ প্রেমিক টলষ্টয়

টলষ্টয় ভোজন কক্ষে প্রবেশ করলেন।

স্ত্রী সোফিয়া এভ্রিভনা, তাঁর মেয়েরা, সেক্রেটারি ও দু'জন বন্ধু সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। শার্শির মধ্যে দিয়ে দেখা যাচ্ছে, শীতের সকালের উপর হাল্কা রৌদ্র ছেয়ে রয়েছে। তিনি আসন গ্রহণ করতেই সেক্রেটারি একরাশ চিঠি, বই, পত্রিকা তাঁর সামনে রাখল।

টলষ্টয় বিরক্তিপূর্ণ দৃষ্টিতে ওই স্তূপের দিকে তাকিয়ে বললেন, "যত গোলমাল, যত চিত্ত বিক্ষেপ! পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমাদের এরকমভাবে ঘুরপাক খাওয়া উচিত নয়। নির্জনে বসে ভগবানের সঙ্গে যোগাযোগ ঘটাবার সুযোগ আমাদের পেতে হবে। এই কাগজের স্তূপকে আগুনে পুড়িয়ে মুক্ত স্বাধীন হতে পারলে বেঁচে যাই।"

একথা বললেও কৌতূহলেরই শেষ পর্যন্ত জয় হল। চিঠিগুলো একে একে খুলে চোখ বুলিয়ে যেতে লাগলেন—কোনটায় প্রার্থনা, কোনটায় নালিশ, কোনটায় প্রশস্তি, কোনটায় সাক্ষাতের অনুমতি প্রার্থনা, কোনটায় অর্থহীন প্রলাপ।

টলষ্টয় নিজের মনেই বললেন, "কাকে আমি সাহায্য করতে পারি? নিজেকেই আজ পর্যন্ত কতটুকু সাহায্য করতে পারলাম? প্রতিদিন তো ভুল করছি, অন্যায় করছি—"

সেক্রেটারি স্মরণ করিয়ে দিল, 'টাইমস' কাগজের সংবাদদাতা দেখা করার অনুমতি চেয়েছেন।

—বার বার এই অনুরোধ কেন? কি চায় তারা? আমার প্রতি তাদের এ কৌতূহল কেন?

তারপর শান্ত গলায় বললেন, বেশ, আধ ঘণ্টার জন্য আসতে বলো।

আর কারুর সঙ্গে কোনো কথা বললেন না। অল্প কিছু খেয়ে বেরিয়ে এলেন ওখান থেকে। সিঁড়ি দিয়ে দ্রুত বাগানে নেমে এলেন কাউন্ট টলষ্টয়। বয়স হয়েছে কিন্তু এখনও যথেষ্ট তাজা আছেন। একজন সহিস তাঁর প্রিয় ঘোড়া ভেলিরকে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল। অবলীলায় ভেলিরের পিঠ চড়ে বসলেন তিনি। তারপর তাঁকে ছোটালেন ব্যক্তিগত বনভূমির দিকে। যৌবনের এই বিলাস তাঁর আজও বজায় আছে।

বনভূমি ও নিজের বিশাল চাষযোগ্য জমির ধারে ধারে ভেলির পিঠে অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়িয়ে তিনি ফিরে এলেন। লেখায় মন বসাবার চেষ্টা করলেন কিন্তু বসল না। হঠাৎ খেয়াল হল অনেক বেলা হয়েছে। আবার এলেন ভোজন কক্ষে।

যেখানে কাউন্টপত্নী ছেলে-মেয়েদের নিয়ে অপেক্ষা করছিলেন। টেবিলে আর যাঁরা ছিলেন, তাঁরা হলেন, সেক্রেটারি, গৃহচিকিৎসক, ফরাসি ও ইংরাজ শিক্ষয়িত্রী এবং কয়েকজন প্রতিবেশি। নিজের চেয়ারে টলষ্টয় বসার সঙ্গে সঙ্গেই ঝলমলে পোশাক পরা খানসামারা খাবার পরিবেশন আরম্ভ করল। তিনি নিরামিষ খেয়ে থাকেন। এই নিরামিষ খাবার বহু ব্যয়ে, বহু যত্নে প্রস্তুত করা হয়ে থাকে।

টলষ্টয় খাওয়া আরম্ভ করার আগে পত্নীর মুখের দিকে তাকালেন। অনেক বুড়ো হয়ে গেছে। চুলে রূপালি আভা। কপালের চামড়া কুচকে গেছে। এই নারী যৌবনে ছিল সদা হাস্যময়ী—নির্মল কুমারীত্ব নিয়ে এসেছিল সে তাঁর ঘরে। সে কতদিনের কথা—প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর হল বইকি। তিনি তখন পাপে কলুষিত পরিণত যুবা। তারপর একে একে তেরটি সন্তানের জনক হয়েছেন।

ছেলে-মেয়েদের দিকে টলষ্টয় তাকালেন। প্রত্যেকের মুখে বিরক্তিকর ছাপ। তাদের ধারণা যৌবনের সমস্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য থেকে বঞ্চিত হয়ে রয়েছে তারা দর্পিত জনকের জন্য। তারা কেউ তাকে পছন্দ করে না। টলষ্টয়ের মনে হল, তাঁর এবার পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়াই উচিত। অনেকদিন বেঁচে আছেন।

খেতে আরম্ভ করলেন তিনি। খানসামা আরেকটি পাত্র এনে রাখল তাঁর সামনে। ফলের উপর বরফ দিয়ে দুধের সর জমান অতি উপাদেয় খাদ্য। বিরক্তির সঙ্গে পাত্রটি সরিয়ে রাখলেন তিনি।

দ্রুত গলায় কাউন্টপত্নী বললেন, খাবার ভাল হয়নি কি?

গম্ভীর গলায় উত্তর দিলেন টলষ্টয়, এত ভাল হয়েছ যা আমার পক্ষে একটু অতিরিক্তই—।

খাওয়া শেষ করে তিনি বাগানে এলেন। এলেন গাছটার তলায়। বহু দর্শনার্থী অপেক্ষা করছিল সাগ্রহে। প্রত্যেক দিনই এইরকম জনসমাবেশ এখানে হয়। তাদের সঙ্গে কথাবার্তা বললেন কিছুক্ষণ টলষ্টয়। তারপর ফিরে গেলেন নিজের ঘরে। বিশ্রাম করলেন কিছু সময়। তারপর লিখতে বসলেন। লেখায় কিন্তু মন বসাতে পারলেন না।

সন্ধ্যা হয়ে এল।

উপবেশন কক্ষে এসে তিনি গা এলিয়ে দিলেন সোফায়। পরিবারস্থ সকলেই সেখানে উপস্থিত রয়েছেন। বাইরের কয়েকজনও আছেন। গোল্ডেনভাইসর জানতে চাইলেন, কিছু বাজিয়ে শোনাবেন কিনা। সম্মতি দিলেন টলষ্টয়। বাজনা

আরম্ভ হল। তিনি তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন। একসময় বাজনা থামল। ছোট ছেলের মত তিনি হাততালি দিয়ে উঠলেন।

যথা সময় রাত্রি এল। আহার পর্ব শেষ করে নিজের ঘরে এসে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন। টেবিলের উপর ডায়রি খোলা অবস্থায় রয়েছে। সমস্তদিনের হিসাব নিকাশ এবার করবেন। ধীরে ধীরে টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন। লিখতে আরম্ভ করলেন একাগ্র মনে।

একসময় লেখা শেষ হল। ডায়রিতে অকপটে সমস্ত কিছু লেখা তাঁর দীর্ঘদিনের অভ্যাস। ডায়রি বন্ধ করতে গিয়েও থামলেন। পরের পাতায় আগামী দিনের তারিখ দিয়ে, তার নিচে ইঙ্গিতপূর্ণ তিনটি কথা একটু বড় বড় করে লিখলেন—'যদি কাল বাঁচি'।

সেদিনের মত কাজ শেষ হল। আর একদিন বেঁচে রইলেন সর্বকালের প্রখ্যাত কথাশিল্পী লিও টলস্টয়। বিছানায় গিয়ে আশ্রয় নিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম দু'চোখ পাতা ভারি করে তুলতে লাগল। কিন্তু হঠাৎ কিসের শব্দে ঘুমটা ভেঙ্গে গেল। কে যেন পাঠকক্ষে সন্তর্পণে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

বিছানা ছেড়ে উঠে, দরজার কাছে এসে টলস্টয় সবিস্ময়ে দেখলেন, সোফিয়া এণ্ড্রিভনা,—তাঁর পত্নী, ডায়রির পাতা থেকে চোখ সরিয়ে কাগজপত্র হাতড়াচ্ছে। হাবভাব দেখে মনে হয় ব্যগ্রভাবে যেন কিছু খুঁজছে। প্রথমে অভিমানে, তারপর তীব্র ঘৃণায় টলস্টয়ের মন ভরে উঠল। তাঁর প্রথম যৌবনের উন্মাদনার সঙ্গী এই নারী তাঁকে প্রতিপদে সন্দেহ করে।

গভীর নিশীথে কাগজপত্র ঘেঁটে দেখা হচ্ছে, গোপনীয় কিছু আছে কিনা। আড়ালে উপেক্ষা আর বিদ্রূপের মাত্র তিনি। অশান্তি দাউ দাউ করে জ্বলে ওঠার ভয়ে চুপচাপ থেকেছেন বহুদিন—কিন্তু আর নয়। অতি দ্রুত মন স্থির করে ফেললেন টলস্টয়।

পত্নী, পুত্র-কন্যা সকলেই যখন তাঁর উপর এত বিমুখ তখন কিসের আকর্ষণে তিনি এখানে থাকবেন? এতদিন তাঁর বেঁচে থাকাটাই অন্যায় হয়েছে। কিন্তু মৃত্যু কবে আসবে তার অপেক্ষায় তো আর থাকা চলে না। বিদায় নেবেন—এই গৃহ থেকে বিদায় নেবেন তিনি। এবং আজই, এই গভীর নিশীথে।

১৮২৮ সালের কথা।

বিত্তশালী জমিদার কাউণ্ট নিকোলাস তিনটি সন্তানের জনক কিন্ত পত্নী ম্যারিয়া ভোলকোনস্কায়া আবার আসন্ন প্রসবা। তিনি নিজের পৈতৃক বাসস্থান, ইয়াস্নায়া পোলানাতো নির্বিঘ্নে যে চতুর্থ সন্তানের জন্ম দিলেন—তখন কেউ ধারণাই করতে পারেননি পরবর্তী কালে এই শিশু প্রতিভার তুঙ্গে বিরাজ করবে।

বিশুদ্ধ নীল রক্তের অধিকারী লিও টলস্টয় কিন্তু বেশিদিন জনক জননীর স্নেহ লাভ করতে পারেন নি। অকালেই তাঁরা বিদায় নিয়েছিলেন পৃথিবী থেকে। লেখাপড়ায় তিনি কোনকালেই ভাল ছিলেন না। নানা জায়গায় লেখাপড়া করেছেন। কিন্তু কোথাও থেকে ডিগ্রী পাননি।

১৮৫১ সালে, মাত্র তেইশ বছর বয়সে টলস্টয় সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। তাঁর ভাই নিকোলাই আগে থেকেই সামরিক বিভাগের কর্মী ছিল। কাজে যোগ দেবার পর, সহকর্মীদের উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার প্রতি আসক্তি লক্ষ্য করে বিমূঢ় হয়ে পড়েন। তাদের ভালপথে আনবার চেষ্টাও করেছিলেন কিছুদিন। বলা বাহুল্য কৃতকার্য হননি।

বিস্ময়ের বিষয় কিছুদিন পরে তিনিও ওই জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। মদ্যপানের প্রতি প্রচণ্ড আসক্তি ছাড়াও, জুয়ার প্রতি ছিল তাঁর অসম্ভব আকর্ষণ। সে সমস্ত দিনেও বিভিন্ন নারীর সঙ্গে দিনের পর দিন অবৈধ জীবন যাপনে তিনি ক্লান্ত হতেন না। যে মানুষ পরবর্তীকালে ঋষি হিসাবে পূজা পান, প্রথম জীবনে তাঁর এই ন্যাক্কারজনক কার্যকলাপ সত্যি অচিন্ত্যনীয়।

নিজের দায়িত্ব সম্পর্কে অবশ্য টলস্টয় যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। ক্রিমিয়ার যুদ্ধে তিনি যে বীরত্ব দেখালেন তাতে সকলে হতবাক হয়ে গেল। কর্তৃপক্ষ তাঁকে লেফটেনাণ্ট পদে উন্নীত করলেন। বছর চারেক পরে কিন্তু একাজে তাঁর আগ্রহ রইল না। ১৮৫৬ সালে তিনি সৈন্য বিভাগের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করে বাড়ি ফিরে এলেন। তবে এই সময় থেকেই তিনি মাঝে মাঝে অনুশোচনা বোধের শিকার হয়ে পড়তেন।

ব্যাপারটা অনেকটা এই রকম, কোন যুবতীর রূপ-লাবণ্যে মুগ্ধ হয়ে তাকে করায়ত্ব করলেন। অবৈধ কার্যকলাপ চলল অনেকদিন তার সঙ্গে। তার পরই তীব্র অনুশোচনা মনকে নুইয়ে দিল। ছি-ছি একি হল—এরকম করা উচিত নয়, ইত্যাদি। কয়েকদিন এই ভাব বজায় রইল হয়তো। তারপর আবার অসংযত জীবন-যাপনের জন্য লালায়িত।

সৈন্যবাহিনীতে থাকাকালীনই তিনি লেখায় হাত দিয়েছিলেন। সময় পেলেই কিছু কিছু লিখতেন। কাজ ছেড়ে দেবার সময় তাঁর হাতে বেশ কয়েকটি গল্প ও অন্যান্য রচনা। পিটার্সবার্গে' এসে পাকাপাকিভাবে বসবাস আরম্ভ করার পরই তিনি রচনাগুলি একে একে প্রকাশ করতে সমর্থ হলেন। এব্যাপারে সম্পাদকদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা তিনি লাভ করেছিলেন। অচিরেই টলস্টয় প্রতিভাধর তরুণ লেখক হিসাবে চিহ্নিত হলেন।

দিন গড়িয়ে চলল।

লেখার ব্যাপারে বিশেষ যত্নবান থাকেন। ইতিমধ্যে অবশ্য তিনি আরো কয়েকটি কাজ করবার চেষ্টা করেছেন। ভূমিদাসদের অবর্ণনীয় কষ্ট তাঁকে উতলা করে তুলেছিল। তাঁর জমিদারিতে নিযুক্ত ভূমিদাসদের তিনি মুক্ত করে দিতে চাইলেন। তখনকার রাশিয়ায় এ এক অভূতপূর্ব ঘটনা। বিস্ময়ের বিষয় ভূমিদাসরা তাঁর এই উদার প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন, তবু তাদের মনে হল, এর মধ্যে নিশ্চয় কোন কুটিল চাল আছে।

তখন তিনি তাঁর জমিদারিতে একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। এখানে বিনা খরচে লেখাপড়া শিখবে ভূমিদাসদের ছেলে-মেয়েরা গতানুগতিক বিদ্যায়তন নয়, সহজ পাঠরীতির তিনি এক বিশেষ পদ্ধতি চালু করলেন। এই স্কুল কোন রকমে গড়িয়ে গড়িয়ে দু'বছর চলল।

ইতিমধ্যে টলষ্টয় এক বিশ্রী ব্যাপারের সঙ্গে জড়িয়ে পড়লেন। এক ভূমিদাসের রূপসী স্ত্রী তাঁর মন হরণ করে নিয়েছিল। দু'জনের অবৈধ মেলামেশা ভালভাবেই চলছিল সকলের চোখের আড়ালে। কিন্তু অনিবার্য ফলস্বরূপ সেই যুবতী মা হতে চলেছে এ সংবাদ জানতে পেরেই টলষ্টয় সচকিত হলেন।

বলা বাহুল্য তখন তিনি অন্য মানুষ। যে যুবতীকে নিয়ে তিনি এতদিন যা ইচ্ছা তাই করেছেন, তাকে অসহায় অবস্থায় ফেলে দূরে সরে আসতে দ্বিধা করলেন না। টলষ্টয়ের প্রথম জীবনের সেই সমস্ত বিচিত্র মনোভাবের কোন কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। বিশ্বের আরো কয়েকজন প্রখ্যাত সাহিত্যিক নিজেদের অবৈধ সন্তানদের যোগ্য স্থান নির্দেশ করেছেন। অথচ টলষ্টয়ের এই অবৈধ সন্তান সামান্য সহিসের কাজ করে জীবন কাটিয়েছে। ওই যুবতী সম্পর্কে অবশ্য টলষ্টয় নিজের ডায়রিতে লিখেছেন, পূর্বে আমি আর কাউকে এমনভাবে ভালবাসিনি।

এই ঘটনার উপর যবনিকাপাতের পর তিনি বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করার মনস্থ করলেন। তখন তাঁর বয়স চৌত্রিশ। কয়েকটি অভিজাত কুমারী বাতিল করে দেবার পর তিনি সোফিয়াকে দেখলেন। অবিলম্বে হৃদয় হারিয়ে ফেলতে বিলম্ব করলেন না। লাবণ্যময়ী সোফিয়া মস্কোর এক খ্যাতিমান চিকিৎসকের কন্যা। বিবাহ স্থির হয়ে গেল।

টলষ্টয় নিজের ডায়রিগুলি পাঠিয়ে দিলেন ভাবি পত্নীর কাছে। নিয়মিত ডায়রি, লেখা তাঁর অভ্যাস। এতে ছোট-খাট ঘটনা থেকে ব্যভিচার পর্যন্ত, সমস্ত কিছুর উল্লেখ থাকতো। ডায়রিগুলি পড়ে মহিলাটি তাঁর সম্পর্কে একটা ধারণা গড়ে তুলুন। তারপর স্থির করুন টলষ্টয় পরিবারে বধূ হয়ে আসবেন কিনা।

ডায়রিগুলি পড়ে সোফিয়া স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তারপর ভেঙে পড়লেন মর্মবেদনায়। সে রাত কান্নার মধ্যে দিয়ে কাটল। তবে বিবাহে তিনি সম্মতিই জানালেন। একজন চরিত্রহীনকে স্বামীত্বে বরণ করে নেওয়ার নেপথ্যে কয়েকটি কারণ অবশ্যই ছিল। যেমন, টলস্টয়ের অভিজাত অবয়ব সোফিয়ার হৃদয়কে মোহিত করে দিয়েছিল—ওই মানুষটির বংশ মর্যাদা, বৈভব, আভিজাত্য প্রভৃতির সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে ফেলার লোভ তিনি সংবরণ করতে পারেননি।

১৮৬২ সালে দু'জনের বিয়ে হয়ে গেল।

তার আগে অবশ্য কিছুদিন চলে ছিল প্রণয় পর্ব। বিবাহের পর টলস্টয় সোফিয়ার মধ্যে একেবারে ডুবে গেলেন। প্রেমের জোয়ারে ভাসিয়ে নিয়ে চললেন পত্নীকে। অপরপক্ষ থেকেও একইরকম অনুভূতি তিনি লাভ করেছিলেন। এই সমস্ত দিনে তাঁর ডায়রিতে বারংবার লেখা হয়েছে, এতদিন পরে আমি পরিপূর্ণ সুখের সাক্ষাৎ পেয়েছি।

দুর্ভাগ্যের বিষয় এই প্রেম-জর্জর দিনগুলি দীর্ঘস্থায়ী হল না। মাত্র কয়েক বছর পরেই সোফিয়া কেমন সরে যেতে লাগলেন। স্বামীর সম্পর্কে নানা সন্দেহ তাঁর মনকে ধাওয়া করে ফিরতে লাগল। কখনও কখনও কথাবার্তায় তিনি বেসামাল হয়ে পড়তে লাগলেন। টলস্টয় বিরক্ত হলেন। তাঁরও অবশ্য তখন মোহ কেটে এসেছে।

আরেক দিকপাল ম্যাক্সিম গোর্কী টলস্টয়ের মনের গঠন প্রসঙ্গে বলেছেন,"কি জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে, কি অশ্বপৃষ্ঠে, কি নারীর বাহুবল্যভের মধ্যে—কোথাও তিনি পরিপূর্ণ আনন্দ লাভ করতে পারেন নি।"

অর্থাৎ তিনি নিজে যাই বলুন না কেন, তাঁর মন মাঝে মাঝে সুখের সন্ধান পেয়েছে এই পর্যন্ত, দীর্ঘ-স্থায়ী সুখ বলতে যা বোঝায় তা তিনি কখনই লাভ করেননি। প্রসঙ্গক্রমে গোর্কী আরো বলেছেন, "তাঁর অসাধারণ প্রতিভাই তাঁর জীবনব্যাপী সুখী হওয়ার প্রধান অন্তরায় ছিল।"

যাইহোক, দিন গড়িয়ে গেছে। টলস্টয় প্রবীণত্ব লাভ করেছেন। পত্নীর সঙ্গে সেই মধুর সম্পর্ক আর নেই বটে তবে অন্যান্য সম্পর্ক বজায় আছে। সন্তানের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। ইতিমধ্যে তিনি ভাঙা মন নিয়েই 'আনা কারানিনা', 'রেসা-রেকসন' বা 'হাজি মুরাদের' মত বিখ্যাত রচনা শেষ করেছেন। এমন কি কালজয়ী 'ওয়ার এ্যাণ্ড পিস' ও লেখা হয়ে গেছে। এই বিশাল উপন্যাসে তিনি প্রায় পাঁচশোটি চরিত্রকে যেভাবে জীবন্ত করে তুলেছেন তার নজীর আর নেই। 'ওয়ার এ্যাণ্ড পিসের' মধ্যে যে সর্বকালের আবেদন আছে তা অনস্বীকার্য।

টলস্টয়ের খ্যাতি তখন দেশে দেশে। রাশিয়ায় তো পূজা পাচ্ছেন বলা চলে। অথচ ব্যক্তিগত জীবনে আক্ষেপে ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন।

অর্থ, যশ, প্রতিপত্তি—ক'জন মানুষের ভাগ্যে এই-ত্রয়ী সমাবেশ স্থায়ীভাবে হয়? তবু সোফিয়া তাঁকে বোঝার চেষ্টা না করে ছোটখাট ব্যাপার নিয়ে অশান্তির আগুনকে ক্রমাগত উস্কে চলেছেন।

ক্রমে টলস্টয় বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন সুখের সন্ধান করা বৃথা। মনে হয় তাই এত শান্ত হয়ে এসেছিল মন। সংসারের কোন ব্যাপারের মধ্যে থাকতেন না। লিখতেন বা ছোটখাট কাজ —যেমন, জুতো তৈরি করা বা ওই ধরনের কোন কাজে নিজেকে ব্যস্ত রাখতেন। সোফিয়া অসম্ভব বিরক্তি বোধ করতেন স্বামীর এই ধরনের কার্যকলাপে। একজন বিত্তশালী মানুষের মনের একি পরিণতি?

কিন্তু সোফিয়া নিজে সে সময় যে কাজে লিপ্ত ছিলেন, তার বুঝি তুলনা হয় না। বিশ্রী এক ব্যাপারে। ট্যানায়েভ নামে একজন তরুণের প্রেমে পড়ে গিয়েছিলেন তিনি। একজন বর্ষীয়ান, অভিজাত মহিলার পক্ষে এ সমস্ত যে মোটেই শোভন নয়, সে সম্পর্কে তাঁর কোন মাথা ব্যথা ছিল না। মেলামেশা যখন বাঁকা পথ ধরেছে তখন ব্যাপারটা টলস্টয় জানতে পারলেন। অসম্ভব বিরক্ত হলেন স্ত্রীর উপর।

পঞ্চাশ বছর বয়স হয়ে গেছে যে মহিলার, তার পক্ষে এ এক ভয়ঙ্কর পদক্ষেপ। আটষট্টি বছরের টলস্টয় কোন ভূমিকা না করেই নিজের মনোভাব প্রকাশ করলেন। পরিষ্কার ভাষায় জানিয়ে দিলেন, তাঁর বাড়িতে এ ধরনের কেলেঙ্কারি তিনি বরদাস্ত করবেন না।

সোফিয়াও অবশ্য বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁর কার্যকলাপ অত্যন্ত গর্হিত পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। তাছাড়া ট্যানায়েভ তাঁর মত বর্ষীয়ান মহিলার সঙ্গে নিজেকে খুব বেশিদিন যুক্ত রাখবে না। কাজেই তিনি তরুণ প্রেমিকের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন। এরমধ্যে অভিমানহত টলস্টয় এক সংকল্প করে বসে আছেন। তাঁর যাবতীয় সম্পত্তি তিনি জনসাধারণের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চান।

জ্বলে উঠলেন সোফিয়া। ছেলে-মেয়েরাও রাগে ফেটে পড়ল। বৃদ্ধকে একাজ কোনমতেই করতে দেওয়া হবে না। বাড়িতে এমন ধারাবাহিক অশান্তি চলতে লাগল যার নজির নেই। শেষে আতিষ্ট হয়ে টলস্টয় নিজের সংকল্প ভাসিয়ে দিলেন। পত্নী ও ছেলে-মেয়ের মধ্যে সম্পত্তির সমান অংশ ভাগ করে দিলেন।

এরপরও স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক উন্নত হল না। বরং দিন দিন খারাপের দিকেই যেতে লাগল। টলস্টয়ের প্রধান শিষ্য চেরেৎকভের কাছে রাখা ছিল তাঁর অধিকাংশ ডায়রি। একথা প্রথমে কাউন্টেস সোফিয়ার জানা ছিল না। ব্যাপারটা কিন্তু বেশি

দিন চাপা রইল না। কি সূত্রে যেন সোফিয়া ডায়রি হস্তান্তরের কথা জেনে ফেললেন।

সোফিয়া বিশেষ উদ্বিগ্ন হলেন। কারণ ওই সমস্ত ডায়রিতে পারিবারিক কথা লেখা আছে। লেখা আছে, দীর্ঘদিনব্যাপী স্বামী-স্ত্রীর মধ্যেকার বিশ্রী কলহের কথা। ওগুলি যদি—যদি কেন, নিশ্চিত ভাবেই ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হবে। তখন কেলেঙ্কারির আর কিছু বাকি থাকবে না।

সোফিয়া স্বামীকে গিয়ে বললেন, অবিলম্বে চেরেৎকভের কাছ থেকে ডায়রিগুলি ফিরিয়ে আনতে হবে। ওই লোকটিকে তিনি কোনদিনই ভাল চোখে দেখেন নি। টলষ্টয় অক্ষমতা প্রকাশ করলেন। সেদিন অশান্তি চরমে উঠল। শেষে সোফিয়া ভয় দেখালেন তাঁর কথামতো কাজ না করলে তিনি আত্মহত্যা করবেন।

বিপর্যস্ত টলষ্টয় নুয়ে পড়লেন এবার লজ্জায় আর ঘৃণায়। আজ স্বাধীনভাবে কোন কিছু করার অধিকার পর্যন্ত তাঁর নেই। শেষ পর্যন্ত ডায়রিগুলি চেরেৎকভের কাছ থেকে ফিরিয়ে আনতে হল। চেরেৎকভ আবার তাঁর ব্যবহারে বিশেষ ক্ষুব্ধ হল। তিনি অবশ্য ডায়রিগুলি পত্নীকে দিলেন না। জমা রেখে দিলেন ব্যাঙ্কে।

মৃত্যুর পর তার বিপুল রচনা সম্ভারের ভবিষ্যৎ কি রকম দাঁড়াতে পারে তা নিয়ে চেরেৎকভের সঙ্গে টলষ্টয়ের কয়েক দফা আলোচনার পর স্থির হয়েছিল, সমস্ত স্বত্ব জনকল্যাণে দান করা হবে, আর পাণ্ডুলিপি রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব থাকবে চেরেৎকভের ওপর। ডায়রি ঘটিত ব্যাপারের পর চেরেৎকভ ভয় পেয়ে গেল। যদিও পাণ্ডুলিপি ঘটিত কোন কিছুই এখনও কাউন্টেসও জানেন না। কিন্তু জেনে যেতে কতক্ষণ? তারপর গোলমাল বাধিয়ে সমস্ত কিছু কাঁচিয়ে দিতে পারেন।

চেরেৎকভ অনেক কষ্টে শেষপর্যন্ত গোপনে টলষ্টয়কে দিয়ে ওই সম্পর্কে একটা উইল করিয়ে নিলেন। আইনগত একটা ব্যবস্থা থাকা দরকার। টলষ্টয় কিন্তু এরপর থেকে দারুণ ভয়ে ভয়ে রইলেন। সোফিয়া যদি ব্যাপারটা জানতে পারে তাহলে যে বিশ্রী ধরনের বিরোধ আরম্ভ হবে তা কোন মতেই তিনি কাটিয়ে উঠতে পারবেন না।

কাগজ-পত্র ঘাঁটাঘাঁটি করে সোফিয়া চলে গেছেন। ভয়ে আশঙ্কায় একেবারে কাঠ হয়ে গেছেন টলষ্টয়। ওকি সমস্ত জানতে পেরেছে? উইলটা খুঁজে দেখতে এসেছিল? নিশ্চয় তাই। আগামীকাল সকালে তাঁর জন্য প্রচণ্ড দুর্যোগ অপেক্ষা করছে।

গা ঝাড়া দিয়ে উঠলেন টলষ্টয়। দ্রুত চিন্তার মাধ্যমে নিজের ভবিষ্যৎ স্থির করে নিলেন। বহু বছর ধরে অশান্তিতে তিনি ক্ষতবিক্ষত হচ্ছেন—আর নয়। এবার

পত্নী, পুত্র-কন্যা সকলের সঙ্গে সম্পর্ক শেষ করবেন। পোশাক পরে তৈরি হয়ে নিলেন। তারপর ঘুম থেকে তুললেন গৃহচিকিৎসককে।

—আমি গৃহত্যাগ করছি।

—সেকি!

—এই রকমই স্থির করেছি।

—কিন্তু রাত্রে—

—উপায় নেই।

কোচম্যানকে তোলা হল। গভীর রাত্রে, দুর্জয় শীতের মধ্যে টলষ্টয় স্টেশনের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন। সঙ্গে গৃহ-চিকিৎসক। তাঁর রস্তভ অনদনএ যাবার ইচ্ছে। স্টেশনে ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করার সময় তিনি বৃষ্টিতে বেশ ভিজে গেলেন। শরীর ভাল নয়, তার উপর বিস্তর বয়স হয়েছে। ক্ষতি যা হবার হয়ে গেল।

রস্তভ অনদনএ শেষ পর্যন্ত কিন্তু পৌঁছান সম্ভব হল না। ট্রেনেই দারুণ অসুস্থ হয়ে পড়লেন, গৃহচিকিৎসক তাঁকে নিয়ে অষ্টোপাভায় নেমে পড়লেন। স্টেশনটি অত্যন্ত ছোট। স্টেশনমাস্টার রুগ্ন যাত্রীর পরিচয় পেয়ে দারুণ ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। তাঁর জন্য ছেড়ে দিলেন নিজের কোয়ার্টার।

গৃহচিকিৎসক চেরেৎকভকে তার করে দিলেন এখানে আসবার জন্য। পরের দিন আর ব্যাপারটা চাপা রইল না। প্রখ্যাত লিও টলষ্টয় অষ্টোপাভার মত ছোট স্টেশনে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে রয়েছেন, এ সংবাদ প্রচারিত হয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে সাংবাদিক, রাজপুরুষ থেকে আরম্ভ করে নানা শ্রেণীর মানুষ দলে দলে ছুটে আসতে লাগল। রাশিয়ার চৌহদ্দির মধ্যেই এ সংবাদ আটকে রইল না, ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে।

কাউণ্টেস সোফিয়া ছেলে-মেয়েদের নিয়ে যখন অষ্টোপাভায় উপস্থিত হলেন তখন তাঁর স্বামীর জ্ঞান নেই। সোফিয়া উপুড় হয়ে পড়ে স্বামীর পায়ে চুম্বন করলেন। অজ্ঞান অবস্থাতেই দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল—এই হল শেষনিঃশ্বাস। তারপর ১৯১৪ সালের সাতই নভেম্বরের সেই বিষণ্ণ দিনে চিরদিনের মত পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন সর্বকালের শ্রেষ্ঠ কথাশিল্পী কাউণ্ট লিও টলষ্টয়।

এরপর থেকে যায় আক্ষেপ। প্রতিভার হিমালয়কে স্বামী হিসাবে পেয়েছিলেন সোফিয়া এণ্ড্রিভনা। কিন্তু সেই প্রতিভাকে তিনি যথাযথভাবে সংরক্ষণ করতে পারেননি। যদি পারতেন, তাহলে টলষ্টয় বিশ্বসাহিত্যকে আরো সমৃদ্ধশালী করে যেতে পারতেন।

নীলনদের নাগিনী ক্লিওপেট্রা

দু'হাজার বছর অতিক্রম করে গেছে তবু দুর্জয় যৌনবিলাসিনী ক্লিওপেট্রার নাম মানুষের মন থেকে মুছে যায়নি। দিকে দিকে তাঁর কামতপ্ত জীবনের কাহিনী নিয়ে এখনও আলোচনা হচ্ছে—হবে।

মিশরের রাণী ক্লিওপেট্রা। আকর্ষণীয়—বহুবল্লভা।

মিশরের সিংহাসন অবশ্য ওই একটি মাত্র ক্লিওপেট্রা অধিকার করেননি। তিনি ছিলেন ষষ্ঠ। তাঁর পূর্বে এই একই নামে আরো পাঁচজন সিংহাসন অলঙ্কৃতা করেছিলেন। তাঁদের নাম ইতিহাসের শুকনো পাতায় শুধু লেখা আছে, মানুষের মনে গাঁথা নেই।

আজ ক্লিওপেট্রা বলতে ষষ্ঠ ক্লিওপেট্রাকেই বোঝায়। পৃথিবী যখন আরো সবুজ ছিল, সেই খৃষ্টপূর্ব ৬৯ অব্দে তাঁর জন্ম। পুরোনাম ক্লিওপেট্রা থিয়া ফিলোপেটর। মিশরের চরম বিপর্যয়ের মুহূর্তে আঠারো বছর তিনি সিংহাসনে আরোহণ করেন। সেদিন তাঁর পাশে তাঁর নিজের ভাই দশ বছরের দ্বাদশ টলেমিও জায়গা করে নিয়েছিল। এই হ'ল আইন। মায়ের পেটের ভাই ওই শিশু তাঁর স্বামী।

রাণী হবার পর ক্লিওপেট্রা লক্ষ্য করলেন, তিন ব্যক্তির চোখ জ্বল জ্বল করছে ক্ষমতা করায়ত্ত করার লোভে। তাঁরা হলেন, প্রধান সেনাপতি এ্যাকেলিস, অর্থমন্ত্রী পথিনাস এবং দ্বাদশ টলেমির শিক্ষক থিয়েডোটাস। এই তিনজন মিশরের শ্রীবৃদ্ধি চাননি—চেয়েছিলেন নিজেদের ক্ষমতার শীর্ষে তুলে নিয়ে যেতে। তাঁরা টলেমিকে সামনে রেখে ক্লিওপেট্রার বিরুদ্ধে চক্রান্তে নামলেন।

জল প্রচণ্ড ঘোলা হয়ে উঠলেও কাটল কোনরকমে তিনটি বছর। তারপর ক্লিওপ্রেটা দেখলেন মিশর আর তাঁর পক্ষে নিরাপদ নয়। যে কোন মুহূর্তে তিনি নিহত হতে পারেন। সুতরাং কাল বিলম্ব না করে নিজের পক্ষীয় সৈন্যদের নিয়ে তিনি সিরিয়ায় পালিয়ে গেলেন। এরকম অনিশ্চিত অবস্থায় পড়ে অনেকেই কালের পাতা থেকে মুছে যান কিন্তু ইতিহাসে যাকে স্থায়ী আসন দেবার জন্যে উন্মুখ তাঁর কথা স্বতন্ত্র।

এই সময় মিশরের রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হলেন, জুলিয়াস সিজার।

বহু যুদ্ধের জয়ী সেনাপতি সিজার নিজের স্বদেশবাসীর প্রতিপক্ষকে পর্যুদস্ত করবার জন্য রোম থেকে যাত্রা করেছিলেন। মানুষের রক্তে সাগরের জলকে লাল করে, তিনি এসে উপস্থিত হয়েছেন মিশরে।

সিজার এখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি সহজেই হৃদয়ঙ্গম করলেন। মিশরে রাজপুরুষদের উদ্দেশ্যে এক বাণীতে বললেন, রোমের প্রতিনিধি হিসেবেই আমাকে এখানে আসতে হয়েছে। মিশরের রাজা ও রাণীর অন্তর্কলহে রোম স্বাভাবিকভাবেই বিব্রত। আমি পরিস্থিতিকে সহানুভূতির সঙ্গে বিচার করে দেখতে চাই। আমিই স্থির করব, মিশরের সিংহাসনের উপর কার দাবী ন্যায্য।

তিনি টলেমি ও ক্লিওপেট্রাকে আহ্বান করলেন।

এই আহ্বানে টলেমি সদলবলে আলেকজান্দ্রিয়ায় এসে উপস্থিত হল। অসুবিধায় পড়লেন ক্লিওপেট্রা। তিনি নিশ্চিতভাবে জানেন বিপক্ষদল কিছুতেই সিজারের সঙ্গে তাকে সাক্ষাৎ করতে দেবে না। সমস্ত জলপথের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে তারা। তাঁকে দেখতে পেলেই সঙ্গে সঙ্গে হত্যা করবে। অথচ নিজের দাবী প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে সিজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই হবে।

উপায় অনুসন্ধান করবার জন্য বিশ্বস্ত অনুচর এ্যাপলোডোরাসকে পাঠালেন। অনেকক্ষণ ধরে আলাপ-আলোচনা করবার পর একটা পন্থা তাঁর মনঃপুত হল। যদিও প্রচুর ঝুঁকি নিতে হবে। তা হোক। ওই বিপদসঙ্কুল পথ ধরেই তিনি যাবেন সিজারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

রাত্রি তখন গভীর। নক্ষত্রখচিত আকাশ পৃথিবীকে বিন্দুমাত্র আলো দিতে পারেনি। হাওয়ার তেজও তেমন নেই। সমুদ্রের রূপ এখন শান্ত। অল্প অল্প শব্দ তুলে ঢেউগুলি পাড়ে আছড়ে পড়ছে। নিঃশব্দ গতিতে একটি নৌকো আঘাটায় এসে থামল। সতর্কভাবে চারিদিকে তাকিয়ে নিয়ে এ্যাপলোডোরাস নৌকো থেকে নামল। তাঁর কাঁধে একটি গোটান কার্পেট।

টলেমির কোন সৈন্যের সঙ্গে এখন পথে দেখা না হলেই ভাল। সৌভাগ্যক্রমে তাদের দেখা পাওয়া গেল না। নির্বিঘ্নেই রাজপ্রাসাদের প্রধান দ্বারের সামনে এসে পৌছাল এ্যাপলোডোরাস। রোমান প্রহরি তাঁর পথ রোধ করে দাঁড়াল। কর্কশকণ্ঠে তার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইল।

এ্যাপলোডোরাস বিনীতভাবে বলল, মহান সিজারের সাক্ষাৎ প্রার্থী। তাঁর জন্য সামান্য উপহার এনেছি।

আপত্তি থাকলেও বাধা দেবার সাহস হল না প্রহরির। বাধা দিলে পরে সিজার যদি তার শাস্তির বিধান দেন। সে এ্যাপলোডোরাসকে নিয়ে গেল তাঁর কক্ষে।

মহানায়ক জুলিয়াস সিজারকে দেখলেন মিশরীয় সেনানায়ক। যৌবনের সীমা তিনি অতিক্রম করেছেন। বিরলকেশ, দীর্ঘদেহী, ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষটির মুখের দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকা যায় না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে সিজার তাকালেন। বুক কেঁপে উঠল এ্যাপলোডোরাসের! তারপর কাঁধের উপর থেকে জড়ান কার্পেটটা নামিয়ে মাটিতে রাখল। কার্পেট খুলে যেতে লাগল এবার।

সম্পূর্ণ খুলে যাবার পর ক্লিওপেট্রা উঠে দাঁড়ালেন। রোম সাম্রাজ্যের অধীশ্বর সীমাহীন বিস্ময় নিয়ে দেখলেন, নিটোল যৌবনকে। কর্ণেলিয়া, পম্পিয়া, সার্ভিলিয়া, কালপূর্ণিয়া—সুন্দরী যৌবনবতীরা তাঁর কামনার আগুনে নিঃশেষ হয়ে মরে গেছে। তবে এমন অনিন্দ্যছন্দা, আকর্ষণীয়া নারী তিনি পূর্বে দেখেননি। এমন দুর্নিবার যৌবন যে কোন নিরাসক্ত পুরুষকেও অবহেলায় লোলুপ করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট।

হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন সিজার। শেষে নিজেকে কঠিন শাসনে বেঁধে প্রশ্ন করলেন।—কে তুমি?

মুক্তা ছড়িয়ে হাসলেন নারী—আমি ক্লিওপেট্রা।

বহুদর্শী, মহাবীর সিজারের বুকের রক্ত উত্তাল হয়ে উঠল। এই সেই ক্লিওপেট্রা—যার সৌন্দর্যের সৌরভ ইউরোপ পর্যন্ত পৌঁছেছে! খুঁটিয়ে দেখলেন। রটনা মিথ্যা নয়, পুরুষকে মাতাল করে তোলবার জন্যই এই নারীর জন্ম। ইঙ্গিতে এ্যাপলোডোরাসকে কক্ষ থেকে বিদায় দিলেন।

—ভয় হল না তোমার এই ভাবে আসতে?

—এই কক্ষে পৌঁছাবার তো আর কোন পথ খোলা ছিল না।

—তোমার সাহস ও বুদ্ধি দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি।

মধুর হাসি হাসলেন ক্লিওপেট্রা। পুরুষের মন তিনি চিনতে পারেন। মুগ্ধ পতঙ্গকে টেনে নিলেন নিজের আগুনে। বাকি রাত দুর্জয় কামনার সাগরে যেভাবে দু'জনে অবগাহন করলেন, তা লিখে বোঝাবার নয়। ক্লিওপেট্রা জানেন তাঁর জয় হয়েছে। সিজার আবার তাঁকে প্রতিষ্ঠা করবেন মিশরের রাণীর পদে।

কার্যক্ষেত্রে হলও তাই। সিজার আদেশ দিলেন ক্লিওপেট্রাই মিশরের রাণী। টলেমি অবশ্য পাশে জায়গা পাবে। ছোট বোন আরসিনো ও ছোট ভাই ত্রয়োদশ টলেমিকে সাইপ্রাসে পাঠান হবে। সমস্ত ষড়যন্ত্রের মূলচ্ছেদ করা হবে। তাই রোম যথানিয়মে মিশরের অভিভাবক হয়ে থাকবে। দু'কূলই বজায় রইল। প্রজারা মহা আনন্দিত। তারা সিজারের জয়ধ্বনিতে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে তুলল।

ক্লিওপেট্রাও সুখী হলেন। আবার তিনি রাণী।

মিশরের রাণী ও রোমের অধীশ্বরের অবৈধ প্রণয়ের কথা কারুর অজানা রইল না। দুই প্রেমিক অবশ্য গ্রাহ্য করলেন না কোন কিছুকে! সিজার নিজের নর্মসহচরীর কাছ থেকে অনেক পেলেন। এত আন্তরিকভাবে নিজেকে কেউ বিলিয়ে দেয়নি তাঁর কাছে। উদ্দাম গতিতে তাঁদের দিন এগিয়ে চলল।

মিশরের প্রজারা সুখী হলেও বালক দ্বাদশ টলেমির দুই সহায়ক পথিনাস ও ক্রাকিনাস সিজারের মধ্যস্থতাকে পছন্দ করল না। তারা ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তার করল। এবং বিরাট সেনাবাহিনী নিয়ে আচম্বিতে যুদ্ধে নেমে পড়ল। সরাসরি নিষ্পত্তির জন্য রণক্ষেত্রে না এসে তারা দূর প্রান্তের প্রদেশগুলি জয় করে নিল এবং চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি করে চলল।

বিব্রত বোধ করতে লাগলেন সিজার। বিদ্রোহীরা যদি সমুদ্রে অবরোধ সৃষ্টি করে তাহলে রোমান বাহিনীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠবে। তাঁর বিশাল ললাট রেখা কুঞ্চিত হয়ে ওঠে। সমস্ত দিন এই সমস্ত ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত থাকেন সিজার। রাত আসে এক সময়। মোহময় হাতছানি তখন আর তাঁকে কাজের গণ্ডির মধ্যে থাকতে দেয় না। ক্লিওপেট্রার নরম বাহুর মধ্যে আশ্রয় নেন তিনি, সব ভুলে যান। অতীত তাঁর কাছে তুচ্ছ মনে হয়, ভবিষ্যৎ অন্ধকারে বিলীন, বর্তমান তখন একমাত্র ক্লিওপেট্রা। রাত্রির প্রতিটি মুহূর্ত তাঁরা উন্মত্তের মত উপভোগ করেন।

বিপদের কালো মেঘ সরে গেল ক্রমে। সিজারের রণকুশলতা সম্পূর্ণ বিপর্যস্ত করল বিপক্ষ দলকে। শান্তি প্রতিষ্ঠা হতে বিলম্ব হল না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন সিজার ও ক্লিওপেট্রা। এবার দিন রাত্রে প্রভেদ থাকবে না। সর্বক্ষণই চলবে দুর্বার প্রেম বিলাস। ওদিকে রোম থেকে তাগাদা আসছে, বহুদিন মিশরে গেছেন সিজার এবার দেশে ফিরে আসুন। সেখানে একটি অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে ধূমায়িত হচ্ছে। রোমের রাজপুরুষরা প্রেমের মূল্য বোঝেন। কিন্তু মিশরে গিয়ে প্রেমের নামে তিনি একি ছেলেখেলা করছেন। রাণী ক্লিওপেট্রা রক্ষিতা—অবিবাহিতা শয্যাসঙ্গিনী, একথা কার অজানা?

ফিরে যাওয়ার কথা মনে হতেই মন কেমন ফাঁকা হয়ে ওঠে জুলিয়াস সিজারের। ক্লিওপেট্রার চোখ ছলছলিয়ে ওঠে। কিন্তু ফিরে তো যেতেই হবে। শেষ পর্যন্ত রণক্লান্ত সেনাপতি শীতের ক'টাদিন থেকে যাওয়াই মনস্থ করলেন।

আর মাটির উপর নয়, জলে ভাসলেন দু'জনে। বিশাল বিলাস তরী 'আলমেয়স' তাদের নিয়ে ভেসে চলল দূর-দূরান্তরে। এই আনন্দোচ্ছল পরিবেশের মধ্যেই সিজার জানতে পারলেন ক্লিওপেট্রা তাঁর সন্তানের জননী হতে চলেছেন।

ইথিওপিয়া ঘুরে আবার তাঁরা ফিরে এলেন আলেকজান্দ্রিয়া। স্বপ্ন থেকে বাস্তবে। এবার বিদায় নেবার পালা। আর দশজন সাধারণ মেয়ের মতই দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল প্রিয়তমকে বিদায় দেবার সময় ক্লিওপেট্রার। আবার সাক্ষাৎ হবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে গেলেন সিজার।

কিছুদিন পরে ক্লিওপেট্রা একটি পুত্র সন্তানের জন্ম দিলেন। সিজারের শ্রেষ্ঠ উপহার। নামকরণ করলেন, টলেমিয়াস সিজার। চতুর্দিকে ছিছি-ক্কার পড়ে গেল। অবৈধ সন্তান নিয়ে রাণীর নির্লজ্জতা সকলকে হতবাক করে দিল। ক্লিওপেট্রাও নিজের বিপদের আশঙ্কা করে বেশীদিন থাকতে চাইলেন না দেশে। ছেলেকে নিয়ে রোমে চলে গেলেন প্রিয়তমের কাছে।

সিজারের সম্মান ও প্রতিপত্তি এখন চতুর্গুণ বর্ধিত হয়েছে। মিশর থেকে ফেরার পথে অনেক বিজয়ের ফলস্বরূপ এটা হয়েছে। জনসাধারণ তাঁকে রাজমুকুট পড়াতে চেয়েছিল। রাজমুকুট ফিরিয়ে দিয়ে তিনি সবিনয়ে জনতাকে জানিয়ে দিলেন, রোম সাম্রাজ্যের রাজা নয়, ডিক্টেটর হিসেবেই আজীবন থাকতে চান।

টাইবার নদীর তীরে একটি সুরম্য প্রাসাদে সিজার প্রিয়তমার স্থান নির্দেশ করলেন। এই হল নর্মনিকেতন। প্রতিদিন দীর্ঘ সময় তিনি ক্লিওপেট্রার কাছে কাটিয়ে যান। তাঁদের অনেক স্বপ্ন। অনেক আকাঙ্ক্ষা... ক্লিওপেট্রা বলেন, ডিরেক্টর নয়, রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট হতে হবে তোমাকে। আমি হব সম্রাজ্ঞী। তোমার পর আমাদের টলেমিয়াস সাম্রাজ্য ভোগ করবে।

সিজার প্রশ্রয়ের হাসি হাসেন।

অলক্ষ্যে পরমপুরুষও অর্থপূর্ণ হাসি হাসেন।

রোমের রাজনৈতিক আকাশে বিপদের মেঘ ঘনিয়ে এল। সিজারের প্রতিপত্তিতে ঈর্ষাকাতর কয়েকজন গুপ্ত চক্রান্তে লিপ্ত হল। সিজারের একান্ত বিশ্বাসভাজন মার্ক্ ব্রুটাস তাদের মধ্যে অন্যতম। যাঁকে নিয়ে এত কাণ্ড তাঁর কিছুই জানা নেই। ইদম্ অব মার্চের উৎসবের দিন হাল্কা মনেই স্ত্রী কালপূর্ণিয়ার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সেনেটের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। বিশ্রী স্বপ্নের কথা তুলে স্বামীকে বাড়ি থেকে বেরুতে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করেছিল কালপূর্ণিয়া। তিনি স্ত্রীর কথায় কান দেননি।

সেই বিশেষ দিনটি ছিল ১৫ই মার্চ, খৃষ্টপূর্ব ৪৪ অব্দ।

রোমের ইতিহাসে চরম কলঙ্কের দিন।

সেনেটে প্রবেশ করলেন সিজার। ক্যাসিয়াস, ব্রুটাস, কাস্কা, এ্যাণ্টনি প্রভৃতি তাঁর পার্শ্বচররা সকলেই উপস্থিত। সভা শেষ করে ক্লিওপেট্রার কাছে যাবেন মনের ও দেহের খোরাক আহরণ করতে, এই রকম স্থির করে রেখেছেন। কাজের কথা আরম্ভ হল। কিছু তর্কবিতর্ক—তার পরই ঘনিয়ে এল চরম মুহূর্ত। কাস্কা প্রথম

আঘাত হানল, তারপর একে একে সকলে। টলে পড়ে গেলেন রক্তাক্ত দেহে সিজার। এই অন্তিম সময় একটা বিস্ময় তাঁর ছিল। কোন রকমে তিনি বললেন, ব্রুটাস তুমিও।

জুলিয়াস সিজার চলে গেলেন। এই কুটিল, হিংস্র, ক্লেদাক্ত পৃথিবী থেকে তিনি চিরবিদায় নিলেন। প্রিয়তমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাওয়া আর সম্ভব হল না। আর ক্লিওপেট্রা—ভবিষ্যতের রঙ্গীন স্বপ্ন যখন মনে মনে গুনগুনিয়ে যাচ্ছিলেন তখনই সিজারের মৃত্যু সংবাদ পেলেন আর দশজন সাধারণ নারীর মতই মিশরের রাণী হাহাকার করে উঠলেন। চতুর্দিক ফাঁকা মনে হতে লাগল।

নেই, নেই—সব শেষ হয়ে গেল। নিজের দুই বিরাট বাহু বিস্তার করে আর কোনদিন সিজার এগিয়ে আসবেন না ক্লিওপেট্রার দিকে। প্রৌঢ় প্রেমিকের দুরন্ত যৌবন বিলাস আর কেউ দেখতে পাবে না। কেন এমন হল—রোরুদ্দমানা ক্লিওপেট্রা ছোট্ট টলেমিয়াসকে নিবিড়ভাবে বুকের মধ্যে টেনে নেন।

জুলিয়াস সিজার ক্লিওপেট্রার জন্য সবই করেছিলেন। প্রেমের আবেগে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, প্রবল যৌবনাবেগে বিভ্রান্ত করে দিয়েছিলেন। রোমের কেন্দ্রস্থলে "ভেনাস জেণ্ট্রিকস্" নামে মন্দির তৈরি করে তাতে ক্লিওপেট্রার সোনার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মনে যাই থাকুক সিজারের ভয়ে রোমের গণ্যমান্যরা তাঁকে চরম মর্যাদা প্রদর্শন করেছিলেন। প্রেমিকার চূড়ান্ত স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তাঁর কোন কার্পণ্য ছিল না। শুধু একটি কাজ—বিয়ে করেননি ক্লিওপেট্রাকে।

মিশরের রাণী আইনানুসারে বিবাহিতা। তাঁকে বিয়ে করা সম্ভব ছিল না। তবে সিজার আর কিছুকাল বেঁচে থাকলে, কোন রকম লৌকিক আচারকে গ্রাহ্য করতেন কিনা সন্দেহ। বিবাহিত সিজার অবিবাহিতা ক্লিওপেট্রাকে বিয়ে করে বিশাল রোম সাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ আসনে বসাতেন। অথচ সেই মিশরের রাণীকে উন্মত্ত জনতার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য সকলের অগোচরে এখান থেকে আজ পালাতে হবে।

ভাগ্যের কি করুণ পরিহাস।

সৌভাগ্য বলতে হবে, বিপদ এড়িয়েই তিনি রোম থেকে মিশরে এসে পৌঁছালেন।

অনেকদিন কেটে গেছে এরপর। টলেমিয়াসের বয়স এখন চার বছর। নিজেকে এখন প্রচ্ছন্ন রেখেছেন ক্লিওপেট্রা। রাজ্যশাসনের করণীয় কাজগুলি ও ছেলেকে মানুষ করার ব্যাপারেই এখন তাঁর দিন কাটে। আর কোন পুরুষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হননি তিনি। সিজারের স্মৃতিচারণ করেই আজীবন কাটিয়ে দেবেন স্থির করেছেন। কিন্তু মানুষ যা ভাবে সব সময় তা বাস্তবে পরিণত হয় না। আবার তাঁকে ফিরে

যেতে হল উদ্দাম-প্রেমের জগতে। দ্বিতীয়বার ক্লিওপেট্রাকে সরস জীবনের গণ্ডির মধ্যে এনে তুললেন এ্যাণ্টনি।

অজেয় রোমান সেনাপতি মার্ক এ্যাণ্টনি।

সিজারকে হত্যা করার চক্রান্তে তিনি ছিলেন একজন নীরব সদস্য। তাঁরই সামনে সিজার মর্মন্তুদ মৃত্যুবরণ করলেন, আবার তিনি সিজারের মৃত্যুর প্রতিশোধ নেবার জন্য ব্রুটাসের বিরুদ্ধে রোমের জনসাধারণকে চরমভাবে উত্তেজিত করলেন। মহানায়ক এ্যাণ্টনি অবস্থাপন্ন ঘরের ছেলে নন। তবে বংশমর্যাদায় মহীয়ান। তাঁর দেহে প্রবাহিত হচ্ছে, মহাবীর হারকিউলিসের তেজোদীপ্ত রক্ত।

তাঁর শরীরের প্রতি খাঁজ যেন গ্রীক ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন। তীক্ষ্ণ সুন্দর মুখ। যৌবনে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি যোগ দিলেন সৈন্যবাহিনীতে। এরপর তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ দিক খুলে গেল এবং শেষ পর্যন্ত জুলিয়াস সিজারের অন্তরঙ্গদের মধ্যে একজন হয়ে দাঁড়ালেন। সে আরেক ইতিহাস।

সিজারের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী ভাগনে (মতান্তরে ভাগনীর ছেলে) বীর্যমান তরুণ অক্টেভিয়ান রোমে এলেন। নানা ঝড়-ঝাপটার পর তাঁকে হাত মেলাতে হল এ্যাণ্টনির সঙ্গে এবং তাঁদের মিলিত বাহিনী বিধ্বস্ত করল ব্রুটাস ও ক্যাসিয়াসকে। এই জয়লাভের পর এ্যাণ্টনির স্কন্ধে অ নক দায়িত্ব এসে পড়ল। রোম সাম্রাজ্যের অন্যতম প্রধান ব্যক্তি হয়ে পড়লেন তিনি। দেশের শাসন পরিচালনার সুষ্ঠু ব্যবস্থা করে তিনি প্রাচ্যের দেশগুলি জয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। সিজারের মৃত্যুর পর অনেক বিজিত দেশ স্বাধীন হয়ে উঠেছিল।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই যুদ্ধের প্রয়োজন হল না। এ্যাণ্টনির আগমনে সকলে থরহরি কম্পমান। এই সময় তাঁর নীলনদের দান অপূর্ব দেশ মিশরের কথা মনে পড়ল। ক্লিওপেট্রার কথা তাঁর অজানা ছিল না। চোখে না দেখলেও তিনি জানতেন, ওই নারী জুলিয়াস সিজারের উপর কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিলেন।

এ্যাণ্টনির আরো মনে পড়ল, সম্প্রতি মিশর রোমের সঙ্গে আগেকার মত সম্পর্ক বজায় রাখছে না। আশ্রিত রাজ্যের এ স্পর্দ্ধা ভাল নয়। তাঁর সুন্দর মুখ কঠিন হয়ে উঠল। তিনি স্থির করলেন ক্লিওপেট্রাকে আহ্বান করে এর কৈফিয়ৎ চাইবেন।

এ্যাণ্টনির আদেশ পৌছাল মিশরের রাণীর কাছে। আদেশ নিয়ে গেলেন এ্যাণ্টনির বন্ধু কুইন্টাস ডেলিয়াস। ক্লিওপেট্রা প্রমাদ গুণলেন। তাঁর বিরুদ্ধে সবচেয়ে বড় অভিযোগ, রোমের রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়. তিনি ক্যাসিয়াসকে সৈন্য সাহায্য

করেছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রত্যক্ষভাবে এই ব্যাপারে তিনি জড়িত ছিলেন না। কিন্তু সে কথা বিশ্বাস করবে কে?

ক্লিওপেট্রার করুণ মুখের ভাব লক্ষ্য করে কুইণ্টাসের মায়া হল। তিনি বললেন, সাহস হারাবেন না। এ্যাণ্টনি মানুষ হিসেবে খারাপ নন। তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার সময় আপনি শ্রেষ্ঠ সাজসজ্জায় যাবেন এই অনুরোধ।

দূত বিদায় নেবার পর তাঁর কথার তাৎপর্য চিন্তা করে দেখতে লাগলেন ক্লিওপেট্রা। তাঁর অজানা ছিল না, যুদ্ধক্ষেত্রে এ্যাণ্টনি অমিত বলের অধিকারী, কর্তব্য সম্পর্কে একাগ্র। তবে সামাজিক জীবনে সুরার দাস, সুন্দরী নারীর প্রতি সীমাহীন আসক্তি। এরই ইঙ্গিত কি দিয়ে গেলেন দূতপ্রবর? ক্লিওপেট্রা বুঝলেন, দেশ ও নিজের সম্মান রক্ষা করতে গেলে, সিজারের স্মৃতিচারণ করলে চলবে না। আবার লীলারঙ্গী রূপে আসরে নামতে হবে। নিজের আঠাশ বছরের যৌবনকে ছাই করে ফেলতে রোমান সেনাপতির কামনার আগুনে।

সিলিসিয়ার একটি জনপদ টারসাস।

টারসাসের বাজারে দরবার বসেছে। এ্যাণ্টনি বিচার করছেন এখানে অপরাধীদের। আবেদন-নিবেদন শুনছেন। একসময় সন্ধ্যা সমাগত হল। বিচারক সেনাপতি শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। এই সময় সংবাদ পেলেন, সিডনাস নদীর তীরে বজরা থেকে নেমেছেন রাণী ক্লিওপেট্রা।

ওই মদালসা যৌবনবতীকে দেখবার আগ্রহ এ্যাণ্টনিরও কম ছিল না। তিনি নদীর তীরে পৌঁছে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। রূপ যেন আগুনের ছদ্মবেশে গ্রাস করতে আসছে। তিনি মনে মনে সিজারের নির্বাচনের প্রশংসা করলেন। এই নারীর জন্য মাথা পেতে সমস্ত কিছু সহ্য করা যায়। জীবনে অসংখ্য নারীকে নিজের বলিষ্ঠ বাহুর মধ্যে নিবিড়ভাবে গ্রহণ করেছেন এ্যাণ্টনি। কিন্তু এই নারীরত্নকে হেলায় জয় করা যাবে কি?

ক্লিওপেট্রাও মুগ্ধ দৃষ্টিতে দেখলেন রোমান সেনাপতিকে। পুরুষের এত রূপ তিনি আগে দেখেননি। এখন মনে হচ্ছে জুলিয়াস সিজার ছিলেন কদাকার বৃদ্ধ। দেহের বিনিময়ে তিনি নিজের নিরাপত্তা ক্রয় করতে এসেছিলেন। প্রথম দর্শনেই এখন হৃদয় হারাতে বসেছেন।

এ্যাণ্টনি তাঁকে স্বাগত জানালেন। নৈশভোজে আমন্ত্রণ করলেন। হাসির ঝিলিক তুলে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন ক্লিওপেট্রা। দু'জনের যথাসময়ে আবার সাক্ষাৎ হল। সংযমকে আর বেঁধে রাখতে পারলেন না এ্যাণ্টনি। নতজানু হয়ে বসে আবেগভরে বললেন, তোমার সৌন্দর্যের খ্যাতি আমি শুনেছিলাম। আজ আমার নয়ন সার্থক হল। আমি মুগ্ধ!

চটুল কণ্ঠে রাণী বললেন, মহাবীর এ্যাণ্টনির শৌর্য-বীর্যের কথা আমিও কম শুনিনি। আজ তাঁকে কাছে পেয়ে আমি ধন্যা।

কামনার আগুন জ্বলতে আরম্ভ করেছে এ্যাণ্টনির প্রতি রন্ধ্রে রন্ধ্রে। তিনি বাহু বিস্তার করলেন। তৃষিত দুই বাহুতে ধরা দিলেন ক্লিওপেট্রা। পুরুষ সবলে মিশিয়ে ফেলতে চাইলেন নারীকে নিজের অস্থি মজ্জার সঙ্গে। ক্লিওপেট্রা এই তো চান। রোমান নায়ক তাঁর রূপের আলোয় মুগ্ধ পতঙ্গ হয়ে থাকলে অনিশ্চয়তা দুর হবে, নিরাপত্তার জন্য চিন্তা করতে হবে না। আর তিনিও বিগলিত চিত্তে নিজের দেহের ও মনের খোরাক মিটিয়ে নিতে পারবেন। অবশ্য প্রথমেই রোমান সেনাপতি এতটা বেসামাল হয়ে পড়বেন তা তাঁর কল্পনার অতীত ছিল।

এত চিন্তা করবার অবসর এ্যাণ্টনির নেই। প্রয়োজনও নেই। তিনি ক্লিওপেট্রার রূপের ছটায় ভুলে গেলেন প্রিয়তমা স্ত্রী ফিলবিয়ার কথা। ভুলে গেলেন, যার রূপে মজেছেন তার কাছে কৈফিয়ৎ তলব করেছিলেন। ভুলে গেলেন, এখন অসতর্ক থাকলে রোমে তাঁর প্রতিপত্তি খর্ব হতে পারে। সব ভুলে গেলেন—সব কিছুর উপর ক্লিওপেট্রার সৌন্দর্যের প্রলেপ পড়ে রইল।

তাঁদের এরপরের একটি বছরের ইতিহাসকে ঔপন্যাসিক ও না কারেরা উজ্জ্বল প্রেমের পরিপূর্ণ বিকাশ বলে যত সোচ্চার হোন না কেন—ঐতি সিকরা বলেন, তাঁদের সেই দিনগুলি প্রেমের চেয়ে বড় হয়ে দেখা দিয়েছিল, হাস্য ও লাস্য, কামনা আর কামনা। উচ্ছৃঙ্খল জীবন কত চরমভাবে অতিবাহিত করা যায় তার অভূতপূর্ব নজীর এই নারী-পুরুষ-সৃষ্টি করলেন। মিশরের প্রজারা আরেকবার লক্ষ্য করল তাদের রাণীর ন্যাক্কারজনক কার্যকলাপ।

ক্লিওপেট্রার মনে অপার শান্তি। জীবনের শ্রেষ্ঠ সময় অতিক্রম করছেন তিনি। প্রৌঢ় সিজার নয়, এবার তাঁর দাসানুদাস যৌবনের প্রতীক মার্ক এ্যাণ্টনি। এই ভাবেই বুঝি সময় কেটে যাবে। কিন্তু নিয়তির ভ্রূকুটিকে উপেক্ষা করার উপায় কোথায়? এক বছর অতিক্রম করবার পরই সংবাদ এল রোমে গুরুতর গোলমাল বেধেছে। গোলমালের সূত্রপাত করেছিলেন, অ্যাণ্টনির স্ত্রী ফিলবিয়া। অক্টেভিয়ান তাঁকে রোম থেকে বহিষ্কার করেছেন।

এই সংবাদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মোহ ভঙ্গ হল এ্যাণ্টনির। রাগে জ্বলে উঠলেন তিনি। তাঁর স্ত্রীকে রোম থেকে বহিষ্কারের সাহস রাখে অক্টেভিয়ান। এই সময় আবার স্ত্রীর চিঠিও পেলেন তিনি। ফিলবিয়া অনেক কথা লেখবার পর লিখেছেন, এ্যাণ্টনির মত স্বামী থাকতেও তাঁকে এই চরম লাঞ্ছনা ভোগ করতে হল, এর চেয়েও লজ্জার বুঝি আর কিছু নেই।

এ্যাণ্টনি আর বিলম্ব করলেন না মিশরে। ক্লিওপেট্রার সোহাগের বন্যায় ডুবিয়ে

আবার ফিরে আসবেন, কথা দিলেন। শ'ছয়েক জাহাজ নিয়ে অপমানের প্রতিশোধ নিতে অগ্রসর হলেন। পথেই স্বামী-স্ত্রীর সাক্ষাৎ হবার কথা ছিল। কিন্তু তা আর সম্ভব হল না। সামান্য অসুস্থতায় হঠাৎ ফিলবিয়া মারা গেলেন। এই মৃত্যু শাপে বর হল এ্যান্টনির কাছে। বিরাট রাজনৈতিক জয় হল বলা চলে। অক্টেভিয়ান উপযাচক হয়ে মিটমাট করে নিলেন এ্যান্টনির সঙ্গে। এবং তাঁর সুন্দরী সহোদরা অক্টেভিয়াকে তুলে দিলেন তাঁর হাতে।

অক্টেভিয়াকে বিয়ে করবার পর এ্যান্টনির দিন আনন্দে কাটতে লাগল। রাজনৈতিক কারণেই ক্লিওপেট্রাকে তিনি ভুলে গেলেন। মিশরে তাঁর কাণ্ডকারখানায় এবং এতদিন থেকে যাওয়ায় রোমে বিরক্তি ও ক্ষোভের ঝড় উঠেছিল। স্বাভাবিক ভাবেই এ্যান্টনি আবার প্রজা সাধারণের মনে প্রতিষ্ঠা লাভ করতে চাইলেন। বেশ কিছুদিন কেটে গেল। দু'টি মেয়ের জন্ম দিলেন অক্টেভিয়া।

অবশ্য এই দীর্ঘসময় এ্যান্টনি শুধু প্রেমগুঞ্জনেই অতিবাহিত করেননি। যুদ্ধও করেছেন রোমের শক্তিশালী প্রতিপক্ষ পম্পেয়াসের সঙ্গে। বলা বাহুল্য শত্রু দরজায় করাঘাত করছে লক্ষ্য করেই অক্টেভিয়ান এ্যান্টনির সঙ্গে মিটমাট করেছিলেন। প্রাথমিকভাবে পম্পেয়াস পর্যুদস্ত হবার পর স্থির হল, তাকে সম্পূর্ণ নির্মূল করবার ভার নেবেন অক্টেভিয়ান নিজে। আর এ্যান্টনি পাথিয়ার বিরুদ্ধে অগ্রসর হবেন।

স্ত্রীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এ্যান্টনি সিরিয়া যাত্রা করলেন। এশিয়ার মাটিতে পা দেবার পরই ক্লিওপেট্রার কথা তাঁর মনে পড়ল। কামনা উগ্র হয়ে উঠল, অতীতের লাস্যময় দিনগুলির ছবি বারংবার ভেসে উঠতে লাগল চোখের উপর, তিনি অসম্ভব উতলা হয়ে উঠলেন, মিশরের রাণীকে কাছে পাবার জন্যে। এছাড়া কুটনৈতিক কারণও ছিল। তাঁর বিশাল সৈন্যবাহিনীর জন্য শস্য চাই। মিশর ছাড়া এখন আর তাঁকে শস্য কে সরবরাহ করতে পারে। সুতরাং ক্লিওপেট্রাকে কাছে না পেলে চলবে না।

তীব্র অভিমান ক্লিওপেট্রাকে বিবশা করে রাখাই স্বাভাবিক। অবিলম্বে ফিরে আসছি বলে, এ্যান্টনি চলে গেলেন রোমে। ফিরে তো এলেনই না, উপরন্তু বিয়ে করলেন সেখানে। নববিবাহিতা স্ত্রীকে নিয়ে ব্যস্ত রইলেন দীর্ঘদিন। দু'টি সন্তানের জন্ম দিলেন। এর পরও কি ক্লিওপেট্রার আভিমান করা অন্যায়? তবু আহ্বান পাওয়ামাত্র তিনি অভিমান ভুলে চলে এলেন প্রেমিকের কাছে।

ক্লিওপেট্রাকে কাছে পেয়ে আবার পুরানো উন্মাদনা ফিরে পেলেন এ্যান্টনি। ভুলে গেলেন কত বড় দায়িত্ব তাঁর হাতে। প্রথমবারের মত এবারও ভুলে গেলেন তিনি সমস্ত কিছু। প্রিয়তমার অভিমান বোধের কথা তাঁর অজানা রইল না। প্রথমেই

তিনি তৎপর হয়ে ছিলেন প্রেমিকার অভিমান ভাঙ্গাবার জন্য। সাইপ্রাস, ফিনিসিয়া দান করলেন ক্লিওপেট্রাকে। বললেন, আর কোন্ রাজ্য চাই বলো? মার্ক এ্যান্টনির অদেয় কিছু নেই। শুধু অভিমানকে আর প্রশ্রয় দিও না।

এতটা আশা করেননি ক্লিওপেট্রা। শুধু হাসলেন—প্রশ্রয়ের হাসিই হাসলেন। তারপর আবার তাঁদের পুরানো জীবনের উদ্দামতা ফিরে এল নতুন দিনে। এদিকে রোমে সংবাদ পৌঁছে গেছে। অক্টেভিয়ান স্তম্ভিত, একটি নারীর পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়ে রাজ্যের পর রাজ্য উপহার দেবার অধিকার এ্যান্টনির কোথায়? রাজ্যগুলি তো আর পৈতৃক সম্পত্তি নয়।

ইতিমধ্যে সন্তানের জননী হলেন ক্লিওপেট্রা। অবশ্য পূর্বে মেলামেশার ফলস্বরূপ তিনি যমজ সন্তান লাভ করেছিলেন। দ্বিতীয়বার এই অবৈধ কাণ্ড-কারখানার জন্য প্রস্তুত ছিল না রোমের প্রজারা। তারা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল এ্যান্টনির বিরুদ্ধে। তাদের মহৎ ভরসার স্থল সেনানায়কের বিরুদ্ধে শাস্তির দাবী জানাতে লাগল পুনঃ পুনঃ। গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন অক্টেভিয়ান বর্তমানে নিজের কর্তব্য সম্বন্ধে।

ঠিক এই সময় সহোদরা অক্টেভিয়া সাক্ষাৎ করতে এলেন তাঁর সঙ্গে। স্বামীর উপেক্ষায় মলিন, পাণ্ডুর তাঁর চেহারা। জ্যেষ্ঠ তাকিয়ে থাকতে পারেন না কনিষ্ঠার দিকে।

অক্টেভিয়া বললেন, আমি স্বামীর কাছে যেতে চাই।

—স্বামীর কাছে যেতে চাও?

—হ্যাঁ। এখন বোধহয় আমার তাঁর কাছে যাওয়া উচিত। আপনি আমার যাবার ব্যবস্থা করে দিন।

—হ্যাঁ, তোমার যাওয়াই উচিত। অবিলম্বে সমস্ত ব্যবস্থা করছি।

অক্টেভিয়ানের কাছে এ ব্যবস্থা মন্দ বলে মনে হল না। অক্টেভিয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর এ্যান্টনির মনোভাব কি রকম দাঁড়ায় তা আগে জানা দরকার। তারপর সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। স্ত্রীর আগমন সংবাদে স্বামীর খুশি হবার কথা নয়। এ্যান্টনি অত্যন্ত বিরক্তি বোধ করলেন। প্রমাদ গুণলেন ক্লিওপেট্রা। তাঁর সুখময় জীবন বুঝি ভেঙ্গে যায়। তিনি আদর-সোহাগের মাত্রা চতুর্গুণ বাড়িয়ে দিলেন। প্রেমের শিকল আরো দৃঢ়ভাবে এ্যান্টনির গলায় বেড় দিল।

শেষ পর্যন্ত যা হবার তাই হল। স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চাইলেন না এ্যান্টনি। রূঢ়ভাবে সাক্ষাতের আকাঙ্খা প্রত্যাখান করলেন। গুঁড়িয়ে তচনচ হয়ে যাওয়া মন নিয়ে অক্টেভিয়া ফিরে এলেন রোমে। রাগে আগুন হয়ে উঠলেন অক্টেভিয়ান—এত

সাহস তাঁর সহোদরাকে অপমানিত করার স্পর্দ্ধা প্রদর্শন। আর কোন দ্বিধা নয়, প্রতিশোধ চাই। রোমের অন্যতম রক্ষক হিসেবে নিজের অধিকার হারিয়েছেন এ্যাণ্টনি। তাঁকে পর্যুদস্ত করে সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র অধিকারী হবেন অক্টেভিয়ান আগাষ্টাস সিজার।

রণদামামা বেজে উঠল। সৈন্য পরিপূর্ণ হয়ে অসংখ্য জাহাজ ভেসে চলল মিশরের উদ্দেশ্যে। এই সংবাদ এ্যাণ্টনির কানে পৌছাতেই তাঁর সম্বিত ফিরে এল। প্রথমে একটু বিচলিত হয়ে পড়েছিলেন, তার পরই আত্মপ্রত্যয়ের হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। সেনাপতি ক্যানিডিয়াসকে আদেশ দিলেন আটশ' জাহাজ সজ্জিত করবার। অক্টেভিয়ানের স্পর্দ্ধার উত্তর তিনি দেবেন।

যুদ্ধ আসন্ন। সুতরাং ক্লিওপেট্রাকে এখানে রাখা চলতে পারে না। অনুচরেরাও তাঁকে এই পরামর্শ দিল। ক্লিওপেট্রা যেতে চান না এখান থেকে। এ্যাণ্টনির বুকে মুখ রেখে নিজের আপত্তির কথা বললেন। তাঁকে বোঝালেন। অবশ্য শেষ পর্যন্ত ক্লিওপেট্রা রয়েই গেলেন। এই যুদ্ধের জন্য তিনি দু'শো জাহাজ দিয়েছিলেন। দিয়েছিলেন অজস্র অর্থ ও সৈন্য। তাদের রাণীকে দেখতে না পেয়ে যদি মিশরীয় সৈন্যরা বেঁকে দাঁড়ায়? এই বিষয়টি মনে উদয় হবার পর আর ক্লিওপেট্রাকে সাময়িকভাবে বিদায় দেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করলেন না এ্যাণ্টনি।

এই যেতে না চাওয়ার মধ্যে শুধু যে প্রেমের টান ছিল তা নয়; আতঙ্কও ছিল। চোখের আড়াল হলে যদি এ্যাণ্টনি ও অক্টেভিয়ানের মধ্যে একটা মিটমাট হয়ে যায়। যদি অক্টেভিয়ান শর্ত আরোপ করেন এ্যাণ্টনিকে ছাড়তে হবে ক্লিওপেট্রাকে। ফিরে যেতে হবে রোমে। তখন কোথায় যাবেন রাণী ক্লিওপেট্রা? তাঁর অবৈধ কার্য-কলাপের দরুণ মিশরীয় প্রজাদের হৃদয়েও তো আসন নেই। এ্যাণ্টনিকে সর্বদা রূপের জালে জড়িয়ে রাখাই হল যুক্তিযুক্ত। এতে তাঁর নিরাপত্তা বজায় থাকার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে না।

যুদ্ধ যখন আসন্ন তখন কয়েকটা ব্যাপারে এ্যাণ্টনির অবস্থা কিছু খারাপ হয়ে উঠল। তাঁর পক্ষীয় সেনানায়করা যুদ্ধস্থলে ক্লিওপেট্রার উপস্থিতি এবং এখানে দু'জনের বেপরোয়া মেলামেশা পছন্দ করছিলেন না। চরম হল, যেদিন তারা শুনল, প্রকাশ্য ভোজসভায় বাজি রেখে এ্যাণ্টনি পা টিপেছেন ক্লিওপেট্রার। ছি-ছি-ক্কারের বন্যা বয়ে গেল—মাথা নত হল রোমানদের। তারা ভেবে পাচ্ছে না, এ্যাণ্টনির মত মহাবীর একটি নারীর জন্য কেন এই ভাবে নিজের সুনাম বিসর্জন দিচ্ছেন। কয়েকজন তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, ক্লিওপেট্রাকে এখান থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়ার জন্য, কোনই ফল হল না। উন্মত্ত প্রেমিকরা বোধহয় অন্ধ ও বধির দুই হয়। উপদেশকারীরা রেহাই পেল না। চরম লাঞ্ছিত হলেন

ক্লিওপেট্রার হাতে। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই দল ত্যাগ করে যোগ দিলেন অক্টেভিয়ানের দলে।

যুদ্ধ আরম্ভ হল যথাসময়ে। ঘোরতর যুদ্ধে কিন্তু এ্যাণ্টনি শেষ রক্ষা করতে পারলেন না। অপরিণাম দর্শিতার দরুণ তাঁর সমস্ত জাহাজ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। চরম পরাজয়ের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন তিনি। কিন্তু এখনও আশা আছে। মিশরীয় বাহিনী রয়েছে তাঁর পিছনে । তাদের সাহায্যে অক্টেভিয়ানকে এবার প্রচণ্ড আঘাত হানতে হবে।

কিন্তু একি—! চোখ ফেরাতেই স্তম্ভিত হয়ে এ্যাণ্টনি দেখলেন, যুদ্ধস্থল ছেড়ে সমস্ত মিশরীয় জাহাজ চলে যাচ্ছে—চলে যাচ্ছে, মিশরের দিকেই। এই চরম দুঃসময়ে ক্লিওপেট্রা তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন, এও কি সম্ভব! কল্পনার রাজ্যে বাস করতে করতে এ্যাণ্টনি বাস্তবকে সম্পূর্ণ ভুলে গিয়েছিলেন। ক্লিওপেট্রা ভোলেননি। প্রিয়তমের শোচনীয় পরাজয় লক্ষ্য করে একনিষ্ঠা প্রেমিকার মত যুদ্ধস্থলে পড়ে থাকা তিনি সমীচীন মনে করলেন না। অক্টেভিয়ানের হাতে পড়লে তাঁর রক্ষা নেই একথা অজানা ছিল না। প্রেম থাক—প্রাণ বাঁচলে প্রেমিকের অভাব হবে না।

ক্লিওপেট্রা ভালবাসেন এ্যাণ্টনিকে। কিন্তু তার চেয়ে বেশি ভালবাসেন নিজের স্বার্থকে।

ক্লিওপেট্রা তাঁকে ছেড়ে চলে যাচ্ছেন দেখে অভিমানে চোখে জল এসে গেল এ্যাণ্টনির। তারপরই হিতাহিত জ্ঞানশুন্য হলেন। দলছাড়া হয়ে একটি ছোট জাহাজ নিয়ে ছুটলেন মিশরীয়দের দিকে। এ্যাণ্টনিয়ান জাহাজে ছিলেন ক্লিওপেট্রা। তাঁর কেমন মায়া হতে লাগল। ক্লিওপেট্রার আদেশে তুলে নেওয়া হল এ্যাণ্টনিকে এ্যাণ্টনিয়ান জাহাজে।

ক্লিওপেট্রার কাছে তিনি পৌছেই বুঝতে পারলেন তিনি বড় ভুল করলেন। মূঢ়ের মত লজ্জাজনক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। কোন মূল্যেই আর তাকে ধুয়ে ফেলা যাবে না। জাহাজের এক প্রান্তে গিয়ে তিনি ঘাড় হেঁট করে বসে রইলেন। তিনদিন আর মাথা তুললেন না। কিন্তু ওই পর্যন্তই। তিনদিন মন হাল্কা করার অবকাশ দেবার পর ক্লিওপেট্রা যখন তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন তখন সমস্ত এলোমেলো হয়ে গেল এ্যাণ্টনির। স্থূল জীবন-রসের সন্ধানে আবার আকুল হয়ে উঠলেন তিনি।

এই ভাবে চলল কিছুদিন। অক্টেভিয়ান চুপচাপ বসে নেই। তিনি শত্রুকে সমূলে উপড়ে ফেলবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। এ্যাণ্টনি দীনতার চরমে পৌছালেন। দুতের মারফত অক্টেভিয়ানকে জানালেন, একজন অতি সাধারণ মানুষের মত আমাকে

বাঁচতে দাও, আব কোন্ আকাঙ্খা নেই। যদি মিশরে থাকতে দিতে না চাও, এথেন্সে চলে যাব। বাকি জীবনটা ওখানেই কাটিয়ে দেব কোনরকমে।

ওই সঙ্গে ক্লিওপেট্রাও আর্জি পাঠিয়েছিলেন অক্টেভিয়ানের কাছে। তিনি প্রার্থনা জানিয়েছিলেন, আর কোন রাজ্যের উপর আমার লোভ নেই। মিশরের অধিকার শুধু দান করুন। ছেলে-মেয়েদের নিয়ে বাকি জীবন সুখে কাটাতে চাই।

অক্টেভিয়ান এতদিনে বুঝলেন তিনি প্রকৃতই জয়ী হয়েছেন। দূতের মারফত তিনিও সংবাদ পাঠালেন, রূপবতী রাণীর সমস্ত গুণাবলীর সংবাদ তিনি রাখেন। তাঁর সঙ্গলাভের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন। সমস্ত রকম সুযোগ-সুবিধা রাণীকে দেওয়া হবে। তবে এ্যাণ্টনিকে হত্যা করলে বা মিশর থেকে বিতাড়িত করলে তিনি সুখী হবেন।

অক্টেভিয়ানের বার্তা পেয়ে ক্লিওপেট্রা বিচিত্র হাসিতে মুখ ভরিয়ে তুললেন। তাঁকে বোধহয় এবার আবার নতুন সাজে সাজতে হবে। তিনি যেন নতুন প্রেমিকের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছেন রোমের সামরিক অধীশ্বর তাঁর রূপে মুগ্ধ।

রোমের দুতের সঙ্গে ক্লিওপেট্রার বারংবার সাক্ষাৎ হতে লাগল। ঈর্ষায় বুক জ্বলছে, কিন্তু এ্যাণ্টনির কিছুই করবার নেই। তিনি বুঝতে পেরেছেন, পরাজিত এ্যাণ্টনি এখন ক্রমেই ক্লিওপেট্রার কাছে গৌণ চরিত্র হয়ে পড়ছেন। ক্লিওপেট্রাও ওই একই কথা ভাবছেন, যে রসাল ফলের সমস্ত রস চুসে নেওয়া হয়েছে তাকে আর মুখের কাছে তুলে লাভ কি? তিনি জীবনকে ভালবাসতেন। এই রূপ, রস, গন্ধময় পৃথিবীতে আরো কিছুদিন সুখে থাকবার সুযোগ যদি কেউ করে দেয় তার দিকে হাত না বাড়ানোই বোকামি।

অক্টেভিয়ানের কাছ থেকে ঘন ঘন সংবাদ আসছে, তিনি সমস্ত হৃদয় দিয়ে রাণীকে চান, তাঁর দাসানুদাস হয়ে থাকবেন ইত্যাদি। সমস্তই জানতে পারছেন এ্যাণ্টনি। তিনি আর স্থির থাকতে পারলেন না। জোড়াতালি দিয়ে এক বাহিনী খাড়া করে আবার যুদ্ধ যাত্রা করলেন। ফল আশ্রানুরূপ হল না। আপ্রাণ চেষ্টা করেও পরাজিত হলেন। মহানায়ক এ্যাণ্টনির জীবনের সব আশা নির্মূল হল। এবার জেগে উঠল মনের মধ্যে প্রতিশোধ নেবার স্পৃহা। তাঁর জীবন এইভাবে নষ্ট হয়ে গেল যার খামখেয়ালীপনায়, সেই ক্লিওপেট্রার উপর প্রতিশোধ নেবেন।

কিন্তু কোথায় ক্লিওপেট্রা? আলেকজান্দ্রিয়ায় ছুটে এসে প্রাসাদের কক্ষে কক্ষে অনুসন্ধান করলেন, কিন্তু তাঁকে পাওয়া গেল না। এই সময় সংবাদ পাওয়া গেল তিনি আত্মহত্যা করেছেন। তিনি ভুলে গেলেন ক্লিওপেট্রার উপর প্রতিশোধ নিতে এসেছিলেন—বুকের মধ্যে হু হু করে উঠল। লীলারঙ্গী তাঁর শয্যাসঙ্গিনী চিরবিদায়

নিয়েছে, এ যে ভাবা যায় না! বেঁচে থাকার আর কোন অর্থ হয় না। জীবনের পরপারে প্রিয়তমার সঙ্গে মিলিত হবার জন্য তিনি তৎপর হলেন।

ক্লিওপেট্রা কিন্তু আত্মহত্যা করেননি। তিনি আশ্রয় নিয়েছিলেন এক সুদৃঢ় কীর্তিস্তম্ভে। এছাড়া উপায় ছিল না, তিনি জানতেন এ্যাণ্টনি তাঁকে হত্যা করবার জন্য ছুটে আসবেন। জীবন বাঁচাবার জন্য যে অক্টেভিয়ানের কাছে ছুটে যাবেন সে পথও বন্ধ। কারণ তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, অক্টেভিয়ান যা বলেছেন সমস্তই ফাঁকা বুলি, তাঁকে মুঠোর মধ্যে পেলেই নির্মমভাবে হত্যা করবেন।

নিজের মৃত্যু সংবাদ কৌশলে প্রচার করেছিলেন ক্লিওপেট্রা। তার ফল যে এতদূর গড়াবে বুঝতে পারেননি। সংবাদ পেলেন এ্যাণ্টনি ধারাল অস্ত্র দিয়ে নিজের দেহে আঘাত করেছেন। মৃত্যু হয়নি তবে মৃত্যুর মুখে তিনি। মন দুলে উঠল ক্লিওপেট্রার। প্রিয়তমকে নিজের কাছে নিয়ে আসবার জন্য লোক পাঠালেন। যন্ত্রণাকাতর এ্যাণ্টনি শুনলেন মারা যাননি ক্লিওপেট্রা। তাঁর মনে কি আনন্দের ছোঁয়াচ লাগল? তাঁর আহত দেহকে বয়ে নিয়ে যাওয়া হল কীর্তিস্তম্ভের কাছে। দরজা খোলা হল না। জানলা দিয়ে দড়ি ফেলে, বেঁধে উপরে তোলা হতে লাগল বীর সেনাপতিকে। সে এক মর্মান্তিক দৃশ্য। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছেন এ্যাণ্টনি—চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে। উপরে তুলে শোয়ান হল, সেবা শুশ্রূষার অপর্যাপ্ত ব্যবস্থা করলেন ক্লিওপেট্রা। কিন্তু জীবনী শক্তি তখন আর নেই। বহু কীর্তির নায়ক ও বহু অপযশের অধিকারী মার্ক এ্যাণ্টনি চিরবিদায় নিলেন।

ক্লিওপেট্রা কি পতিপ্রাণা নারীর মতই কেঁদেছিলেন?

অক্টেভিয়ান কিন্তু ক্লিওপেট্রাকে হাতের মুঠোর মধ্যে পেলেন না। এ্যাণ্টনির মৃত্যুর পর তিনি সসৈন্যে প্রবেশ করলেন আলেকজান্দ্রিয়ায়। তখন তাঁর চোখে রূপবতী রাণীকে দেখার নেশা। বলপূর্বক কীর্তিস্তম্ভ অধিকার করা গেল না। কৌশলের সাহায্যে দ্বার উন্মুক্ত করল রোমান সৈন্যরা। অক্টেভিয়ান প্রবেশ করলেন ভিতরে। মণিরত্ন খচিত গজদন্তের পালঙ্কের উপর বহুমূল্য পোশাকে সজ্জিতা ক্লিওপেট্রা শুয়ে আছেন। কিন্তু তাঁর দেহে প্রাণ নেই। বিষাক্ত সাপের ছোবল গ্রহণ করে আত্মহত্যা করেছেন। ক্লিওপেট্রার সমস্ত জীবনটাই নাটক, মৃত্যুও কম নাটকীয় নয়।

অক্টেভিয়ান স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সাহসী প্রেমিক রাসবিহারী বসু

গঙ্গার মোহানা পেরিয়ে জাহাজটি সবে সমুদ্রে পড়েছে।

জাপানি মালবাহী জাহাজ।

সুতরাং জাহাজে অল্প যাত্রীরই স্থান হয়েছে। এঁদের মধ্যে অধিকাংশই চলেছেন জাপানে। রেঙ্গুনে বা হংকং এও কেউ কেউ নামবেন। এই সাধারণ জাহাজে একজন বিশিষ্ট যাত্রীও আছেন। তিনি আর কেউ নন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ব্যক্তিগত প্রতিনিধি পি, এন, ঠাকুর।

ক্যাপ্টেন আগেই সংবাদ পেয়েছিলেন, কোনরকম প্রাকৃতিক দুর্যোগ হবার সম্ভাবনা নেই। আকাশ হাল্কা নীল রঙে রঞ্জিত। বায়ুর গতি জাহাজের সম্পূর্ণ অনুকূল। যাত্রীরা সম্পূর্ণ নিশ্চিত, কয়েকটা দিন নির্বিঘ্নে জলের উপর কাটিয়ে যে যাঁর গন্তব্যস্থলে নেমে যেতে পারবেন। যাত্রাপথটা কিন্তু সম্পূর্ণ নির্বিঘ্নে কাটল না।

আচম্বিতে একদল পুলিশ উদয় হল জাহাজে। যাত্রীদের মধ্যে সোরগোল পড়ে গেল। জল্পনায় মুখর হয়ে উঠল ডেক। অনেকের ধারণা হল, সোনার চোরাই কারবার যারা করে তাঁদের মধ্যে কেউ চলেছে এই জাহাজে। পুলিশ সুপার ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। ইংরাজ সরকারের চোখে ধুলো দিয়ে বিপ্লবী রাসবিহারী বসু নাকি এই জাহাজে চড়েই জাপান যাচ্ছেন। ক্যাপ্টেন মহা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। আক্ষেপ জানালেন গিয়ে পি, এন, ঠাকুরের কাছে। কেন তিনি আগেই যাত্রীদের ভালভাবে পরীক্ষা করে নেননি, তাহলে ইংরাজের মহাশত্রুকে জাহাজে স্থান দেবার ঝুঁকি নিতে হত না।

যা হোক শেষ পর্যন্ত পুলিশ রাসবিহারীকে জাহাজে খুঁজে পেল না। অথচ নির্ভরযোগ্য সূত্র ধরেই তারা এখানে হানা দিয়েছিল। অন্যান্য বহুবারের মত এবারও হাওয়ায় যেন মিলিয়ে গেলেন রাসবিহারী। জাহাজ একদিন জাপানে এসে পৌছাল। পি, এন, ঠাকুরকে অভ্যর্থনা করবার জন্য জাপানের উঁচু মহলের অনেকেই এসেছিলেন জাহাজ-ঘাটে। শ্রীঠাকুর হাসি মুখে অভ্যর্থনা গ্রহণ করলেন।

তিনি আতিথ্য লাভ করলেন নাকামুরার বাড়িতে। নাকামুরা সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না। জাপান সরকারের তিনি প্রখ্যাত মন্ত্রী ছিলেন। তাঁর বাইরের আবরণ গাম্ভীর্যপূর্ণ, লোকে তাঁকে ভয় পায়, এড়িয়ে চলতে চায়। বাইরে যাই হোক না কেন, প্রকৃতপক্ষে তিনি অতি সজ্জন ও সরল প্রকৃতির মানুষ। অতিথিকে কিভাবে

সমাদর করতে হয় তা তিনি জানতেন। কয়েকদিন ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার পর নাকামুরা অন্তর দিয়ে ভালবেসে ফেললেন পি, এন, ঠাকুরকে। ক্রমে রহস্য ফাঁস হয়ে গেল। তিনি জানতে পারলেন, তাঁর অতিথি রবীন্দ্রনাথের প্রতিনিধি পি, এন, ঠাকুর নন। বিপ্লবী রাসবিহারী বসু স্বয়ং।

এই কারচুপি ধরা পড়বার পর অন্যকোন গৃহস্বামী হলে নিজেকে নিরাপদ করবার জন্য সচেষ্ট হতেন। কিন্তু নাকামুরা অন্য ধাতুর তৈরি মানুষ। অতিথি হিসেবে যাঁকে বাড়িতে স্থান দিয়েছেন, তাঁকে বিপদে ফেলার কথা তিনি চিন্তা করতে পারেন না। রাসবিহারীকে অনুরোধ করলেন গৃহকর্তা, তাঁর বৈপ্লবিক জীবনের ঘটনা বিবৃত করতে। এই অনুরোধ রক্ষা না করার কোন সঙ্গত কারণ ছিল না। তিনি বলতে আরম্ভ করলেন। শ্রোতা নাকামুরা একা নয়, তাঁর একমাত্র তরুণী কন্যাও শোনবার আগ্রহ নিয়ে এসে বসেছেন। প্রথম দর্শনেই কুমারী ভারতীয় বিপ্লবীকে দেখেছেন বিশেষ একচোখে।

১৮৮০ সালে রাসবিহারী বসু জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা বিনোদবিহারী বসু বর্ধমান জেলার সুবলদহ গ্রাম পরিত্যাগ করে এই সময় চন্দননগরে এসে একখানি বাড়ি কেনেন। শিশু রাসবিহারীর ভাগ্যে এই সময় এক বিপর্যয় দেখা দিল, তাঁর গর্ভধারিণী দেহ রাখলেন। বিনোদবিহারীকে আবার এই সময় গভর্ণমেণ্ট প্রেসের হেড অ্যাসিস্‌টেন্ট হয়ে সিমলায় চলে যেতে হয়। ছেলেকে তিনি রেখে যান নিজের শ্বাশুড়ির তত্ত্বাবধানে।

চন্দননগর বিপ্লবীদের পীঠস্থান। ইংরেজকে তাড়াতে হবে এই ব্রত নিয়ে ওখানকার তরুণরা অনেকগুলি গুপ্তসমিতি গড়ে তুলেছিল। ডুপ্লে কলেজিয়েট স্কুলে পড়ার সময় রাসবিহারী এই রকম একটি দলে যোগ দিলেন। বলা বাহুল্য, এই সমস্তর প্রভাবে তাঁর পড়াশুনা বিশেষ অগ্রসর হল না। এই সময় বিনোদবিহারী ছুটিতে এলেন। ছেলের মনের ভাব আঁচ করে ছুটির শেষে তাকে নিয়ে ফিরে গেলেন সিমলা। গনগনে আগুনকে ছাই চাপা দিয়ে রাখা যায় না। রাসবিহারীকেও গৃহকোণে আটকে রাখা গেল না। তিনি নিজের সমস্ত মন প্রাণ সঁপে দিলেন দেশমাতৃকার সেবায়। তাঁর দ্বারা ইংরাজ সরকারের গুরুতর ক্ষতি সাধিত হতে লাগল। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় কেউ ঘুণাক্ষরেও আঁচ করতে পারল না, এই সমস্ত কাজ দেরাদুন ফরেষ্ট অফিসের সদা সহাস্যমুখ কেরানি রাসবিহারীর।

১৯১২ সালের ২৩শে ডিসেম্বর।

বঙ্গভঙ্গ রদ হবার পরই ক'লকাতা থেকে রাজধানী দিল্লীতে তুলে আনা হল। ২৩শে ডিসেম্বরের সেই কনকনে শীতের দিনে দিল্লী দরবারের আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন গভর্ণর জেনারেল লর্ড হার্ডিঞ্জ। নতুন রাজধানীকে সাজান হয়েছে নববধূর

সাজে। বিরাট ধুমধাম, বিরাট আয়োজন। ঐতিহাসিক দিওয়ান-ই-আম এ দরবার বসবে। ভারতের সমস্ত প্রান্তের রাজা, মহারাজা ও গণ্যমান্য ব্যক্তিরা আহূত হয়েছেন।

লাটবাহাদুরের শোভাযাত্রা আরম্ভ হল। পথের দু'পাশে লোকে লোকারণ্য। প্রথমে পদাতিক সৈন্যরা মার্চ করে এগিয়ে চলল। তারপর এক বিশাল হাতি, হাতির পিঠে কারুকার্য খচিত হাওদায় বর্ণাঢ্য পোশাকে সজ্জিত লাটবাহাদুর বসে আছেন। মসৃণগতিতে এগিয়ে চলেছে গাম্ভীর্যপূর্ণ মিছিল। হঠাৎ এক প্রচণ্ড শব্দ। হাতির মাহুত রক্তাক্ত শরীরে ছিটকে পড়ল কোথায়। লর্ড হার্ডিঞ্জ আহত শরীরে হুমড়ি খেয়ে পড়লেন হাওদার মধ্যে। ভাগগম্ভীর পরিবেশের উপর বিশৃঙ্খলার ঢল নামল।

জনতা চিৎকার করে উঠল, বোমা—বোমা ফেটেছে। সে স্থান ত্যাগ করবার জন্য হুড়োহুড়ি, ধ্বস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হয়ে গেল। পুলিশের দল তৎপর হয়ে উঠল। কিন্তু দুষ্কৃতকারীদের সন্ধান পাওয়া গেল না। হাওয়ায় মিলিয়ে গেলেন রাসবিহারী বসু ও বসন্ত বিশ্বাস। এই ঘটনার কিছুকাল পরেই সরকারের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ল তাঁর আসল পরিচয়। তিনি গা ঢাকা দিলেন। এরপর ইংরাজ সরকার ত্রাহি ত্রাহি ডাক ছাড়ল রাসবিহারীর অসমসাহসিক কার্যাবলিতে। ১৮৫৭-এ সিপাহী বিদ্রোহের মত আরেকবার বিদ্রোহ ঘটাবার চেষ্টা তিনি করেছিলেন, দলের একজনের বিশ্বাসঘাতকতার দরুণ সমস্ত পরিকল্পনা ফাঁস হয়ে গেল। এবার পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল যে, রাসবিহারীর পক্ষে স্বদেশে থাকা আদৌ নিরাপদ নয়। প্রবীণরা পরামর্শ দিলেন জাপানে চলে যেতে। আজকের মত তখন পাশপোর্টের তেমন কড়াকড়ি ছিল না। তিনি সহজেই পি. এন. ঠাকুরের ছদ্মবেশে গা ঢাকা দিতে পারলেন।

পিতা-পুত্রী হতবাক হয়ে বিপ্লবীর কাহিনী শুনলেন। মাতৃভূমির প্রতি এই প্রেমকে অভিভূত নাকামুরা বারংবার প্রশংসা করলেন। তাঁর কন্যা শুধুমাত্র অভিভূতা হলেন না, বিপ্লবীর সত্ত্বাকে অন্তঃস্থলে অনুভব করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। ক্রমে রঙ্গীন নেশা ধরে গেল মন্ত্রীকন্যার মনে। বিদেশি বিপ্লবীর কাছ থেকে দূরে দূরে থাকা তাঁর কাছে অসম্ভব হয়ে উঠল।

নারী হয়েও তিনিই প্রথমে নিজের মনোভাব প্রকাশ করলেন। জীবনের ফেলে আসা দিনগুলিতে রাসবিহারী নারীর সঙ্গে অন্তরঙ্গ হবার সুযোগ পাননি। অবশ্য সুযোগ পাননি বললে ভুল বলা হবে। ইচ্ছে থাকলে, সুযোগ করে নিতে চাইলে, তিনি সহজেই বিবাহিত পুরুষ বলে পরিচিত হতে পারতেন। কিন্তু তাঁর সময়ের অভাব ছিল। দেশের চিন্তায় এবং ওই সম্পর্কে নানা কাজে এত ব্যস্ত থাকতেন যে, মনে অন্য কিছুকে প্রশ্রয় দেবার অবসর ছিল না। এখন এই অনুভূতি তাঁকে বিচলিত করে তুলল। তিনি প্রেয়সীর আহ্বানে সাড়া না দিয়ে পারলেন না।

কয়েকদিন কাটল।

রাসবিহারী অনুভব করলেন, বেকার বসে থাকাটা ঠিক নয়। কোন কিছু করা প্রয়োজন। নিজের মনের কথা জানালেন তিনি তরুণী প্রেমিকাকে। যথাসময়ে কথাটা নাকামুরার কানে উঠল। একটা রুটির কারখানার ম্যানেজারের চাকরি তিনি সংগ্রহ করে দিলেন রাসবিহারীকে। প্রতিদিন কাজে যান বিপ্লবী। ছুটি হবার সময় মন্ত্রীকন্যা এসে উপস্থিত হন। সন্ধ্যার অন্ধকারে দু'জনের সময় অতিবাহিত হয় ঘনিষ্ঠ পরিবেশে।

ইংরাজ সরকার নীরবে বসে নেই। তাঁরা নিশ্চিন্ত হয়েছেন, যে কোন উপায়ে হোক রাসবিহারী জাপানে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। জাপান সরকারকে অনুরোধ করা হল তাঁকে গ্রেপ্তার করে ভারতে পাঠিয়ে দিতে। এই অনুরোধ রক্ষা না করার কোন কারণ নেই। রাসবিহারী ইংরাজদের অধিকারভুক্ত নাগরিক। সেখানে তাঁর নামে ওয়ারেণ্ট ঝুলছে। সুতরাং আন্তর্জাতিক আইন অনুসারে এই বিদেশিকে গ্রেপ্তার করে ভারতে পাঠিয়ে দিতেই হবে। এখন প্রশ্ন হল তাঁকে পাওয়া যাবে কোথায়?

অনুসন্ধান আরম্ভ হ'ল। শেষে নাকামুরার মত সম্ভ্রান্ত মন্ত্রীর বাড়িতেও পুলিশ চড়াও হল। কিন্তু রাসবিহারীকে পাওয়া গেল না। পুলিশ জেনে ফেলেছিল পি. এন. ঠাকুরের ছদ্মবেশেই তিনি এখানে এসেছেন। এমন কি এও তাদের জানা হয়ে গেছে, মন্ত্রীকন্যার সঙ্গে বিপ্লবীর মন দেওয়া, নেওয়া চলছে। পুলিশ মন্ত্রীকন্যার উপর দৃষ্টি রাখল। তিনি অভিসারে গেলেই আসামীকে হাতে-নাতে ধরা সম্ভব হবে। কিন্তু এত চেষ্টাতেও কোন ফল হল না।

রাসবিহারী নাগালের বাইরে রইলেন। তাঁর অবস্থান জানতেন একমাত্র তাঁর প্রেয়সী। সকলের দৃষ্টি বাঁচিয়ে তিনি আসতেন প্রতিদিন সাক্ষাৎ করতে।

এই রকম অবস্থায় পড়ে রাসবিহারী ক্রমেই হতাশ হয়ে পড়ছিলেন। ভারতবর্ষে পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে সাধারণের সঙ্গে মিশে থেকে প্রকাশ্যে ঘুরে বেড়িয়েছেন। এখানে তা হবার উপায় নেই। জাপানিদের সঙ্গে তাঁর আকৃতিগত পার্থক্য বিরাট। পুলিশ সহজেই তাঁকে চিনে ফেলবে।

মন্ত্রীকন্যা তাঁর মনের অবস্থা সহজেই অনুমান করেছিলেন।

মমতাভরা গলায় একদিন বললেন, তুমি ভীষণ মনমরা হয়ে পড়েছ না?

—এইভাবে কতদিন চলতে পারে বল?

—বেশিদিন চলতে পারে না আমিও জানি। পুলিশ একদিন ঠিক সন্ধান পেয়ে যাবে। আমার মাথায় একটা পরিকল্পনা এসেছে। তুমি সেইমতো কাজ করলে নিশ্চয় পুলিশের হাত থেকে রেহাই পেয়ে যাবে।

সাগ্রহে রাসবিহারী বললেন, কি বলতে চাইছ?

—জাপানের নাগরিকত্বের জন্যে তোমাকে আবেদন করতে হবে এখানকার নাগরিক হয়ে গেলে তুমি সমস্ত বিপদ থেকে মুক্ত হবে।

রাসবিহারী জানতেন জাপানি নাগরিকের কোন ক্ষতি করার সাধ্য অন্য কোন রাষ্ট্রের নেই। তবে সেই অধিকার লাভ করা যে সহজ নয় একথা কে না জানে। এই অসম্ভব কি ভাবে সম্ভব হ'বে জানতে চাইলেন।

—উপর তলার সঙ্গে দহরম মহরম থাকলে কিছুই অসম্ভব নয়।

—আবেদন পত্র মঞ্জুর হতে বেশ কিছু দিন সময় লাগবে। আমি কি পারব এতদিন পুলিশের চোখ বাঁচিয়ে লুকিয়ে থাকতে।

—এইভাবে তুমি বেশিদিন লুকিয়ে থাকতে পারবে না, আমি জানি।

—উপায়—?

মৃদু হেসে মন্ত্রীকন্যা বললেন, তোমাকে গেইসার ছদ্মবেশে থাকতে হবে।

আঁৎকে উঠলেন রাসবিহারী। সাধারণ নারী নয়, একেবারে গেইসার ছদ্মবেশে থাকতে হবে!

জাপানের এই লোভনীয় নারীদের কথা পৃথিবীর সব দেশের রসিকরাই কিছু কিছু জানেন। মূলতঃ দেহ বিক্রী করাই এদের পেশা—অথচ এদের বারবনিতা আখ্যা দেওয়া যায় না। হোটেল, রেস্তোরাঁ, বারে এই সুন্দরী গেইসারা থাকে। তারা খদ্দেরদের গান গেয়ে ও নেচে মনোরঞ্জন করে। আবার কেউ দেহের ক্ষুধা মেটাতে চাইলেও এরা হাসিমুখে আমন্ত্রণ গ্রহণ করে।

—তুমি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছ?

—এখন ঠাট্টা করার সময় নয়। গেইসার ছদ্মবেশে থাকলেই তুমি নিরাপদে থাকতে পারবে।

—আমাকে মানাবে কেন?

—ঠিক মানিয়ে যাবে।

তখনও খুঁত খুঁত করেন রাসবিহারী।

—তুমি একটা বিষয় একেবারেই লক্ষ্য করছ না। নারীলোভী পুরুষদের হাত থেকে আমি রক্ষা পাব কি ভাবে?

আবার হাসলেন মন্ত্রীকন্যা।

—তুমি বিন্দুমাত্র চিন্তিত হয়ো না। তোমাকে যাতে কেউ বিরক্ত করতে না পারে সে ব্যবস্থা আমি করব। এই অবসরে তোমাকে জাপানি ভাষাটাও শিখে নিতে হবে। ভবিষ্যতে কাজ দেবে।

নাগরিকত্ব লাভের আবেদন পত্র পাঠিয়ে দেওয়া হল।

রাসবিহারী গেইসার ছদ্মবেশে অন্যত্র গিয়ে বাস করতে লাগলেন। একরকম

প্রকাশ্যেই বলা চলে। তাঁর সঙ্গে রইল শুধু নাকামুরার একজন বিশ্বস্ত ভৃত্য। মন্ত্রীকন্যা প্রত্যহ আসেন। জাপানি শিক্ষার পাঠ যথানিয়মে চলতে থাকে। নিজেদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়েও আলোচনা চলতে থাকে।

এইভাবে কিছুদিন কেটে গেল।

একদিন মন্ত্রীকন্যা এসে বললেন, ব্ল্যাক ড্রাগনের কয়েকজন সদস্য তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন। রাসবিহারী বিস্মিত হয়ে প্রশ্ন করলেন, তাঁরা কে?

—গুপ্ত রাজতন্ত্রীদল। এঁরা যদি তোমাকে পছন্দ করেন, তাহলেই তুমি জাপানের নাগরিকত্ব পাবে। অপছন্দ হলে প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হতে পারে।

একটা অমঙ্গলের আশঙ্কায় দু'জনের মন দুলে উঠল। রাসবিহারী দেখলেন, তাঁর প্রিয়তমার দু'চোখ জলে ভরে উঠেছে। তিনি কিছুই বলতে পারলেন না। স্তব্ধভাবে কেটে গেল কিছুক্ষণ। শেষে মন্ত্রীকন্যাই নীরবতা ভঙ্গ করলেন, সত্যি যদি এমন দিন আসে আমি হারাকিরি করব! তুমিও আত্মহত্যা কর।

সত্যিই একদিন সেই চরম দিন উপস্থিত হল। ব্ল্যাক ড্রাগনের কয়েকজন সদস্য এলেন সাক্ষাৎ করতে রাসবিহারী বসুর সঙ্গে। তাঁরা অনেকক্ষণ ধরে নীরবে দেখলেন ভারতীয় বিপ্লবীকে। তারপর গোটা কয়েক প্রশ্ন করলেন। রাসবিহারী তৎপরতার সঙ্গে উত্তর দিলেন। উত্তর তাঁদের পছন্দ হল কিনা মুখ দেখে ঠিক বুঝতে পারা গেল না।

তাঁরা একসময় বিদায় নিলেন।

দিন কেটে যেতে লাগল। ব্ল্যাক ড্রাগনের কাছ থেকে কোন সংবাদ পাওয়া গেল না। এদিকে মন্ত্রীকন্যারও দেখা নেই। রাসবিহারী মহাচিন্তায় পড়ে গেলেন। আত্মহত্যা করার জন্য প্রস্তুত থাকা ছাড়া আর কোন পথ তিনি খোলা দেখলেন না। মনের অবস্থা এতদূর শোচনীয় এর আগে আর কখনও হয়নি।

সমস্ত ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটল একদিন।

হাসিমুখে এসে তাঁর প্রিয়তমা জানালেন, আমাদের জয় হয়েছে। তোমাকে পছন্দ হয়েছে ব্ল্যাক ড্রাগনের সদস্যদের।

সাগ্রহে রাসবিহারী বললেন, আমি কি জাপানের নাগরিকত্ব পেয়েছি?

—নিশ্চয়!

ঠিক সেই মুহূর্তে এই প্রণয়ী যুগলের মত এত খুশি বোধহয় জাপানে আর কেউ ছিল না। নাকামুরা এলেন। তিনি কন্যার মনোভাব আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। রাসবিহারীকে জাপানের অভিজাত পোশাক 'কিমশে' উপহার দিলেন এবং ওই সঙ্গে জানিয়ে দিলেন তাঁকে জামাতার পদে স্বীকার করে নিতে তাঁর বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই।

ভারতের দুর্দান্ত বিপ্লবী রাসবিহারী বসু জাপানি মন্ত্রী-কন্যার সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হলেন। তাঁদের বিবাহিত জীবন সুখের হয়েছিল কিন্তু দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পত্নীর মৃত্যুর পরও বেশ কয়েক বছর বেঁচে ছিলেন রাসবিহারী। পত্নীর একটিমাত্র উপহার কন্যাই তখন তাঁর একমাত্র অবলম্বন। তবে যাঁর সহায়তা না পেলে জাপানে একদিনও তিনি থাকতে পারতেন না, যাঁর প্রাণঢালা ভালবাসা তাঁকে নতুন করে বাঁচার জন্য উৎসাহিত করেছিল, প্রিয়তমা পত্নী অকালে তাঁকে ছেড়ে চলে যাওয়ার দুরন্ত অভিমান জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তাঁর ছিল।

জাপানের নাগরিকত্ব লাভ করেছিলেন তিনি ১৯২০ সালে। এত দূরে থেকেও জন্মভূমির স্বাধীনতা-চিন্তা তাঁর মনে সদা জাগরুক ছিল। ১৯২১ সালে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন "ইন্ডিয়ান ইণ্ডিপেণ্ডেন্স লীগ"। পরবর্তীকালে এই প্রতিষ্ঠানই "আজাদ হিন্দ ফৌজে" রূপান্তরিত হয়। জীবনের প্রান্তসীমায় এসে তিনি সাক্ষাৎ পেলেন সুভাষচন্দ্রের।

১৯৪৩ সালের ৪ঠা জুলাই রাসবিহারী তাঁর অবিস্মরণীয় বক্তৃতায় বললেন, "আমার দিন শেষ হয়ে এসেছে, শক্তি নিঃশেষ হয়ে আসছে। উপর থেকে ডাক আসতে আর বিলম্ব নেই। আজ দেবতার আশীর্বাদরূপে পেয়েছি সুভাষচন্দ্রকে। .... আমি সমস্ত ভার থেকে মুক্ত হলাম, নিশ্চিন্ত হলাম আমার জীবন ও মরণের একমাত্র চিন্তা·ভারতের স্বাধীনতা সম্পর্কে।"

মহাবিদ্রোহী দেশের সুযোগ্য সন্তান রাসবিহারী বসু ১৯৪৫ সালের ২১শে জানুয়ারি অমরলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন।

রঙ্গনায়ক চ্যাপলিন

হেটি নেই!

১৯২১ সালে লণ্ডনে পা দেবার পরই এই নিদারুণ সংবাদ পেলেন চার্লস চ্যাপলিন। নিউইয়র্ক থেকে স্বদেশের পথে যাত্রা করবার সময় স্থির করেছিলেন লণ্ডনে পৌঁছে হেটির সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। হেটিই এনেছিল তাঁর জীবনে প্রথম প্রেম। সে তাঁর জীবন-সঙ্গিনীও হতে পারত, কিন্তু হঠাৎ জল ঘোলা হয়ে উঠল। ছাড়াছাড়ি হয়ে গেল দু'জনের। হলিউডের প্রাচুর্য ও বৈচিত্র্যের মধ্যে থেকেও হেটির কথা বার বার ভেবেছেন চার্লস।

কিছুদিন আগে লণ্ডনে এসেছিলেন চার্লস। তখন হেটির সঙ্গে দেখা হয়নি। সে বেড়াতে গিয়েছিল আমেরিকায়। তার বিবাহিত জীবন কেমন কাটছে দেখার আগ্রহ চার্লসের। এবারও দেখা হল না, আর কোনদিন দেখা হবে না। পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিয়েছে হেটি। এরকম যে ঘটবে তা ভাবতে পারেন নি তিনি—জনবহুল লণ্ডন ফাঁকা মনে হতে লাগল বিশ্বের সেরা কৌতুক অভিনেতা চার্লি চ্যাপলিনের কাছে।

মুহ্যমান অবস্থায় ট্যাক্সি করে সেই সমস্ত জায়গায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন যেখানে, তিনি ও হেটি দেখা-সাক্ষাৎ করেছেন। অন্তরঙ্গভাবে বসে কথাবার্তা বলেছেন। স্মৃতির সমুদ্র মন্থন করতে করতেই তিনি এই সমস্ত জায়গায় ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। সান্ত্বনার আশায় কাতর হয়ে পড়েছিলেন। শেষে কেনিংটন গেটের কাছে এসে থামলেন। ট্যাক্সি থেকে নেমে তাকিয়ে রইলেন ট্রাম স্টপেজের দিকে।

এই প্রসঙ্গে চার্লস বলেছেন, "ট্যাক্সি ড্রাইভার ভেবেছে আমি বুঝি পাগল হয়ে গেছি। আমার চোখের সামনে বার বার একটি অভিজ্ঞ ঊনিশ বছরের যুবকের মুখ ভেসে উঠছে। আমি তাকে চিনি, আমার চেয়ে বেশি করে তাকে আর কেউ চিনতে পারে না। তার হৃদয় এক আশ্চর্য আনন্দে পরিপূর্ণ, সে তার প্রণয়িনীর প্রতীক্ষা করছে। চারটে বাজতে দেরি নেই। ঠিক চারটের সময় সে একদিন তার জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দের সন্ধান পেয়েছিল। এই তো সেই পথ। আজও কি এই পথ দিয়ে সে যাবে না? চারটে বাজে। একটি গাড়ি ছুটে আসছে। ট্রাম স্টপেজের কাছে এসে থামল। ওই গাড়ি থেকে কে নামবে—হেটি? আমি আগ্রহে তাকিয়ে

রইলাম। গাড়ি থেকে জনাকয়েক মেয়ে-পুরুষ নামল। এক বৃদ্ধা ও কয়েকটি ছেলে-মেয়েও নামল। হেটি নেই ওদের মধ্যে। সে নেই, চিরকালের মতই বিদায় নিয়েছে।

চার্লসের সঙ্গে হেটির আলাপ নাটকীয় ভাবেই হয়েছিল। উনিশ বছরের চার্লস তখন দক্ষিণ লণ্ডনের এক মিউজিক হলে অভিনয় করছেন। এক নৃত্য সম্প্রদায়ের সঙ্গে ওই হলেই হেটি সেদিন অভিনয় করতে এসেছিল। চার্লস উইংসের পাশে দাঁড়িয়েছিলেন। এক সময়. দৃষ্টি বিনিময় হল দু'জনের। দু'জনের মুখেই হাসি। জীবনে প্রথম অনাস্বাদিত এক শিহরণ অনুভব করলেন—প্রেমে পড়ে গেলেন চার্লস।

অভিনয়ের পর আলাপ হল দু'জনের। লাজুক চার্লস মোটামুটি ভালভাবেই আলাপ চালিয়ে গেলেন। স্থির হল আগামী রবিবার দিন দু'জনে দেখা করবেন। বেড়াতে যাবেন কোথাও। নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে চার্লস অপেক্ষা করতে লাগলেন। সে সময় তাঁর কেমন ভয় ভয় করছিল। ভয় নিজেকে নিয়ে নয়। ভয়, মেকআপ নেওয়া অবস্থায় হেটিকে সুন্দর দেখেছিলেন—মেক আপ না নেওয়া অবস্থায় সে যদি তত সুন্দর না হয়!

ভয় ক্রমে অস্থিরতায় এসে পৌঁছাল।

সে দিন ছিল রবিবার। সকাল থেকেই বিকেলের জন্য ব্যস্ততা ছিল চার্লসের। কি পোশাক পরে হেটির সঙ্গে দেখা করতে যাবেন তা নিয়েই তাঁর কম চিন্তা ছিল না। শেষ, পর্যন্ত কালো ফ্রক কোট পড়েছেন, হাল্কা রং-এর ট্রাউজার। হাতে দস্তানা ও ছড়ি নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন নির্দিষ্ট জায়গায়।

হেটি এল। তাকে দেখে সমস্ত ভয়, সমস্ত অস্থিরতা দূর হল চার্লসের। মেকাপের বাইরে সে আরো সুন্দর। এতটা তাঁর সত্যি কল্পনার অতীত ছিল। অনেক কথা হল দু'জনের। দু'টি তরুণ হৃদয় পরিপূর্ণভাবে রঙ্গীন হয়ে উঠল। এক সময় দু'জনে দু'জনের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। তারপর ঘন ঘন সাক্ষাৎ হতে লাগল।

পরিস্থিতি এমন দাঁড়াল, হেটিকে একদিন দেখতে না পেলে চার্লস মনমরা হয়ে পড়তেন। লণ্ডনের বাইরে থাকলেও তিনি দূরত্বকে গ্রাহ্য করতেন না। অভিনয়ের অবসরে ছুটে আসতেন হেটির কাছে। কিন্তু এই হৃদয়াবেগকে দু'বছরের বেশি হেটি প্রশ্রয় দেয়নি। সে সরে গিয়েছিল তাঁর কাছ থেকে। এই সময় চার্লস আমেরিকা যাবার আহ্বান পেলেন। হেটির অভাবে বৃহত্তর জীবনে প্রবেশ করার মুখে তিনি বিমর্ষ ছিলেন সন্দেহ নেই। তার বিয়ের সংবাদ পেলেন ওখানে গিয়ে।

এইভাবে তাঁর প্রথম প্রেম শেষ হল।

জীবদ্দশায় খুব কম মানুষই যে সৌভাগ্য অর্জন করতে পারে, চার্লস চ্যাপলিন

সহজেই তা পেরেছিলেন। তিনি আজ কিংবদন্তীর নায়ক। ধাপে ধাপে এগিয়ে প্রবীণ বয়সে বিরল সৌভাগ্যকে করায়ত্ত করা হয়ত সম্ভব হয়। কিন্তু চার্লস তার ব্যতিক্রম। পঁচিশ বছরেই তিনি বিশ্ববিখ্যাত—অপর্যাপ্ত অর্থের মালিক। অথচ তাঁর শৈশব কেটেছে চরম দারিদ্র্যের মধ্য দিয়ে। পেট ভরে দু'বেলা আহারের চিন্তা তখন বিলাস ছাড়া আর কিছু ছিল না।

১৮৮৯ সালের ১৬ই এপ্রিল চার্লস যেদিন পৃথিবীর প্রথম আলো দেখেন সেদিন তাকে কেউ সাদরে গ্রহণ করেননি। তাঁর বাবা মিস্টার চ্যাপলিন প্রতিভাধর হলেও অভাবগ্রস্ত মানুষ। নানা হলে গান গেয়ে বেড়ান। গানের স্বরলিপি ছাপিয়েও পয়সা রোজগার করবার চেষ্টা করেন। মা হলেন নর্তকি। দু'জনের রোজগারেও সংসার চলে না। কারণ অধিকাংশ সময়ই দু'জনে প্রোগ্রাম পান না।

এই অভাবের সংসারে হঠাৎ শোক নেমে এল। উদয়াস্ত পরিশ্রম করে মিস্টার চ্যাপলিনের স্বাস্থ্য ভেঙ্গে গিয়েছিল। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সে তিনি মারা গেলেন। সংসারে অভাব আরো বেড়ে গেল। মা অসুস্থ হয়ে পড়ায় আর স্টেজে যেতে পারেন না। মাত্র ন'বছর বয়সি বড় ভাই সিডনি এক গির্জার সামনে লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে এক বাটি মটরশুঁটির সুপ নিয়ে আসেন। তাই খেয়ে তাঁদের প্র বাঁচাতে হয়।

শেষে সিডনি ও চার্লস রাস্তায়. নেমে পড়লেন। দু'টি ছোট্ট শি ু নাচ দেখিয়ে বেড়ায়। যাদের মায়া হয় তারা পয়সা দেয়। নাচের তালিম দেন মা। নানা অঙ্গভঙ্গী করে ক্যারিকেচার করে দেখান। পরবর্তী জীবনে মা'র এই শিক্ষা চার্লসকে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিল।

দিন কেটে চলল। ইতিমধ্যে দু'বছর স্কুলেও পড়েছেন দু'জনে। আবার ফিরে এসেছেন রাস্তায় নাচের আসরে। ন'বছর বয়সে চার্লস জ্যাকসন নামে এক স্কুল মাস্টারের নজরে পড়লেন। সে ভদ্রলোক বাচ্চাদের নাচের দল গড়ার তোড়জোড় করেছিলেন। চার্লসের নাচে মুগ্ধ হয়ে তাঁকে দলে নিয়ে নিলেন। নির্দিষ্ট আয়ের ব্যবস্থা হল। জ্যাকসনের দল নানা জায়গা ঘুরে প্রোগ্রামে করল।

ওখান থেকে ছাড়া পেয়ে কিছুদিন এধার-ওধার করবার পর কার্ণোর দলে এসে ঢুকলেন চার্লস। বলতে গেলে আগামী দিনের বিরাট সৌভাগ্যের সূচনা তাঁর এখানেই হল। সেকালে কার্ণোসম্প্রদায়ের বিশেষ নামডাক ছিল। এখানে চার্লস নক্সার অভিনয় করতে আরম্ভ করলেন। তাঁর স্বভাবসিদ্ধ হাস্যরসাত্মক অভিনয়ের সূত্রপাত হল। অপ্রত্যাশিত ভাবে ১৯১০ সালে আমেরিকা যাবার সুযোগ এসে গেল। আমেরিকার কোন এক প্রমোদ প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কার্ণোর নক্সাগুলি অভিনয় করবার অনুমতি চাওয়া হল এবং ওই সঙ্গে সিডনি চ্যাপলিনকে নিয়ে যাওয়ার কথা উঠল।

কার্ণো রাজি হলেন না। যদিও সিডনি তাঁর প্রধান অভিনেতা। তিনি ছোটভাই চার্লসকে নিয়ে যাবার অনুমতি দিলেন। চার্লস আমেরিকা পৌছালেন। নানা শহরে অভিনয় করে বেড়ালেন। তাঁর অভিনয় দেখে লোকে হাসতে হাসতে পাগল হয়ে যাবার দাখিল। এরপর এল স্মরণীয় ১৯১৩ সাল। যে বছর তিনি চলচ্চিত্রে যোগদান করলেন। অচিরেই ক্যামেরার সামনে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দিলেন চার্লস। লোকে আকুল আগ্রহে চার্লি চ্যাপলিনের অভিনয় দেখবার জন্য অপেক্ষা করে থাকতে লাগল। সমস্ত পৃথিবীতে তাঁর নাম ছড়িয়ে পড়ল। প্রতিটি মহাদেশে তাঁর ছবি দেখবার জন্য চরম উন্মাদনা দেখা দিল। সপ্তাহে পঁচিশ পাউণ্ড আয়ে চলচ্চিত্রে যোগ দিয়েছিলেন চার্লস, মাত্র কিছুদিনের মধ্যেই সপ্তাহে দু'হাজার পাউণ্ডের চুক্তিতে তিনি স্বাক্ষর করলেন। এখানেই শেষ নয়, লাফিয়ে লাফিয়ে তাঁর বাজার দর ঊর্ধ্বগামী হতে লাগল।

এর পরের ইতিহাস চার্লস চ্যাপলিনের জীবনের জয়যাত্রার ইতিহাস, শুধু অভিনয় নয়, পরিচালনার ক্ষেত্রেও তিনি অবতীর্ণ হলেন। বলা বাহুল্য, এই ক্ষেত্রেও তিনি অভূতপূর্ব সাফল্য লাভ করেছেন। তিনি এই সময় কয়েকজনের সহযোগিতায় বিখ্যাত চিত্র পরিবেশক প্রতিষ্ঠান "ইউনাইটেড আর্টিষ্ট" প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর পরিচালিত ও অভিনীত অসংখ্য নির্বাক ও বহু সবাক চিত্রের মধ্যে সিটি লাইট, গ্রেট ডিক্টেটর, গোল্ডরাশ, ভার্দু ও লাইম লাইট অবিস্মরণীয়।

পরিতাপের বিষয়, এই প্রতিভাধর শিল্পীকে মার্কিন সরকার কমিউনিষ্ট অপবাদ দিয়ে আমেরিকা থেকে বহিষ্কার করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে অন্যতম অভিযোগ হল, দীর্ঘদিন ধরে আমেরিকায় বাস করেও তিনি সেখানকার নাগরিকত্ব নেননি। এরপর বৃদ্ধ চার্লস সুইজারল্যাণ্ডে স্থায়ীভাবে বসবাস করতেন। তখনও তাঁর ক্লান্তি নেই। বিশ্বের গুণগ্রাহী দর্শকের সামনে আবার তিনি নিজের অতুলনীয় অভিনয় ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ পরিচালনা নিয়ে উপস্থিত হবার জন্য তৎপর।

চার্লসের জীবনে দ্বিতীয় প্রেম এল ১৯১৮ সালে।

তখন তিনি নিজের 'শোল্ডার আর্মস' ছবি নিয়ে বিশেষ ব্যস্ত। দেখা হয়ে গেল থীলড্রেড হ্যারিসের সঙ্গে। হেটির সঙ্গে ছাড়াছাড়ি হবার পর তিনি মেয়েদের এড়িয়ে গেছেন। তাছাড়া কয়েক বছর কেটেছেও কাজের উন্মাদনার মধ্যে দিয়ে। অন্য কিছু ভাববার অবসর পাননি। থীলড্রেডকে দেখে ভাল লেগে গেল।

ষোড়শী সুন্দরী থীলড্রেড কয়েকটি ছবিতে অভিনয় করেছে। তার মা ষ্টুডিওর কর্মী। আলাপ হল দু'জনের। থীলড্রেড যে চার্লসকে দেখে মুগ্ধ হবে তাতে বৈচিত্র্যের কিছু নেই। পৃথিবীব্যাপী যশের অধিকারী প্রচণ্ড ধনী এই তরুণ যে কোন

তরুণীর মনেই হিল্লোল তুলতে সক্ষম। প্রথম সাক্ষাতের মাস কয়েক পরে এক পার্টিতে দ্বিতীয় সাক্ষাৎ হল দু'জনের। থীলড্রেডের জানা ছিল, এই পার্টিতে চার্লস আসছেন। সে অপূর্ব সাজে নিজেকে সাজিয়ে এসেছিল।

নৃত্যের সঙ্গী হয়ে দু'জনে দু'জনের কণ্ঠলগ্ন হলেন। নাচের মধ্যেই কথাবার্তা চলতে লাগল। ক্রমে থীলড্রেডের আকর্ষণ চার্লসকে নেশাতুর করে তুলল। এই ভিড়ের মধ্যে থেকে তাকে কোন একান্ত পরিবেশে নিয়ে যাবার জন্য মন উন্মুখ হয়ে উঠল। মনের অভিপ্রায় জানতেই থীলড্রেড রাজি হয়ে গেল। ওখান থেকে দু'জনে এসে বসলেন নির্জন সমুদ্রতীরে। জ্যোৎস্না স্নাত সন্ধ্যা। প্রাকৃতিক পরিবেশ মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে। চার্লস নিজেকে উজাড় করে দিলেন। থীলড্রেডও নিজেকে গোপন করল না।

এরপর নিয়মিত দেখা-সাক্ষাৎ হতে লাগল। থীলড্রেড যে স্টুডিওতে কাজ করেছিল সেখানে গাড়ি নিয়ে অপেক্ষা করেন চার্লস। তারপর দু'জনে গিয়ে বসেন সমুদ্রতীরে। এই ভাবেই দিন বেশ কাটছিল। হঠাৎ দু'জনের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়ালেন থীলড্রেডের মা। তিনি মেয়েকে জানালেন, এই মেলামেশা ঠিক হচ্ছে না। কারণ তার বিয়ের বয়স এখনও হয়নি। বেশি বাড়াবাড়ি করলে এখান থেকে অন্য কোথাও তাকে নিয়ে যাবেন। এই সমস্ত কথা চার্লসকে জানাবার পর, অসহায় গলায় থীলড্রেড বলল, কি হবে?

—তুমি এখানেই থাকবে। আমাদের বিয়েটা বরং তাড়াতাড়ি সেরে ফেলা ভাল।

চার্লসের কথায় সঙ্গে সঙ্গে রাজি হয়ে গেল থীলড্রেড। তবে সমস্ত কাজ গোপনে সারতে হবে। জানাজানি হয়ে গেলেই ভণ্ডুল হয়ে যাবার সম্ভাবনা। পরের রবিবারে থীলড্রেডকে সঙ্গে নিয়ে গাড়িতে সাণ্টা অ্যানায় গেলেন চার্লস। খোঁজাখুঁজি করে যদিও বা একজন পাদ্রির সন্ধান পাওয়া গেল—বাড়ি গিয়ে জানা গেল জরুরী কাজে কয়েকদিনের জন্য কোথায় গিয়েছেন। অগত্যা বিয়ে না করেই ফিরে আসতে হল। ইতিমধ্যে চার্লসের ভাবী শ্বাশুড়ি ব্যাপারটা আঁচ করে ফেলেছেন। যা হোক, শেষ পর্যন্ত তিনি রাজি হলেন। আর ওই বছরই ২৩শে অক্টোবর চার্লস বিবাহিত জীবনে প্রবেশ করলেন।

এতটা কেউ আশা করেনি। তাঁর কাণ্ডকারখানায় হলিউড হতবাক। সকলেই এই মেলামেশার কথা জানতেন। গুরুত্ব দেবার কিছু ছিল না। এরকম হয়েই থাকে। শেষ পর্যন্ত ওই সাধারণ অভিনেত্রীকে চার্লস বিয়ে করে বসবেন, হতবাক হবার মত ব্যাপার বইকি। যা হোক হনিমুন করতে নবদম্পতি ক্যাটেলিনা দ্বীপে চলে গেলেন।

স্বপ্নের মধ্যে দিয়েই ওখানে দিনগুলি কাটল। ওখান থেকে ফিরে এসেও মাসখানেক চমৎকার ভাবে কাটালেন চার্লস। তারপরই তাঁর জীবনে অশান্তি দেখা

দিল। থীলড্রেডের সংসারের দিকে মন নেই। সে নামকরা অভিনেত্রী হতে চায়। চার্লস তাকে বোঝালেন, স্ত্রী ঘরের শোভা হয়ে থাকবেন এই তিনি চান। অভিনেত্রীর জীবন সুখের হয় না, ও পথ স্ত্রীকে মাড়াতে দেবেন না।

থীলড্রেডের মনের গঠন অন্য ধরনের। সে স্বামীর কথা গ্রাহ্যের মধ্যে না এনে অন্য একটি চিত্র প্রতিষ্ঠানে চুক্তিভুক্ত হল। চার্লস বিশেষ ক্ষুব্ধ হলেন। থীলড্রেড নির্বিকার। সে নিজের ইচ্ছে মতই কাজ করবে। বাড়িতে নিয়মিত বর্ণাঢ্য পার্টির আয়োজন হতে লাগল। হৈ-হল্লায় বাড়ির শান্তপরিবেশ শোচনীয় রকমের বিরক্তিকর হয়ে উঠল। স্টুডিওতে সারাদিন পরিশ্রম করতে হয় চার্লসকে। সন্ধ্যায় বাড়ি ফিরে এই বিরক্তিকর পরিবেশে কোন মতেই নিজেকে খাপ খাওয়াতে পারেন না তিনি। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মতান্তর মনান্তরে পরিণত হল ক্রমে। হৈ-হল্লা এড়াবার জন্য চার্লস প্রথমে ড্রইংরুমে যাওয়া ছাড়লেন, তারপর বাড়ি আসাই বন্ধ করলেন।

তাঁর এই দাম্পত্যজীবন একবছরের বেশি স্থায়ী হয়নি। থীলড্রেড সন্তানসম্ভবা না হলে স্থায়ীত্ব আরো কম হত। ছেলে হল যথা সময়ে। কিন্তু তিনদিনের বেশি তাকে বাঁচান গেল না। চার্লস আশা করলেন, এবার অন্তত থীলড্রেড নিজেকে সংযত করবে। স্বামী ও সংসার ছাড়া আর কিছু চাইবে না। বাস্তবে কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটল না। কয়েক দিন চুপচাপ থাকার পর আবার হৈ হৈ আর ককটেল পার্টি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল থীলড্রেড। সুতরাং বিবাহ-বিচ্ছেদ অনিবার্য হয়ে উঠল।

বিবাহ-বিচ্ছেদের পর চার্লস মনমরা হয়ে বসে থাকেননি। একের পর এক ছবি তুলে গেছেন। শেষে পরিশ্রান্ত হয়ে ইউরোপ ও এশিয়া বেড়িয়ে এসেছেন। জাপানে তো তাঁর প্রাণ নিয়ে টানাটানি হয়েছিল। ওখানকার এক গুপ্ত সমিতি তাঁকে মেরে ফেলার ষড়যন্ত্র করে। ভাগ্য সুপ্রসন্ন থাকায় শেষ পর্যন্ত তিনি বেঁচে গেলেন।

হলিউডে ফিরে এসে "দি গোল্ড রাশ" ছবির কাজে হাত দিলেন। কাহিনী রচনা যখন শেষ করলেন তখনই চার্লসের ধারণা হয়েছিল, "দি গোল্ড রাশ" তাঁকে অনেক সুনাম, অনেক অর্থ এনে দেবে। তাঁর এই আশা চুড়ান্তভাবে ফলবতী হয়েছিল। সমস্ত কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবার পর নায়িকা নির্বাচনে তিনি তৎপর হলেন। নামকরা অভিনেত্রীদের উপর মোহ কোনদিনই ছিল না চার্লসের। নতুনদের সুযোগ দেওয়া তিনি পছন্দ করতেন। প্রচুর আবেদনপত্র এসে পৌছাল। তাদের মধ্যে থেকে মনমতো কাউকে পেলেন না চার্লস।

শেষে এল লেলিটা ম্যাকমারে। দুরন্ত উচ্ছ্বল প্রকৃতির ষোল বছরের মেয়ে। অপূর্বসুন্দরী বলতে যা বোঝায় তাই। স্টুডিওর কাছাকাছি একটি বাড়িতে মা, দিদিমা ও দাদামশাই-এর সঙ্গে থাকে। চলচ্চিত্রে অভিনয়ে তার অভিজ্ঞতা ছিল। চটকদার পোশাক পরা, স্পর্ধিতা যৌবনা লেলিটাকে খুঁটিয়ে দেখলেন চার্লস। স্ক্রীন টেষ্ট

নেবার পর তাকে মনোনিত করলেন। লেলিটা ম্যাকমারে নামটা পছন্দ হল না, বদলে নাম দিলেন, লীটা গ্রে।

সুটিং আরম্ভ হল। স্টুডিও মহলের সকলে লক্ষ্য করলেন, লীটাকে সব সময় কাছে কাছে রাখেন চার্লস। সকলে বুঝলেন, চার্লসের মনে আবার রঙ্গীন নেশা ধরেছে। থীলড্রেড তাঁর হৃদয়ের যে অংশ খালি রেখেছিল লীটাকে দিয়ে তা ভরিয়ে নিতে চাইছেন। সম্ভব কি? সংশয় চার্লসের মনেও ছিল। তাই বোধহয় তিনি সাহিত্যিক বন্ধু টুলির মত জানতে চাইলেন লীটা সম্পর্কে।

টুলি বললেন, সুন্দরী মেয়ে, এই পর্যন্ত। এর বেশি কিছু নয়।

চিন্তিত গলায় চার্লস বললেন, আমারও তাই ধারণা। কাল ও তো বলছিল, আমি চার্লস চ্যাপলিন বলেই আমার প্রেমে পড়েছে। কেরানি হলে ও আমাকে মোটেই চাইত না।

কিন্তু তখন এমন অবস্থা যে ইচ্ছে থাকলেও সরে আসতে পারেন না। তাঁর মত রুচিবান লোকের পক্ষে তা সম্ভব নয়। লীটার রূপ তাঁকে তীব্রভাবে আকর্ষণ করেছে। আকণ্ঠ তার প্রেমে ডুবে গেছেন। সুতরাং বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে গেল। হৈ হৈ না করে অনুষ্ঠান চুপিচুপি সারার ইচ্ছেই তাঁর ছিল। কাউকে কিছু না জানিয়ে, লীটার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে নিয়ে একদিন তাদের মেক্সিকোর গ্রামের বাড়িতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। এত সতর্কতা সত্ত্বেও কিছু হল না। সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা পিছু নিয়ে পৌঁছাল সেখানে।

বিয়ে হয়ে গেল।

প্রেমিক যুগল দম্পতিতে পরিণত হলেন। আবার চার্লস দলবল নিয়ে ট্রেনে উঠলেন হলিউডের উদ্দেশ্যে। সাংবাদিকরাও আছেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করে তারা নবদম্পতিকে অস্থির করে তুলল। অগত্যা উপায়ান্তর না দেখে চার্লস চেন টেনে ট্রেন থামালেন। তারপর লীটার হাতধরে গ্রামের মেঠো পথ দিয়ে, একটি খামারবাড়িতে পাশ কাটিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

বিচিত্র হানিমুনের রেশ কাটতেই চার্লস নতুন করে বুঝতে পারলেন তিনি প্রচণ্ড ভুল করেছেন। বিয়ের আগে যে সংশয় তাঁর মনে দানা বেঁধেছিল তা উপেক্ষা করা তাঁর উচিত হয়নি। তিনি তো তখনই বুঝতে পেরেছিলেন, লীটা অন্তসারশূন্য। তবে তখন তাঁর আশা ছিল, সে নিজেকে সামলে নেবে। তাঁর সঙ্গে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেবার আপ্রাণ চেষ্টা করবে।

কার্যক্ষেত্রে থীলড্রেডেরই আরেক রূপ তিনি দেখতে পেলেন লীটার মধ্যে। সাংসারিক বিষয়ে তার কোন জ্ঞান নেই, শেখবার ইচ্ছেও নেই। চার্লসের বীভারলি হিলসের বাড়ি লীটার অসংখ্য বন্ধু-বান্ধবীদের গল্প-গুজবে সব সময় গমগম করতে

লাগল। মদের স্রোত বইল, অর্থও খরচ হতে লাগল জলের মত। চার্লস অস্থির হয়ে উঠলেন। এ সমস্ত বন্ধ করে দিতে বললেন স্ত্রীকে। স্বামীর কথা গ্রাহ্য করার মত মেয়ে লীটা নয়, সে বন্ধু-বান্ধবীদের সঙ্গেই হৈ-হল্লায় মেতে রইল।

এইভাবে যখন দিন চলছে, হঠাৎ চার্লস ঘোষণা করলেন, 'গোল্ড রাশে' লীটা অভিনয় করবে না। তাকে নিয়ে যে কয়েক হাজার ফুট ছবি তোলা হয়েছিল তা নষ্ট করে ফেলা হল। এতে অবশ্য কেউ বিস্মিত হলেন না। কারণ লীটা তখন সন্তান সম্ভবা। চার্লস হয়ত নিজের সন্তানের মাকে আর অভিনেত্রী হিসেবে দেখতে চান না। আসল ব্যাপার তা নয়। চার্লস চিন্তা করে দেখেছেন, তাঁর যা ক্ষতি হবার হল, 'গোল্ড রাশে'র আর ক্ষতি করা কেন। কাজেই লীটা 'গোল্ড রাশ' থেকে বাদ পড়ল।

এতেও তার চৈতন্যোদয় হল না। ছেলের জন্ম দেবার পরই আবার সে মেতে উঠল আগেকার মত হৈ হল্লায়। চার্লসের তখন বিচিত্র জীবন। একধারে 'গোল্ড রাশ' নিজের প্রতিভার চূড়ান্ত প্রতিফলনের প্রয়াস করছেন, অন্যধারে শোচনীয়ভাবে জর্জরিত হচ্ছেন মনের অশান্তিতে। লীটাকে আপ্রাণ ভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেন, অর্থ থাকলেই তার অপব্যয় করতে হবে এটা ঠিক নয়। তিনি শান্তিপ্রিয় মানুষ। তিনি স্ত্রীর সঙ্গে নিভৃতে দিন অতিবাহিত করা পছন্দ করেন।

এত তত্ত্ব-কথা শুনতে রাজি নয় লীটা। ঝগড়া পাকিয়ে ওঠে। লীটার তীব্র শ্লেষ আর বিদ্রূপের মুখে দাঁড়াতে পারেন না চার্লস। অধিকাংশ সময়ই বাড়ির বাইরে থাকেন। স্টুডিওতে কাজ না থাকলে ম্যারিয়ান ডেভিসের বাড়িতে গিয়ে গল্পগুজব করেন। বাড়ি ফেরেন অনেক রাত্রে। ইতিমধ্যে অবশ্য তিনি দ্বিতীয় সন্তানের জনক হয়েছেন।

পরিস্থিতি একদিন চরমে উঠল। স্টুডিওতে হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর চার্লস বাড়ি ফিরলেন মাঝরাতে। বাড়িতে পা দিয়ে তাঁর মনে হল এ যেন অন্য কোথাও তিনি এসেছেন। লীটার বন্ধু-বান্ধবরা মাতাল হয়ে বেআব্রু অবস্থায় উচ্ছৃঙ্খলতার চরম পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে। আর ভদ্রতা বজার রাখতে পারলেন না চার্লস। রাগে তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। তিনি সকলকে বাড়ি থেকে বার করে দিলেন। লীটা নিজেকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করল। সেই রাত্রেই সে বাপের বাড়ি চলে গেল এবং কয়েকদিনের মধ্যেই বিবাহ-বিচ্ছেদের মামলা আনল আদালতে।

লীটার আইনজ্ঞ, আদালতের সাহায্যে চার্লসের সমস্ত কিছু আটকের ব্যবস্থা করলেন। কিছুই বাদ পড়ল না—বাড়ি, স্টুডিও, ব্যাঙ্কব্যালেন্স। শোচনীয় আর্থিক দুরাবস্থা দেখা দিল চার্লসের। লক্ষ লক্ষ ডলার ব্যাঙ্কে রয়েছে, অথচ এক কপর্দকও

তার থেকে খরচ করবার অধিকার নেই। অবস্থার বিপাকে একদিন এক অপরিচিত ট্যাক্সি ড্রাইভারের বাড়িতে পর্যন্ত রাত কাটাতে হল। এদিকে লীটা কাগজে একের পর এক বিবৃতি দিয়ে চলেছে। সমস্তই ভিত্তিহীন। স্বামীকে চরিত্রহীন প্রতিপন্ন করবার আপ্রাণ চেষ্টায় সে তখন মরীয়া।

যথাসময় আদালতে মামলা উঠল। অনেক জল ঘোলা হবার পর বিবাহ-বিচ্ছেদ হল দু'জনের। চার্লস দশলক্ষ ডলারের উপর খেসারত দিয়ে বিরক্তিকর জীবন থেকে অব্যাহতি পেলেন। হাঁপ ছেড়ে বাঁচবার জন্য এর চেয়ে বেশি ডলার লীটা দাবী করলেও তিনি দিয়ে দিতেন। যাক, আর মন চিন্তায় ভারাক্রান্ত হবে না, প্রাণ ঢেলে ছবির কাজ করতে পারবেন।

বলতে গেলে মনকে আরো হাল্কা করবার জন্য তিনি ভ্রমণে বেরুলেন। প্রথমে গেলেন লণ্ডন। সেখানকার মানুষ তাঁকে যে বিপুল সম্বর্ধনা দিল তা অভূতপূর্ব। ইউরোপ ভ্রমণের সময় তাঁর মনে পড়ল পোলা নেগ্রির কথা। সে এক অসমাপ্ত প্রেমের কাহিনী। এই জার্মান অভিনেত্রীর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল বার্লিনে। পোলা হলিউডে পৌঁছালে দু'জনের মধ্যে অন্তরঙ্গ সম্পর্ক গড়ে উঠল। তারপরই কি একটা ব্যাপারে ঝগড়ার সূত্রপাত হল। শেষে অবস্থা এমন দাঁড়াল যে মুখ দেখাদেখি পর্যন্ত বন্ধ। চার্লসের সৌভাগ্য বলতে হবে যে এই ঝগড়ার সূত্রপাত বিয়ের পর হয়নি।

যাহোক তিনি ইউরোপের পর এশিয়া ঘুরে আমেরিকায় ফিরে এলেন। এখন তাঁর অনেক কাজ। বিশ্ব ভ্রমণের আগে তাঁর "সীটি লাইট" জনসমাদর লাভ করেছে তিনি দেখে গিয়েছিলেন। এবার উৎসাহিতভাবে যে চিত্রটিতে হাত দিলেন তার নাম "মডার্ন টাইমস"। কাহিনী প্রতিবারের মত নিজেই লিখেছেন। আর কোন দিকে মন দেবেন না। একাগ্রভাবে কাজ করে যাবেন এই তাঁর ইচ্ছে। কিন্তু ভাগ্যের এমন পরিহাস, সুটিং আরম্ভ হবার আগেই আবার প্রেমের জোয়ারে ভাসলেন।

"ইউনাইটেড আর্টিস্টে"র চেয়ারম্যান জো শেন্‌কের প্রমোদ তরণীতে আরো অনেকের সঙ্গে বেড়াতে বেরিয়েছিলেন চার্লস। এই দঙ্গলের মধ্যে ছিল পলেট গডার্ড। আলাপ হয়ে গেল। স্বর্ণকেশী পলেটের আসল নাম পলিন লেভি। থীলড্রেড বা লীটার মত সবে যৌবনে পা দিয়েছে তা নয় ; বয়স তেইশ। স্টেজে অভিনয় করত সে আগে, ইদানিং কয়েকবার চলচ্চিত্রে নেমেছে।

প্রতিবারের মত এবারও আলাপ হবার সপ্তাহ খানেকের মধ্যেই প্রেম জমে উঠল। হলিউডে আরেকটি মুখরোচক গুজবের জন্ম হল। যথা নিয়মে চার্লস এবার গুরুত্ব দিলেন না বিশেষ প্রশ্নটিকে—পলেট তাঁকে ভালবেসেছে না ভালবেসেছে চার্লস চ্যাপলিনের আকাশে ছোঁয়া যশ ও অপর্যাপ্ত অর্থকে?

দু'জনকে একই সঙ্গে দেখা যেতে লাগল নিয়মিত। পলেট তখন হল রোচের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ ছিল অভিনয়ের জন্য। চার্লস খেসারত দিয়ে পলেটকে ছাড়িয়ে আনলেন রোচের কাছ থেকে। এরপর অভিনয় শিক্ষা দিতে লাগলেন প্রেমিকাকে। সকলে স্থির নিশ্চিত ছিলেন, তাঁর পরের ছবিতে পলেটকে নায়িকা হিসেবে দেখা যাবে।

"মর্ডান টাইমস" মুক্তি লাভ করবার পর দু'জনের বিয়ে হয়ে গেল। বিয়ে আগেই হত—চার্লস কিছু দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাঁর বারংবার মনে পড়ে যাচ্ছিল, বহুদিন আগেকার এক ভবিষ্যৎবাণী। তখন কার্ণো সম্প্রদায়ভুক্ত হয়ে ইংল্যাণ্ডের নানা জায়গায় অভিনয় করে বেড়াচ্ছেন। এক বেদেনির সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। সে তাঁর হাত দেখে বলেছিল, চারবার তাঁর বিয়ে হবে। শেষ বিয়েতে সুখী হবেন। বেদেনির কথা ফললে, পলেটের সঙ্গে বিয়ে করেও তিনি সুখী হতে পারবেন না।

অবশ্য এই দ্বিধা শেষ পর্যন্ত বজায় রইল না। তবে কোথায় এবং কবে যে তাদের বিয়ে হয়েছিল, আজও তা রহস্য হয়েই রয়েছে। "মডার্ন টাইমস"-এর ভাল এবং খারাপ, দু'ধরনের সমালোচনায় আমেরিকার প্রেস যখন মুখর, তখন পলেটকে সঙ্গে নিয়ে চার্লস বেরিয়ে পড়লেন দূর প্রাচ্যের উদ্দেশ্যে। অনেকের ধারণা বিয়ের পর্বটা চুকিয়েই ওঁরা যাত্রা করেছিলেন। আবার কোন সংবাদপত্র লিখল, ও কাজটা তাঁরা সিঙ্গাপুরে সেরে নেন। এই দু'টি ধারণার মধ্যে কোনটি ঠিক, প্রশ্ন করা হলে চার্লস কোন মন্তব্য না করে শুধু হাসতেন।

বেদেনির কথাই ফলে গেল। বনিবনা হ'লনা দু'জনের মধ্যে। "মর্ডান টাইমস"-এর পর "গ্রেট ডিক্টেটর"এ অভিনয় করল পলেট। তারপরই বিবাহ বিচ্ছেদ। নিজের ভাগ্যকে দোষ দেওয়া ছাড়া তখন চার্লসের আর কিছু করবার ছিল না। এরপর তাঁর জীবনে এলেন উনা, বিখ্যাত নাট্যকার ইউজিন ওনিলের কন্যা উনা ওনিল। অবশ্য পলেটের সঙ্গে বিবাহ-বিচ্ছেদের পরই এক নারীঘটিত ব্যাপারে তিনি জড়িয়ে পড়েছিলেন। জোন ব্যারি নামে ব্রুকলিনের একটি মেয়ে চার্লসের কাছে এসেছিল অভিনেত্রী হবার আশায়। চার্লস তাকে বাজিয়ে দেখলেন, অভিনয়-প্রতিভা তার মধ্যে বিন্দুমাত্র নেই। তাছাড়া ব্যারির হাবভাব ও চালচলন তেমন পরিচ্ছন্ন নয়। সে অত্যন্ত গায়ে পড়া। চার্লস তাকে নিজের প্রতিষ্ঠান থেকে সরিয়ে দিতে চাইলেন, সে যাবে না। ব্যারির একটি মেয়ে হবার পর পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে উঠল। সে আদালতে গিয়ে দাবী জানাল, এই মেয়ের জন্মদাতা হলেন চার্লস চ্যাপলিন। অবশ্য এই দাবী শেষ পর্যন্ত অগ্রাহ্য হল। কারণ চার্লসের রক্ত পরীক্ষা করে দেখা গেল ব্যারির অভিযোগ মিথ্যে।

উনাকে বিয়ে করে সত্যিকারের স্ত্রী পেলেন চার্লস। তিনবার ব্যর্থ বিবাহিত জীবন যাপন করবার পর অনাবিল আনন্দের উৎস মুখ খুলে গেল তাঁর কাছে। তিনি নিশ্চয় মনে মনে আক্ষেপ করেছেন, উনা তাঁর জীবনে আরো কয়েক বছর আগে এলেন না কেন? জীবনের শেষ দিনগুলিতে সুখী বিবাহিত জীবনের অধিকারী চ্যাপলিন। তাঁর এক জীবনীকার ও অন্তরঙ্গ ব্যক্তি এ সম্পর্কে চমৎকার লিখেছেন।

তিনি লিখেছেন "এই প্রথম সুখের মুখ দেখলেন তিনি। অতীতে যে তিনটি তরুণীকে চার্লি বিয়ে করেছিলেন, তাঁরা কেউই সংসারের দায়িত্ব নিতে চাননি। তাঁদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল চার্লির সাহায্যে নামকরা অভিনেত্রী হওয়া। উনা অভিনেত্রী হতে চান নি, তিনি চেয়েছিলেন সুন্দর একটি সংসার। বিমাতার সংসারে উনা অশান্তি পেয়েছিলেন—স্বাভাবিক ভাবেই সেই কারণে একটি শান্তিময় সংসার তাঁর কাম্য ছিল। সে কামনা তাঁর পূর্ণ হয়েছে।"...বিশ্ব-বিখ্যাত চার্লি চ্যাপলিনের স্ত্রী উনা। ইচ্ছে প্রকাশ করলেই তাঁকে নিয়ে প্রচুর হৈ হৈ হতে পারত। তা তিনি হতে দেননি। তিনি একবার সাংবাদিকদের বলেছিলেন, আমি তাঁর স্ত্রী। আর কিছু আমার বলবার নেই।

এইরকম মার্জিত রুচি ও চৌকস স্ত্রী পেয়েছিলেন বলেই চার্লসের শেষ জীবন এত সুখের। আমেরিকা থেকে বিতাড়িত হবার পরও, শুধু উনার প্রেরণাতেই "লাইম লাইটের" মত অনবদ্য ছবি আমাদের সামনে তুলে ধরতে পেরেছেন। বেদেনির কথা শেষ পর্যন্ত যে ফলবে, এ ভরসা বোধহয় চার্লসের মনে ছিল। চার্লি চ্যাপলিনের কোটি-কোটি অনুরাগী নিশ্চয় চাইবেন, তাঁর প্রেমময় বিবাহিত জীবন অক্ষয় হয়ে থাকুক।

প্রেমের বলি অ্যানি বলেন

ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে অ্যানি বলেন বিশেষভাবে চিহ্নিত হয়ে আছেন দু'টি কারণে। প্রথমতঃ রাণী প্রথম এলিজাবেথের তিনি জননী। দ্বিতীয়তঃ তাঁর নাটকীয় মৃত্যু। বিবাহ বিলাসী কামুক অষ্টম হেনরীর তিনি ছিলেন দ্বিতীয় স্ত্রী। সত্যি কথা বলতে কি ইংল্যাণ্ডের রাণী হওয়ার বাসনা যে তাঁর মন প্রবল হয়ে উঠেছিল তা নয়। নিতান্ত নিরুপায় অবস্থার মধ্যে পড়ে তাঁকে এই সম্মান মাথা পেতে নিতে হয়েছিল।

অনিন্দ্য সুন্দরী ছিলেন অ্যানি বলেন। তাঁর টানা টানা চোখ দু'টি যেন স্বপ্ন দিয়ে গড়া ছিল। দিঘলনাসা আর বঙ্কিম চিবুক মুখশ্রীকে চরম রমণীয় করে তুলেছিল। নয়নরঞ্জক গোলাপি আভাযুক্ত গাত্রবর্ণ—প্রথম দর্শনেই যে কোন পুরুষের মন মাতাল হয়ে উঠত।

টমাস বলেন ইংল্যাণ্ডের উচ্চবিত্ত সমাজের একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। যথাসময় তিনি 'নাইট হুড' উপাধি লাভ করেন। বিবাহও করেছিলেন একটি অভিজাত পরিবারের কন্যাকে। তাঁর স্ত্রী এলিজাবেথ হ্যাওয়ার্ডের জনক ছিলেন ডিউক অব নরফোক। ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে অ্যানি বলেনের জন্ম হয়। সেদিন টমাসের পক্ষে অনুমান করা কোন মতেই সম্ভব ছিল না যে, তাঁর এই সুন্দরী কন্যাটি আগামী দিনে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে স্থায়ীভাবে স্থান লাভ করবে একটি বিশেষ চরিত্র হিসেবে।

বাল্যকাল আর দশটি ধনী পরিবারের মেয়ের মতই কেটেছিল অ্যানির। যৌবনে পা দেওয়ার পরই অভিজাত তরুণদের মধ্যে তাঁর রূপের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। মধু লোভী ভ্রমরেরা গুঞ্জন করে বেড়াতে লাগল চতুর্দিকে। অ্যানি দিশেহারা হয়ে পড়লেন না। ধীর স্থির মনেই নিজের সাথী নির্বাচন করলেন—সেই ভাগ্যবান পুরুষটি হলেন, লর্ড নর্দামবার্ল্যাণ্ড। প্রেম বেশ জমে উঠল। দু'জনেই সুখী। আগামী দিনের স্বপ্নে দু'জনেই বিভোর। বাকদানের দিন স্থির করবার জন্য দুই পরিবার যখন তৎপর, ঠিক সেই সময় বাদ সাধলেন আর কেউ নয়, স্বয়ং ইংল্যাণ্ডের সিংহাসনের অধিকারী অষ্টম হেনরী।

বিশাল দেহী, নারী লোলুপ অষ্টম হেনরী ইংল্যাণ্ডের সংকট কালেই সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন। অবশ্য একথাও সত্যি, তাঁর খামখেয়ালীপনার জন্য বহু সঙ্কট সৃষ্টি হয়েছিল। সপ্তম হেনরীর মৃত্যুর পর তিনিই উত্তরাধিকারী হলেন। কারণ তাঁর জ্যেষ্ঠ আর্থার পূর্বেই মারা গিয়েছিলেন। আর্থার বেঁচে থাকলে ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস অন্য পথে অগ্রসর হত কিনা এ প্রশ্নের অবকাশ অবশ্যই থেকে যাচ্ছে। তবে একথা নিশ্চিত ভাবে বলা চলে, অষ্টম হেনরী সিংহাসন না পেলে, কতকগুলি সুন্দরী নারীর জীবন হেলায় নষ্ট হয়ে যেত না।

তরুণ হেনরী যখন সিংহাসনে আরোহণ করেন তখন তিনি বিবাহিত। তাঁর বড় ভাই আর্থারের বিধবা পত্নী ক্যাথারিণ অব অ্যারাগনকে তিনি স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। স্ত্রীর প্রতি হেনরীর দুর্বলতা ছিল না একথা বলা চলে না। তবুও লাম্পট্যের সীমা ছিল না তাঁর। তবে একথা স্বীকার করতেই হবে, তাঁর চারিত্রিক শৃঙ্খলা না থাকলেও অনেক রাজনৈতিক ব্যাপারে তিনি এই সময় মাথা গলিয়ে ছিলেন। ফ্রান্সের সঙ্গে মোটামুটি মিটমাট হয়েছিল। তারপর হেনরী পড়লেন ধর্ম নিয়ে।

এই সময় জার্মানির মার্টিন লুথার প্রটেষ্টাণ্ট ধর্মের প্রবর্তন করেছিলেন। এবং তার প্রচারের জন্য চতুর্দিকে ব্যাপক চেষ্টা চলছিল। ক্যাথলিক সমাজে গেল গেল রব উঠল। মহামান্য পোপ প্রমাদ গুণলেন। অস্থির চিত্ত হেনরী ক্যাথলিকদের ত্রাতা রূপে অবতীর্ণ হলেন বিতর্কের ক্ষেত্রে। ইংল্যাণ্ডে যাতে কেউ প্রোটেষ্টান্ট ধর্ম গ্রহণ না করে সে সম্পর্কে সজাগ রইলেন। এবং ক্যাথলিক ধর্মের সমর্থনে একটি বই লিখে তার বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করলেন। পোপ অষ্টম হেনরীর কার্যকলাপে সবিশেষ আনন্দিত হয়ে তাঁকে "ডিফেণ্ডার অব দি ফেত" উপাধি দিয়ে সম্মানিত করলেন।

ভাগ্যের এমন বিচিত্র পরিহাস, পোপের কাছ থেকে "ডিফেণ্ডার অব দি ফেত" লাভ করবার কিছুদিন পরেই হেনরী ক্যাথলিক ধর্ম ত্যাগ করে প্রটেষ্টাণ্ট হয়ে গেলেন। অবশ্য অ্যানি বলেনের সাক্ষাৎ না পেলে তিনি ধর্ম ত্যাগ করতেন কিনা এ সম্পর্কে মত-পার্থক্য আছে। অ্যানির সাক্ষাৎ তিনি কোথায় পেয়েছিলেন তা জানা যায় না। অনুমান করে নেওয়া যায়, তাঁকে প্রথম তিনি দেখেছিলেন কোন বিশিষ্ট ভোজসভায়। বলা বাহুল্য প্রথম দর্শনেই হেনরী হৃদয় হারিয়েছিলেন।

প্রকৃতিস্থ হবার পর মেয়েটির সম্পর্কে তিনি অনুসন্ধান করে দেখলেন। লর্ড নর্দামবার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রণয়ের কথাও অজানা রইল না। ঈর্ষায় তাঁর বুক পুড়ে

যেতে লাগল। তিনি ইংল্যাণ্ডের রাজা হয়েও একটি বিধবার স্বামী মাত্র। আর তাদেরই দেওয়া খেতাবধারী ওই লোকটি রাজ-অঙ্কশায়িনী হওয়ার যোগ্যা যে তরুণী তার-ই প্রণয় পাত্র। দু'জনের বিবাহ হতেও নাকি বিশেষ বিলম্ব নেই।

প্রকাশ্যে নয়, কূটচালে বাজিমাৎ করতে অগ্রসর হলেন অষ্টম হেনরী। অ্যানির জনক স্যার বলেনকে ডেকে পাঠান হল। তাঁকে আকারে-ইঙ্গিতে বুঝিয়ে দেওয়া হল, ইংল্যাণ্ডেশ্বর তাঁর কন্যার প্রতি অনুরক্ত। এই ব্যাপারে তাঁর প্রশ্রয় থাকলে রাজ অনুগ্রহের প্রবল সম্ভাবনা। স্যার বলেন বুদ্ধিমান ব্যক্তি। নিজের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ ও কন্যার সৌভাগ্যে তিনি আশাতিরিক্ত খুশি হলেন। এবং অ্যানি যাতে লর্ড নর্দামবার্ল্যাণ্ডের সঙ্গে আর মেলামেশা করতে না পারেন সে বিষয় সজাগ রইলেন।

সজাগ হবার বিশেষ প্রয়োজন ছিল না। কারণ অ্যানিও কম বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন না। তিনি রাজা ও লর্ডের মধ্যেকার পার্থক্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। যদিও রাজা বিবাহিত, তবুও তাঁর সুনজরে থাকাটা লোকসানের নয়। এদিকে লর্ড নর্দামবার্ল্যাণ্ডও সতর্ক হলেন। তাঁর প্রেমিকার উপর রাজার দৃষ্টি পড়েছে, সুতরাং পিছিয়ে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। মাথা গরম অষ্টম হেনরীর চক্ষুশূল হলে জীবন নিয়ে টানাটানি অনিবার্য।

সাক্ষাৎ হল দু'জনের।

সালটা বোধ হয় ১৫৩২। প্রাণভরে অ্যানিকে দেখলেন হেনরী। সাজসজ্জায় আজ চূড়ান্ত নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়েছেন অ্যানি। তাঁর সৌন্দর্য বর্ধিত হয়েছে বহুগুণ। হেনরী হতবাক হয়ে ভাবেন এত রূপ ঈশ্বর মানুষকে দিতে পারেন! তারপর—তারপর আরম্ভ হল দু'জনের উদ্দাম প্রেমলীলা। শুধু চোখের নেশায় নয়, অ্যানিকে প্রকৃতই ভালবেসে ফেললেন হেনরী। অ্যানিও ভুলে গেলেন তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকের কথা। নিজেকে সম্পূর্ণভাবে বিলিয়ে দিলেন রাজার উগ্রপ্রেমে।

ক্রমে প্রেম আর নিষ্কাম রইল না, নেমে এল দৈহিক পর্যায়ে। লোকচক্ষের অন্তরালে সমস্ত কিছু ঘটলেও, কারুর প্রকৃত ঘটনা অনুমান করে নিতে কষ্ট হল না। রাজাকে নিয়ে এমন রসাল আলোচনা বহুদিন হয়নি পার্ষদদের মধ্যে। চাপা গুঞ্জনে মুখরিত হয়ে উঠল চতুর্দিক। মন্ত্রী পরিষদের প্রধান ক্রমওয়েলের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। রাজাকে নিয়ে এই ধরনের আলোচনা চলুক তা তিনি সমর্থন-যোগ্য বলে মনে করলেন না।

সাক্ষাৎ করলেন অষ্টম হেনরীর সঙ্গে।

গম্ভীর মুখে সমস্ত শুনলেন হেনরী। বললেন, আমার ব্যক্তিগত ব্যাপার নিয়ে এত আলোচনা চলছে কেন বুঝতে পাচ্ছি—

আলোচনা হওয়াটা স্বাভাবিক। সকলের মুখ বন্ধ হওয়া দরকার মাই লর্ড!

একটু চিন্তা করে হেনরী বললেন, আমি একটা সিদ্ধান্ত নেবার জন্য তৈরি হচ্ছিলাম। আপনার কথায় দ্বিধা দূর হল। অ্যানিকে রাণীর মর্যাদা দিলেই সমস্ত দিক রক্ষা পায়।

ক্রমওয়েল হতবাক হয়ে গেলেন।

—মাই লর্ড, স্ত্রী বর্তমান থাকতে কি কোন ক্যাথলিক দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতে পারেন? মহামান্য পোপ এই বিবাহে অনুমতি দেবেন না।

—ধর্মের জন্য আমি অনেক কিছু করেছি। মহামান্য পোপের আমি আস্থাভাজন। ক্যাথারিনকে ত্যাগ করবার অনুমতি তিনি আমায় নিশ্চয় দেবেন।

আর কোন কথা হ'ল না দু'জনের মধ্যে। চিন্তিত ক্রমওয়েল বিদায় নিলেন। কথাটা চাপা রইল না। ক্যাথারিনও শুনলেন, অ্যানি বলেন নামে একটি সুন্দরী মেয়েকে নিয়ে হেনরী মাতামাতি করছেন, এ সংবাদ পূর্বেই তাঁর কানে এসেছিল। তিনি বিশেষ গুরুত্ব দেননি। কারণ, হেনরীর এই ধরনের কার্যকলাপ তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখেছিল। অবশ্য এবার পরিস্থিতি পরিণয় পর্যন্ত যে গড়াতে পারে, এ ধারণা ক্যাথারিনের ছিল না।

সিদ্ধান্তে উপনীত হবার পর থেকেই প্রতিটি মুহূর্ত হেনরী আনন্দিত মনে কাটাচ্ছিলেন। অ্যানি তখনও কিছু জানেন না। সাক্ষাতের পর নিজের বিশাল বাহুর মধ্যে প্রেয়সীকে আলিঙ্গনাবদ্ধ করে জানালেন তাঁর মনোবাসনা।

সচকিত হলেন অ্যানি বলেন!

—এ কি ভাবে সম্ভব মাই লর্ড!

—ক্যাথারিনের সঙ্গে আমার বিবাহ বিচ্ছেদ হবে।

—কিন্তু...

—কোন কিন্তু নয়। কোন প্রতিবন্ধক আমাদের পথ রোধ করতে পারবে না। মাই লেডী! আমি দিব্যচক্ষে দেখতে পাচ্ছি প্রজাসাধারণ তোমাকে 'কুইন অব ইংল্যাণ্ড' হিসেবে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

ব্যাপারটা কিন্তু সহজে মিটল না। ক্যাথারিনকে হেনরী পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, কোন সন্তান উপহার দিতে না পারায় তিনি তাঁর সঙ্গে আর কোন সম্পর্ক বজায় রাখতে প্রস্তুত নন। ইংল্যাণ্ডের ভাবী উত্তরাধিকারী তাঁর চাই। সুতরাং বৃহৎ স্বার্থে নতুন স্ত্রী গ্রহণ করতে তিনি বাধ্য। ক্যাথারিনের উত্তর দেবার কিছু ছিল না। তাঁর

কোন কথাই যে গ্রাহ্য হবে না, তা তিনি জানতেন।

চরম মুহূর্তে কিন্তু পোপ বাদ সাধলেন। এই ভয়ই করেছিলেন ক্রমওয়েল। পোপ বিবাহ বিচ্ছেদের অনুমতি দিলেন না। বলা বাহুল্য, স্থির প্রতিজ্ঞ হেনরী এই আদেশ দ্বিধাহীনভাবে মেনে নেবার পাত্র নন। তিনি কাল বিলম্ব না করে ক্যাথলিক ধর্ম ত্যাগ করে প্রটেস্টান্ট হয়ে গেলেন। সমস্ত ক্যাথলিক সমাজ স্তম্ভিত হয়ে গেল। ক্যাথলিক ধর্মকে রক্ষা করার জন্য যে হেনরী আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন—সেই তিনি একটি নারীর জন্য ধর্মত্যাগ করে প্রটেস্টান্ট হয়ে গেলেন! যাঁকে নিয়ে এত আলাপ-আলোচনা তিনি কিন্তু নির্বিকার।

ধর্মত্যাগ করেই হেনরী ক্ষান্ত হলেন না। সমস্ত দিকের একটা পাকাপোক্ত ব্যবস্থা করে ফেললেন। নিজের বিশ্বাসভাজন কর্ণমারকে ক্যাণ্টারবেরির আর্চবিশপ পদে অভিষিক্ত করলেন। এরপর আর কোন বাধা রইল না। কর্ণমার ক্যাথারিনের সঙ্গে রাজার বিবাহ-বিচ্ছেদ মেনে নিলেন।

১৫৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারি অ্যানির সঙ্গে বিবাহ হয়ে গেল হেনরীর। দু'জনেই অত্যন্ত খুশি। তাঁদের জীবন হয়ে উঠল যেন নিবিড় প্রেমের আলপনা। বিবাহের মাত্র পাঁচ মাস পরে অ্যানি একটি কন্যা উপহার দিলেন রাজাকে। হেনরীর আশা ভঙ্গ হয়েছিল। কারণ তিনি পুত্রের জনক হতে চেয়েছিলেন। এই কন্যাটিই হ'ল ভুবন-বিখ্যাত রাণী প্রথম এলিজাবেথ।

তিনটি বছর কেটে গেল সুখ-স্বপ্নের মধ্য দিয়ে।

তারপর—

অ্যানির জীবনে ঘনিয়ে এল কালোমেঘ। এত প্রেম, এত ভালবাসার কোন মূল্য রইল না। একরোখা হেনরী সমস্ত কিছুকে তচনচ করে দিলেন। কেন এমন হল, কেন এই দুর্বার প্রেমে ভাঁটা পড়ল—এ নিয়ে অনেক গবেষণা হয়েছে শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে, কিন্তু আজ পর্যন্ত প্রকৃত কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি।

১৫৩৬ খৃষ্টাব্দের মে মাস।

গ্রিনউইচে খেলাধূলার আসর বসেছে। প্রতিবছরই কয়েকদিন ধরে এই জমজমাট আসরের ব্যবস্থা হয়। অষ্টম হেনরী প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত রয়েছেন অনুষ্ঠানে। রয়াল গার্ডদের বিশেষ প্রদর্শনী হচ্ছিল তখন। হঠাৎ রাজকীয় আসন ছেড়ে হেনরী উঠে পড়লেন। মার্কুইস, ব্যারণ ও লর্ডদের সচকিত দৃষ্টির সামনে দিয়েই তিনি অনুষ্ঠানক্ষেত্র ত্যাগ করে ঘোড়ায় এসে বসলেন।

ঘোড়া ছুটল লণ্ডনের পথে।

প্রাসাদে পৌঁছে হেনরী অন্দরমহলে চলে গেলেন। এরপর অ্যানি বলেনের

সঙ্গে তাঁর কি কথাবার্তা হয়েছিল জানা যায় না। কিন্তু পরের দিনই অ্যানি রাজার সঙ্গে অভদ্রতাপূর্ণ ব্যবহার করার অপরাধে প্রিভিকাউন্সিলে উপস্থিত হবার আজ্ঞা পেলেন।

স্তম্ভিত হয়ে গেলেন অ্যানি বলেন। তিনি কল্পনাও করতে পারেননি, ব্যাপার এতদূর গড়াবে। রাজা রাণীকে প্রকাশ্য আদালতে নিয়ে গেছেন এরকম নজীর হাজার বছরের ইতিহাসেও হয়ত পাওয়া যাবে না। কিন্তু তাঁর অপরাধ কি? যে অপরাধে তাঁকে অভিযুক্ত করা হয়েছে তাতো তিনি করেননি। তবে? অ্যানি বলেন যা বুঝতে পারেননি, আর কারুর পক্ষে তা বুঝে ওঠা সম্ভব নয়। তবুও অনুসন্ধিৎসু মানুষ যুগ যুগ ধরে এর প্রকৃত কারণ সম্পর্কে অনুমান করে এসেছেন। সেই অনুমানগুলির অন্যতম হল, জেনি সিমোরকে দেখে তিনি নতুন করে হৃদয় হারিয়েছিলেন। কোন অনুষ্ঠানেই বোধহয় দু'জনের সাক্ষাৎ হয়েছিল। জেনি সিমোর অ্যানির মত সুন্দরী ছিলেন না। তবে যৌবনভারপীড়িত এই নারীর লাস্য পুরুষকে বিভোর করে তুলতে পারত। নারীলোভী হেনরী ওই নারীকে নিজের করে পাবার জন্য হয়ত পাগল হয়ে উঠেছিলেন। তাই স্ত্রীর হাত থেকে উদ্ধার পাবার জন্য তাঁকে এই বিচিত্র খেলা আরম্ভ করতে হল। অসহায় অ্যানি চোখের সামনে অন্ধকার দেখতে লাগলেন।

যথা সময়ে অ্যানি বলেন প্রিভিকাউন্সিলের সামনে উপস্থিত হলেন। তিনি নিজের বিবৃতিতে বললেন, রাজার সম্পর্কে তাঁর হৃদয়ে গভীর শ্রদ্ধা ও প্রেম ছাড়া আর কিছুই নেই। তাঁর সঙ্গে অভদ্রের মত ব্যবহার করবেন তা তিনি স্বপ্নেও চিন্তা করতে পারেন না। রাজা কোন্ কারণে বিরূপ হয়ে তাঁকে আদালতে উপস্থিত করছেন তা তিনি মোটেই বুঝতে পারছেন না।

রাজার সমর্থক প্রিভিকাউন্সিল রাণীর কোন কথা গ্রাহ্য করলেন না। তাঁকে গ্রেপ্তার করে চালান দেওয়া হল লণ্ডন টাওয়ারে। ভাগ্যের বিচিত্র পরিহাস, এই টাওয়ার বিশেষ এক অনুষ্ঠানে একদিন তাঁর রাণীর মর্যাদা স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। আজ সেখানেই তিনি বন্দী।

অ্যানি জানতে পারলেন, ১১ই মে মিডিলসেক্সের আদালতে তাঁর বিচার আরম্ভ হবে। বিস্ময়ের বিষয় মামলা গঠিত হয়েছে আরো পাঁচজনকে নিয়ে। এঁদের মধ্যে একজন হলেন, অ্যানি বলেনের জ্যেষ্ঠ লর্ড রচফোর্ড ও বাকি চারজন সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তি। এঁদের বিরুদ্ধেও অভিযোগ হল রাজার প্রতি অবমাননা।

শোচনীয় মনের অবস্থা নিয়ে অ্যানি পরিস্থিতির বাস্তব দিকটা খতিয়ে দেখবার

চেষ্টা করতে লাগলেন। একি হ'ল তাঁর? অনেক চিন্তার পর রাজাকে একটি পত্র দেওয়া স্থির করলেন।

"লণ্ডন টাওয়ার"
৬ই মে, ১৫৩৬ সাল।

মহানুভব,

কারাগারে দিন কাটাচ্ছি। তুমি কেন এত অসন্তুষ্ট বুঝতে পাচ্ছি না। তুমি জানিয়েছ, সত্যকথা প্রকাশ করলে আমাকে দয়া করতে পার। কিন্তু যে পাপ আমি করিনি সে পাপের বোঝা তোমার হতভাগিনী রাণী কেন মাথা পেতে নেবে? প্রকৃত সত্যটা জানতে চাও, রাজা? এই অ্যানি বলেনের মত নিষ্ঠাবতী স্ত্রী আজ পর্যন্ত কোন রাজা কখনও পায়নি, যা তুমি পেয়েছিলে। আমি চেয়েছিলাম নিজের মর্যাদা। ঈশ্বর আমাকে সে সুযোগ দিয়েছিলেন। আমি পেয়েছিলাম রাণীর সম্মান। যদিও আমি জানি তোমার যোগ্যা নই। তুমিই আমাকে সাধারণ অবস্থা থেকে তুলে নিয়ে রাণীর আসনে বসিয়েছিলে। নয়নের মণি করে তুলেছিলে। তবে আজ কেন দিন বদলে গেল? কেন তোমার মন চঞ্চল হয়ে উঠল? এই চিত্ত চাঞ্চল্যের জন্য দায়ী হয়ত আমার শত্রুরা। তাদের উস্কানিতে তোমার কৃপা থেকে আমায় বঞ্চিত কর না মাই লর্ড! তোমার অনুরক্তা নই, এই কলঙ্ক থেকে আমায় রেহাই দাও—এই কলঙ্ক থেকে রেহাই দাও তোমার শিশু কন্যাকে।

আমার বিচারই কর মাই লর্ড, ন্যায় বিচার। প্রকাশ্যেই আমার বিচার কর। এতে আমার মর্যাদাহানির আশঙ্কা নেই। এই বিচারেই তুমি লক্ষ্য করবে আমি নির্দোষ। তোমার সন্দেহ অমূলক। মাই লর্ড, প্রকাশ্যে ন্যায় বিচারে আমি নিঃসংশয়ে

নির্দোষী প্রমাণিত হয়ে তোমার আনন্দ বর্ধন করতে পারব। যদি ন্যায়সঙ্গতভাবে প্রমাণিত হই আমি 'অপরাধী' তখন তুমি ঘোষণা কর আমি ভগবানের কাছে অপরাধিনী, তোমার কাছে অবিশ্বাসিনী। তখন আমায় উচিত দণ্ড দিয়ে কৃতার্থ কর। আর খুশি কর, জেনি সিমোরকে, তার জন্যই তো আজ আমি কারাগারে।

মাই লর্ড! যদি তুমি মনে করে থাক তোমার দ্বারা নিন্দিত আমার এই জীবন নষ্ট করলেই তোমার চরম তৃপ্তি হবে, তবে প্রার্থনা করি তোমার পাপ যেন ক্ষমার যোগ্য হয়। শেষ বিচার আসছে। তোমারও আর বেশি দেরি নেই। বেশ বুঝতে পারছি', বিচারে তোমার কৃতকর্মের জন্য—আমার উপর তোমার নিষ্ঠুরতার জন্য ভগবান কঠো ‌র বিধান দেবেন।

আমার অন্তিম এবং একমাত্র প্রার্থনা তুমি যে আমার উপর অসন্তুষ্ট হয়েছ, সে অসন্তুষ্টির ভার যেন বইতে পারি। আর আমার জন্য যে সমস্ত ব্যক্তি কারারুদ্ধ, তাঁদের যেন তোমার অসন্তুষ্টির ছোঁয়া না লাগে। আমার এই দেহ তোমার মনকে যদি কখনও তৃপ্ত করে থাকে, অ্যানি বলেনের নাম কখনও যদি তোমাকে আনন্দ দিয়ে থাকে তবে আমার এই প্রার্থনা ব্যর্থ করে দিও না। আর তোমায় বিরক্ত করব না। টাওয়ারের এই পাষাণ কারাকক্ষ থেকে আমার প্রার্থনা, ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন!

'অ্যানি বলেন।'

এই পত্র পেয়ে হেনরী আরো ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন। আজীবন অ্যানিকে কারারুদ্ধ করে রাখার চিন্তাকে বাতিল করে দিলেন। বলা বাহুল্য, সহজেই অনুমান করে নেওয়া যায় এই ব্যাপারে জেনি সিমোর রাজাকে আরো উত্তেজিত করেছিলেন।

১১ই মে লর্ড রচফোর্ড ও অন্য চারব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হলেন। ট্রাইবুনাল গঠিত হয়েছিল যে চব্বিশজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে নিয়ে, তাদের মধ্যে প্রধান ছিলেন ডিউক অব নরফোক। ১৫ই মে অ্যানি বলেন ট্রাইবুনালের সামনে উপস্থিত হলেন। কান্না জড়িত গলায় আত্মপক্ষ সমর্থনে অনেক কথাই বললেন তিনি। তাঁর বিবৃতিতে বিচারকদের মনে করুণার উদ্রেক হলেও কিছুই করবার নেই। রাজার বিপক্ষে যাওয়ার অর্থ হল মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করা।

তিনদিন ধরে বিচারের প্রহসন চলল।

১৫৩৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই মে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত হলেন অ্যানি বলেন।

১৯শে মে সকাল ন'টার কিছু পরে একটি জীবনের উপর মর্মন্তুদ ভাবে যবনিকা পড়ল। অসম্ভব ভিড় হয়েছিল তাঁর মৃত্যু দেখবার জন্য। অ্যানির শেষ প্রার্থনা ছিল একটি ধারাল তলোয়ার। তখন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্তদের কুড়ুলের সাহায্যে দেহ থেকে মাথা আলাদা করা হত। একেবারে ঘাতক গলা দ্বিখণ্ডিত করতে পারত না। থেৎলে যেত, তাই বার বার চেষ্টা করা হত। এই অসহনীয় কষ্টের হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য অ্যানি একটি ধারাল তলোয়ার প্রার্থনা করেছিলেন। তাঁর প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছিল। তলোয়ারের এককোপে তিনি মৃত্যুবরণ করেছিলেন।

পরের দিন অষ্টম হেনরীর সঙ্গে জেনি সিমোরের বিবাহ সম্পন্ন হয়।